লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য

প্রশিক্ষণ মডিউল

Training Module
for
Livestock Service Provider (LSP)

প্রশিক্ষণ মেয়াদ: ২১ দিন

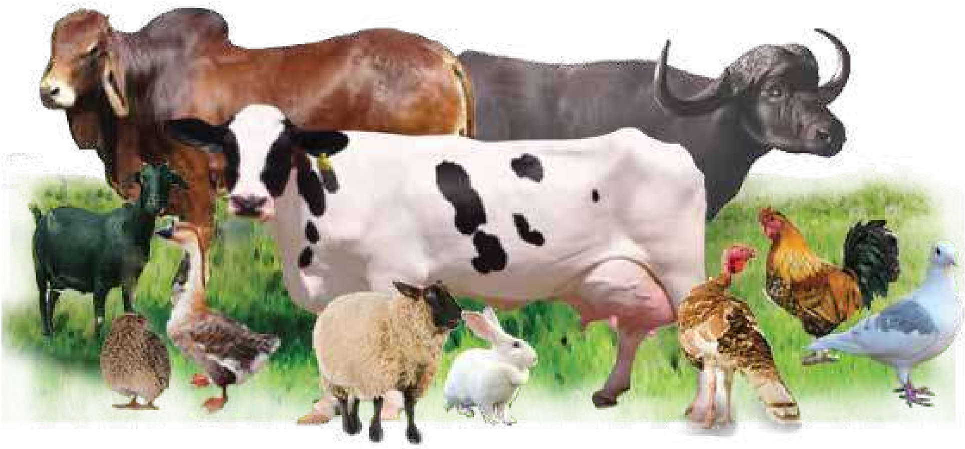

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য

প্রশিক্ষণ মডিউল

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন
ডা. মো: জহিরুল ইসলাম

সম্পাদনায়
ড. মোঃ গোলাম রব্বানী
ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ আব্দুর রহিম
প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

উপদেষ্টা
ডা. আব্দুল জব্বার সিকদার
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রকাশনায়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

পরামর্শ ও মতামত প্রদান
ডা. মুহাম্মদ সালেহ উদ্দিন খান
কল্যান কুমার ফৌজদার
ড. জীবন চন্দ্র দাস

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

‘‘বাণী’’

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বৃহত্তর কৃষি সেক্টরে গ্রহণ করা হচ্ছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রাণিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে গ্রহণ করা হয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।

বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রাণিজ আমিষ দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ‘‘আমার গ্রাম, আমার শহর’’ বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের এই আমূল পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে তৃণমূল খামারী, উদ্যোক্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রাণিসম্পদ সেক্টর থেকে পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরণের বিষয় ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করছে। প্রাণিজ আমিষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এসডিজি ২০৩০ এর অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই উন্নয়ন সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য দিক নির্দেশনামূলক একটি মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি মডিউলটি সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সহায়ক গাইড হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস ও আম্পানে ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নতুন উদ্যমে আমাদের প্রচেষ্টা আরও বেশি গতিশীল করে তুলতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনায় মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ নিজেদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে খামারীদের সেবা প্রদান এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। যুগোপযোগী এ মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনায় যারা মেধা, মনন ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

“বাণী”

গাঙ্গেয় পললভূমিতে গড়ে ওঠা আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলানিকেতন। ইতিহাসের নানা ধাপ পেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানের আসনে অভিষিক্ত। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজির সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অপরিসীম সক্ষমতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের অপার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচনের পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মাস র‌্যাপিড ট্র্যানজিট (মেট্রোরেল) বাস্তবায়ন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর বিনির্মাণ প্রভৃতি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিগত দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ক্রম বর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিত্ব ত্বরান্বিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প” গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, মার্কেট লিংকেজ গড়ে তোলা এবং ভ্যালুচেইনের উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লানের আওতায় ডেইরী এবং পোল্ট্রি সেক্টরে মোট ৬ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগী খামারী নির্বাচনপূর্বক নির্বাচিত খামারীগণকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনায় তৃণমূল পর্যায়ে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের দক্ষতা উন্নয়নে দিক নির্দেশনামূলক যুগোপযোগী একটি প্রশিক্ষণ সহায়ক মডিউল তৈরি করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ হবে। আমি আশা করি লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য প্রণীত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে প্রণীত মডিউলটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ মডিউল রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

রওনক মাহমুদ

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“বাণী”

পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে।

মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভিশন ২০২১ এ দেশের ৮৫ ভাগ লোকের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মি.লি. দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস ও সপ্তাহে দুইটি করে ডিম সরবরাহের হিসেবে বাৎসরিক দুধ, মাংস ও ডিমের মোট চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে দুধের প্রাপ্যতা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি এখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ ঘাটতি শূন্যের কোটায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে। দেশের ৪২০০ ইউনিয়নে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) দের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণীত এ মডিউলটি এলএসপিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মডিউলটি রচনায় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি এ মডিউলটি সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডা. আবদুল জব্বার শিকদার

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“মূখবন্ধ”

উন্নত জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার আশৈশবলালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত জাতির মর্যাদা লাভ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োজিত রয়েছেন। দক্ষ জনশক্তি সৃজনের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল প্রশংসিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এসডিজি-২০৩০ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রাণিসম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের প্রথম বাহন কুকুর থেকে শুরু করে দ্রুতগতির অশ্ব মানুষের সহজাত সচলতায় অধিকতর গতি সঞ্চার করেছে। পশুপালন যুগে মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস ছিল প্রাণিজগৎ। কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে প্রাণিশক্তির বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের মাধ্যমে। শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক মানুষ সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়নে প্রাণিজাত খাদ্যকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানুষের ইতিহাসে প্রাণী তাই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। খাদ্যচক্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের যেমন পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে, তেমনি মানবজীবন প্রতি পদে খাদ্যচক্রের এই বৃত্তবর্তী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়নপ্রকল্প” তাই দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে তথ্য-উপাত্ত সক্ষমতার সমার্থক হিসেবে গণ্য। এ প্রকল্পের ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়োজিত লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারগণ (এলএসপি) প্রাণিসম্পদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা, খামারীদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ও উন্নততর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের সূত্রধর হিসেবে কাজ করছে। এলএসপিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি একই সূত্রে গাঁথা। নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ এলএসপিদের অধিকতর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলবে। এলএসপিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের উপর তাই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যেন সুপরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সযত্ন পরিচর্যায় এ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রশিক্ষকগণকে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠদান এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে কার্যকর পাঠ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপ প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এ কাজটি সম্পাদনে প্রকল্পের আরও যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মো: আব্দুর রহিম

প্রশিক্ষণ নোট

এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এলডিডিপি'র মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এলএসপিদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি মডিউলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে বিবেচিত হবে। গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে মডিউলটিতে ১০৫টি সেশন সন্নিবেশিত এবং প্রশিক্ষণ কোর্সটি-কে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং দুপুর ১.০০-২.০০ পর্যন্ত বিরতিসহ বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রশিক্ষণ ক্লাশসমুহ সিডিউল মোতাবেক যথাসময়ে শুরু ও শেষ করা হবে। মডিউলের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ সুচী প্রণয়ণ করা হবে। প্রতিটি সেশনের জন্য একজন করে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন থাকবেন। তিনি তাঁর বিষয়বস্তু মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ সহকারী প্রশিক্ষণ সামগ্রী (খাতা, কলম, নোট, লেকচার শীট ইত্যাদি) প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে পৌঁছে দিবেন।

প্রশিক্ষক/ রিসোর্স পারসন এর জন্য করণীয় ঃ

১. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিস্কার ও স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে কথা বলুন যাতে সবাই শুনতে ও বুঝতে পারে।
২. ভিজ্যুয়াল এইড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পয়েন্টার ব্যবহার করুন।
৩. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান সম্পর্কে জেনে নিন।
৪. আপনার উপস্থাপিত বিষয় কম্পিউটারে খুলুন এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন।
৫. বিষয়ের উপর নির্ধারিত মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৬. ব্যবহারিক ক্লাশের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ/সংগৃহিত উপকরণ দিয়ে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা দিন। খামার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে খামার পরিচালনা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ে খামার চত্বরে আলোচনা করুন এবং হাতে কলমে শিখিয়ে দিন।
৭. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কোন মতামত থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী/প্রকল্পের ট্রেনিং উইং-কে অবহিত করুন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কলাকৌশলের সাথে এলএসপিদের পরিচিত ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।
২. আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রক্ষিণার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৩. গবাদিপশু পালন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়ে ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিত ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।
৪. আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহারে কৃষকদের সহজে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৫. এলডিডিপি'র বাস্তবায়ন কৌশল ও ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে এলএসপিদের পরিচিতি ও সম্পৃক্তকরণ।
৬. প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ এলএসপি তৈরী করা যারা মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

১. অতি সহজে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালনের কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন।
২. কৃষক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।
৩. কৃষক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
৪. আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হবেন।
৫. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী লালন পালন সম্পর্কে অবগত হবেন।

সূচিপত্র

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	১	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভিশন-২০৪১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও লক্ষ্য ।	১১
	২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন পরিচিতি ও কার্যপরিধি।	১৪
	৩	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।	১৭
	৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন, সমন্বয় ও পরিদর্শন।	১৯
	৫	লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) দের দায়িত্ব ও কর্তব্য।	২২
২য়	৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।	২৩
	৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর ব্যবহার।	২৫
	৮	ইন্টারনেট পরিচিতি (ওয়েব ব্রাউজার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, গুগল, ই-মেইল, জিপিএস)।	২৭
	৯-১০	ইন্টারনেট পরিচিতি (ব্যবহারিক)।	২৮
৩য়	১১	মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড এর পরিচিতি।	২৯
	১২-১৫	মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)।	২৯
৪র্থ	১৬	মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল এর পরিচিতি।	৩০
	১৭-২০	মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)।	৩০
৫ম	২১	মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর পরিচিতি।	৩১
	২২-২৫	মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)।	৩১
৬ষ্ঠ	২৬	মাল্টিমিডিয়ার পরিচিতি ও ব্যবহার।	৩২
	২৭	প্রাণিসম্পদ খামার ব্যবস্থাপনায় আইসিটিভিত্তিক রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি	৩৩
	২৮	প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা।	৩৮
	২৯	উদ্যোক্তা, প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্যোক্তার উন্নয়ন।	৪১
	৩০	প্রাণিজাত পণ্যের সাপ্লাই চেইন, ভ্যালুএ্যাডিশন ও ভ্যালুচেইন ব্যবস্থাপনা	৪৩
৭ম	৩১	অংশগ্রহনমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) পরিচিতি ও ব্যবহার।	৪৫
	৩২-৩৫	অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীণ সমীক্ষা পদ্ধতি (ব্যবহারিক)	৪৭
৮ম	৩৬	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল।	৫০
	৩৭	নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন।	৫৩
	৩৮	দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা।	৫৬
	৩৯	প্রাণিসম্পদ খামারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি।	৬০
	৪০	গাভীপালনের প্রাথমিক তথ্য ও জাত পরিচিতি।	৬৩
৯ম	৪১	গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ।	৬৭
	৪২	গবাদিপশুর রেশন, আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য, রেশন তৈরীর বিবেচ্য বিষয়।	৬৯
	৪৩	গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা।	৭১
	৪৪	গো-খাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস (ফডার) পরিচিতি ও চাষ পদ্ধতি।	৭৩
	৪৫	হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ।	৭৫

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০ম	৪৬	সাইলেজ পরিচিতি, উন্নত জাতের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরী প্রক্রিয়া	৭৬
	৪৭	উন্নতজাতের ঘাস থেকে সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি (ব্যবহারিক)	৭৭
	৪৮	সবুজ ঘাস, ভিজা খড় সংরক্ষণ ও ব্যবহার।	৭৮
	৪৯	খরগোশ পালন প্রযুক্তি।	৮০
	৫০	গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি।	৮১
১১তম	৫১	দুধ দোহন পদ্ধতি এবং দোহনের বিভিন্ন ধাপ।	৮৩
	৫২	দুধ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে গাভী পরিচর্যা।	৮৮
	৫৩	আদর্শ দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কাজ।	৯১
	৫৪	১০টি গাভীর খামার প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের নমুনা।	৯৩
	৫৫	গরুর হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি।	৯৬
১২তম	৫৬	ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ পরিকল্পনা।	৯৯
	৫৭	ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (UMS) তৈরী পদ্ধতি ও সংরক্ষণ (ব্যবহারিক)	১০০
	৫৮	মহিষ পালন প্রযুক্তি।	১০১
	৫৯	ছাগল পালনের উপকারিতা ও ছাগলের জাত পরিচিতি।	১০৩
	৬০	ছাগল পালন পদ্ধতি।	১০৮
১৩তম	৬১	ছাগলের খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা।	১১১
	৬২	ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা।	১১৫
	৬৩	ছাগলের টিকা প্রদান কর্মসূচি ও ছাগল খামারের তথ্য সংরক্ষণ	১১৬
	৬৪	গো-খাদ্য হিসাবে এ্যালজির উৎপাদন ও ব্যবহার।	১১৯
	৬৫	ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা।	১২১
১৪তম	৬৬	গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ও রোগবালাই পরিচিতি।	১২৫
	৬৭	গবাদিপশুর ক্ষুরা, লাম্পি স্কিন ও পিপিআর রোগ পরিচিতি।	১২৭
	৬৮	গবাদিপশুর জলাতঙ্ক রোগ পরিচিতি।	১২৯
	৬৯	গবাদিপশুর বাদলা, গলাফুলা ও তড়কা রোগ পরিচিতি।	১৩১
	৭০	গবাদিপশুর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।	১৩৪
১৫তম	৭১	গবাদিপশুর টিকাবীজের পরিচিতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি (ব্যবহারিক)	১৩৬
	৭২	মুরগির জাত পরিচিতি।	১৩৭
	৭৩	লেয়ার মুরগি ও ব্রয়লার মুরগি পালন প্রযুক্তি ।	১৩৯
	৭৪	দেশী (অরগানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল।	১৪৫
	৭৫	হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা।	১৪৭
১৬তম	৭৬	কোয়েল পালন ও ব্যবস্থাপনা।	১৫১
	৭৭	কবুতর পালন প্রযুক্তি।	১৫৫
	৭৮	টার্কি পালন প্রযুক্তি।	১৫৭
	৭৯	পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব এবং ক্ষতিকর প্রভাব।	১৬১
	৮০	পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বালাই পরিচিতি।	১৬৩

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭তম	৮১	পোল্ট্রির ভাইরাস জনিত রোগবালাই পরিচিতি-১।	১৬৪
	৮২	পোল্ট্রির ভাইরাস জনিত রোগবালাই পরিচিতি-২।	১৬৭
	৮৩	পোল্ট্রি খামারের জীব নিরাপত্তা।	১৬৮
	৮৪	মুরগির পরজীবীজনিত রোগ পরিচিতি।	১৭১
	৮৫	পোল্ট্রি খামারে জীবানুনাশক ব্যবহার পদ্ধতি।	১৭৩
১৮তম	৮৬	হাঁস-মুরগী টিকাবীজের প্রকারভেদ, টীকাবীজ পরিবহন ও সংরক্ষণ।	১৭৫
	৮৭-৮৯	হাঁস-মুরগী টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি (ব্যবহারিক)	১৭৮
	৯০	গবাদিপশু পরিবহনকালীন ধকলসমূহ, সতর্কতা এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনা।	১৭৯
১৯তম	৯১	মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল।	১৮৩
	৯২	কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ অনুষ্ঠান।	১৮৫
	৯৩	কৃষক মাঠস্কুলের ধারণা ও উদ্দেশ্য।	১৮৭
	৯৪	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক।	১৮৮
	৯৫	কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ব্যবস্থাপনা।	১৮৯
২০তম	৯৬	জৈব জ্বালানি বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।	১৯০
	৯৭	গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।	১৯৩
	৯৮-১০০	গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন।	১৯৫
২১তম	১০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে পশুপাখি রক্ষায় করণীয়।	১৯৬
	১০২-১০৩	প্রশিক্ষণ কোর্স রিভিউ	১৯৭
	১০৪-১০৫	চূড়ান্ত পরীক্ষা, মূল্যায়ন, সনদ বিতরণ এবং সমাপনী অনুষ্ঠান।	২০০
বিবিধ		প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক পরিভাষা (Terminology)।	২০২

সেশন-১

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভিশন-২০৪১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও লক্ষ্য

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- বর্তমান সকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জন
- বর্তমান সরকারের ভিশন ২০৪১
- এসডিজি সম্পর্কে ধারণা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি কৃষি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নীত হচ্ছে মধ্যম আয়ের দেশে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহা সড়কে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মত। দেশে বর্তমানে জাতীয় প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার প্রায় ৮% যা বিগত ২০১১-১২তে ছিল ৬.৩২% এবং মাথা পিছু বার্ষিক আয় প্রায় ২১৭৩ মার্কিন ডলার যা বিগত দশকে ছিল মাত্র ৮৪৮ মার্কিন ডলারের সমান। বর্তমানে মোট জিডিপি'র আয়তন প্রায় ২৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১১-১২ তে ছিল প্রায় ১১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোড মডেল। দেশে আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাত্র এক দশকে বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশে। দেশের শিক্ষা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, আমদানী-রপ্তানী খাতে এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উৎক্ষেপণ করা হয়েছে দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'। দেশে বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প। তৈরী করা হচ্ছে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু, স্থাপন করা হচ্ছে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চালু করা হয়েছে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রো রেল প্রকল্প। এসব মেগা প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন শেষ হলে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে।

			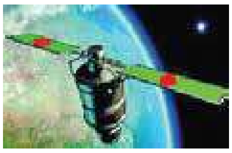	
পদ্মা সেতু	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর	'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'	ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্প

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আর ২০৪১ সালের মধ্যে স্থান করে নিবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের সারিতে। আর এজন্য প্রস্তুত করা হয়েছে "বাংলাদেশের উন্নয়ন অভীষ্ট ঃ ভিশন ২০৪১"। যা বাস্তবায়নে এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে নির্ধারণ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ঃ

জাতিসংঘ ঘোষিত ১৫ বৎসর ব্যাপী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা MDG এর মেয়াদ শেষ হয় ২০১৫ সালে। বিশ্বের উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯ তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'' (SDG) এর খসড়া চূড়ান্ত হয়। ৭০ তম অধিবেশনে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে SDG এর মেয়াদ শুরু হয়।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ''২০৩০ এজেন্ডা'' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মূলমন্ত্র হবে; ''কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন

করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যু হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত" টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)" অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং অনুযায়ী ৯টি অভীষ্ট (১, ২, ৩, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৭ নং) ও ২৮ টি লক্ষ্যমাত্রা প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এসডিজি'র উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ

১) সর্বত্র সবধরনের দারিদ্রের অবসান; ২) ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার; ৩) সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ; ৪) সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি; ৫) জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী-মেয়েদের ক্ষমতায়ন; ৬) সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; ৭) সকলের জন্য সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা; ৮) সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তমূলক ও টেকসই অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অভিজাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মান; ৯) অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ; ১০) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা; ১১) অন্তর্ভূক্তি মূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা; ১২) পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা; ১৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী কর্মব্যবস্থা গ্রহন; ১৪) টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর, ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার; ১৫) স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র হ্রাস প্রতিরোধ; ১৬) টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ; ১৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

প্রাণিসম্পদ সেক্টর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী, খামারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বর্তমান সম্ভাবনাময় এ প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ আধুনিকায়নে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত দারিদ্র নিরসন এবং প্রাণিসম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে।

সেশন-২

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন এবং পরিচিতি ও কার্যপরিধি

সেশন শেষে যা জানা যাবে ঃ

- রূপকল্প (Vision)
- অভিলক্ষ্য (Mission)
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো
- অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান সমূহ

রূপকল্প

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ করণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ঃ

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২৫০ মিলি/দিন, ১২০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পূরণের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ৯২.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ৭১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৭৬৬.০৬ কোটিতে উন্নীতকরণ।

উদ্দেশ্য ঃ

১. গবাদিপশু- পোল্ট্রির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২. গবাদিপশু- পোল্ট্রির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৪. প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৫. গবাদিপশু- পোল্ট্রির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) ঃ

১. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
২. গবাদিপশু- পোল্ট্রির চিকিৎসা, রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
৩. গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ।
৪. গবাদিপশু- পোল্ট্রির পুষ্টি উন্নয়ন।
৫. গবাদিপশু- পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন।
৬. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
৭. গবাদিপশু- পোল্ট্রির খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৮. গবাদিপশু- পোল্ট্রির কৌলিক মান-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
৯. প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন।
১০. প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ।
১১. প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।
১২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান অবকাঠামো

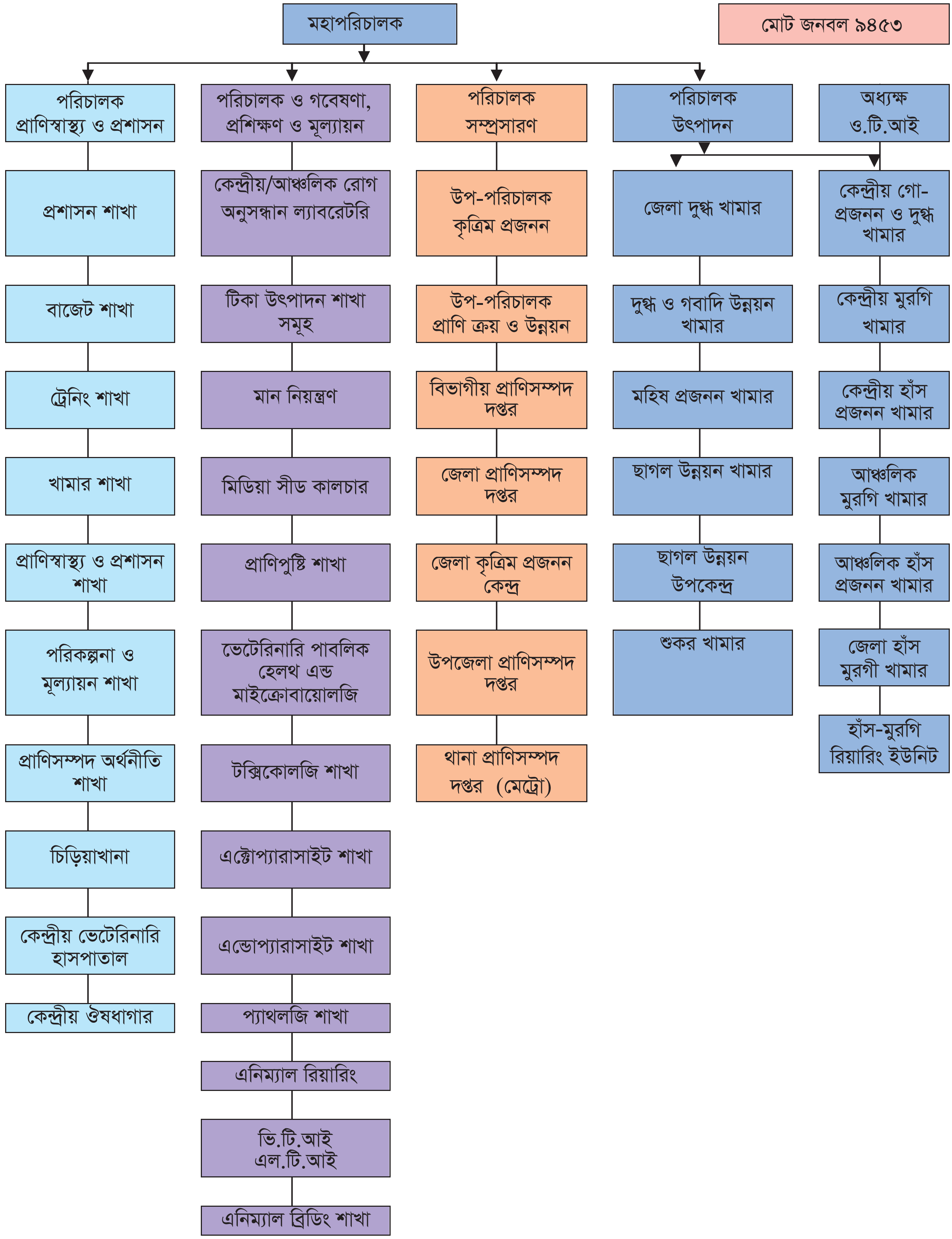

মোট জনবল ৯৪৫৩

- মহাপরিচালক
  - পরিচালক প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন
    - প্রশাসন শাখা
    - বাজেট শাখা
    - ট্রেনিং শাখা
    - খামার শাখা
    - প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন শাখা
    - পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা
    - প্রাণিসম্পদ অর্থনীতি শাখা
    - চিড়িয়াখানা
    - কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল
    - কেন্দ্রীয় ঔষধাগার
  - পরিচালক ও গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন
    - কেন্দ্রীয়/আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরি
    - টিকা উৎপাদন শাখা সমূহ
    - মান নিয়ন্ত্রণ
    - মিডিয়া সীড কালচার
    - প্রাণিপুষ্টি শাখা
    - ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ এন্ড মাইক্রোবায়োলজি
    - টক্সিকোলজি শাখা
    - এক্টোপ্যারাসাইট শাখা
    - এন্ডোপ্যারাসাইট শাখা
    - প্যাথলজি শাখা
    - এনিম্যাল রিয়ারিং
    - ভি.টি.আই
এল.টি.আই
    - এনিম্যাল ব্রিডিং শাখা
  - পরিচালক সম্প্রসারণ
    - উপ-পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন
    - উপ-পরিচালক প্রাণি ক্রয় ও উন্নয়ন
    - বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর
    - জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
    - জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র
    - উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
    - থানা প্রাণিসম্পদ দপ্তর (মেট্রো)
  - পরিচালক উৎপাদন
    - জেলা দুগ্ধ খামার
    - দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার
    - মহিষ প্রজনন খামার
    - ছাগল উন্নয়ন খামার
    - ছাগল উন্নয়ন উপকেন্দ্র
    - শুকর খামার
    - কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার
    - কেন্দ্রীয় মুরগি খামার
    - কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার
    - আঞ্চলিক মুরগি খামার
    - আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার
    - জেলা হাঁস মুরগী খামার
    - হাঁস-মুরগি রিয়ারিং ইউনিট
- অধ্যক্ষ ও.টি.আই

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়	০১	কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল	০১
বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর	০৮	জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল	৬৫
জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর	৬৪	কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার	০১
উপজেলা/থানা (মেট্রো) প্রাণিসম্পদ দপ্তর	৫০১	আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার	০৯
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	০১	কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার	০১
দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার	০৬	জেলা প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার	২২
মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার	০১	পশুখাদ্য কারখানা	০১
ছাগল উন্নয়ন খামর	০৭	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার	০১
শুকর খামার	০১	চিড়িয়াখানা	০২
কেন্দ্রীয় মুরগি খামার	০১	অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১
আঞ্চলিক মুরগি খামার	০২	ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০২
হাঁস-মুরগি খামার	১৬	লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০২
হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন ইউনিট	১৮	প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	০২
কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার	০১	প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন	২৪
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার	০৭	সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ	০২
ভেড়ার খামার	০৩	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী।	০৫*
কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার (কেন্দ্রীয় ১ টি, আঞ্চলিক ১টি)	০২	কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র (উপজেলায়)	৫০১
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	২১	কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট (ইউনিয়ন)	৩৭০২
পশুখাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব	০১*	মহিষের কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার	০১

* নির্মাণাধীন।

সেশন-৩

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পটি (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। পহেলা জানুয়ারি ২০১৯ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, উৎপাদনকারী সংগঠন তৈরী, মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইনের উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করা। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে -

১. প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিপুষ্টি এবং প্রজনন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধি করা

২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টরে ৫,৫০০ টি উৎপাদনকারী সংগঠন তৈরী করা। উৎপাদনকারী সংগঠন সমূহকে বাজার ব্যবস্থায় সংযোজনের মাধ্যমে মূল্যসংযোজন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানো।

৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ নীতিমালা তৈরী, জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন, তদারকি মূল্যায়ন এবং উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

৪. নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫. প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থার চালুকরণের মাধ্যমে খামারিদের নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ সহায়ক প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা জোড়দারকরণ।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট সমূহ	সাব-কম্পোনেন্ট	প্রধান পদক্ষেপ সমূহ
কম্পোনেন্ট-A উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ইনোভেশন	• সাব-কম্পোনেন্ট A1 প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গুলোকে সহায়তা। • সাব-কম্পোনেন্ট অ২ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা।	• একই পণ্যগুলোর প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে সহায়তা প্রদান ও তাদের ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধি। • ফিডিং এবং নিউট্রিশন। • রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ। • গৃহায়ন ও ব্যবস্থাপনা। • ডেমোনেস্ট্রেশন, প্রদর্শনী।
কম্পোনেন্ট-B মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট	• সাব-কম্পোনেন্ট B1 প্রডাক্টিভ পার্টনারশিপের মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ।	• এগ্রিবিজনেস (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME), ব্যবসায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FIS), প্রসেসর, অনগ্রসর কৃষি ব্যবসা সমূহ) এবং লাইভস্টক প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। • স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম। • পুষ্টি সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রচারণা।
	• সাব-কম্পোনেন্ট B2 প্রাণিসম্পদের জন্য সরকারি অবকাঠামো।	
	• সাব-কম্পোনেন্ট B3 ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিউট্রিশন।	
কম্পোনেন্ট- C ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি	• সাব-কম্পোনেন্ট- C1 প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম।	• সাব-সেক্টর গুলোর তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদান। • খাদ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে ICT ব্যবহার।
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C2 খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ।	

কম্পোনেন্ট- C ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি	• সাব-কম্পোনেন্ট- C-3 প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন।	• প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য পূর্বশর্ত নির্ণয়। • জাতীয় প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজ তৈরী। • সচেতনামূলক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল কার্যক্রম। • কোন প্রতিকূল প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে ফান্ড মোবাইলাজকরণ।
	• সাব-কম্পোনেন্ট- C-4 আকস্মিক ঘটনার জরুরি প্রতিক্রিয়া।	
কম্পোনেন্ট- D প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	কম্পোনেন্ট- D ডিএলএস হেড কোয়ার্টার এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা।	• ঢাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং • ইউএলও (ULO), ডিএলও (DLO), এবং ডিডি (DD) অফিসে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) প্রতিষ্ঠা ।

প্রকল্পের ইনপুট (INPUTS) ঃ

টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টস / কারিগরী সহায়তা শক্তিশালী করে

১. প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি : কম্পোনেন্ট এ এবং কম্পোনেন্ট সি।

২. নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সৃষ্টি: কম্পোনেন্ট সি ।

৩. সরকারি ও বেসরকারি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ প্রাণি চিকিৎসা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পশু প্রজনন সেবা সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪. টেকনিক্যাল এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস: কম্পোনেন্ট এ এবং কম্পোনেন্ট বি

৫. কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রোডিউসারদের আর্থিক বিষয়াবলিতে অ্যাক্সেস : কম্পোনেন্ট এ এবং কম্পোনেন্ট বি।

৬. নবায়নযোগ্য শক্তিতে কৃষি উদ্যোক্তাদের অ্যাক্সেস : কম্পোনেন্ট বি ।

বিনিয়োগ (INVESTMENTS) ঃ

১. লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (NLID) : কম্পোনেন্ট বি এবং সি।

২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো : কম্পোনেন্ট এ এবং বি।

৩. ফিজিবিলিটি স্টাডিজ (DDB, BDRI, BPRI, TMR, DTMR) : কম্পোনেন্ট ডি।

৪. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু-চেইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাজার : কম্পোনেন্ট এ ও বি ।

৫. কো-ফাইন্যান্স পদ্ধতিতে বিজনেস প্ল্যান।

৬. নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বায়োডাইজেস্টার, সোলার প্যানেল)

৭. স্কুল মিল্ক ফ্রিজিং প্রোগ্রাম: কম্পোনেন্ট বি।

আউটপুট (OUTPUTS) ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের জন্য উন্নততর সেবা প্রদান।

১. সেবা, ইনোভেশন ও বাজারীকরনের কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্ব স্ব ভ্যালু চেইনে প্রতিষ্ঠিত প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরি।

২. উন্নততর কারিগরী ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সহায়তা সেবা ।

৩. নলেজ প্ল্যাটফর্ম ও লাইভস্টক ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে নলেজ প্রোডাক্ট বিতরণ।

৪. নির্ধারিত লাইভস্টক ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করা।

৫. উৎপাদনকারী দল ও লাইভস্টক উদ্যেক্তাদের উন্নত, আবহাওয়া সহিষ্ণু ও উৎপাদকবর্ধক প্রযুক্তি আত্নীকরণ।

৬. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু চেইন অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার ।

৭. ক্রিটিক্যাল রিনিউয়েবল এনার্জি/নবায়নযোগ্য শক্তির অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা।

আউটকাম (OUTCOMES) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধন ও সহনশীলতা বৃদ্ধি।

২. প্রোডিউসার গ্রুপ ও প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নততর নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।

৩. বিভিন্ন উন্নত সুবিধাদিতে (কোয়ারেন্টাইন, ব্রিডিং, স্টোরেজ, প্রসেসিং, প্যাকেজিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, আইসিটি) এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এক্সেস।

৪. প্রকল্প এলাকাতে রিনিউয়েবল এনার্জির সরবরাহ বৃদ্ধি।

৫. কারিগরী ও বিজনেস এডভাইজরি সার্ভিসে প্রডিউসার গ্রুপের ও কৃষি উদ্যোক্তাদের এক্সেস বাড়ানো এবং তাদের দ্বারা বিনোয়োগে অর্থায়ন।

৬. বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ গুনগতমান সম্মত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।

ইমপ্যাক্ট (IMPACTS) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন

২. দারিদ্রতা হ্রাস

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৪. জেন্ডার ইকুইটি

৫. জনস্বাস্থ্য

সেশন -৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন, সমন্বয় ও পরিদর্শন

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, মানব ও সম্পদ এর মধ্যে সম্পর্ক
- মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়সমুহ, সমন্বয় দলগঠন ও পরিদর্শন
- দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় ?

সাধারণত দক্ষতা সম্পন্ন মানুষকে মানব সম্পদ বুঝায়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশক যা ব্যাক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং শিক্ষার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থানের নাম যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন-নূন্যতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্ত-বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে।

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ :** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. **আত্ম উন্নয়ন :** যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানব স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। পুষ্টির উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

৬. শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ এবং বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানুষ গঠন, দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ, ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার, শিষ্টাচারের সঠিক অনুশীলনই মানুষকে সম্পদে উন্নীত করে।

সমন্বয় (Co-ordination)

সমন্বয়ক ঃ যিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অথবা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তাকে সমন্বয় সাধনকারী, সমন্বয়কারী বা সমন্বয়ক বলে। সমন্বয়ক তাকেই বলে যিনি প্রশ্ন, উত্তর ও মন্তব্য অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। যিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্যে সংগতি, সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্যকে বহুদূর এগিয়ে নিতে পারে তিনি ভাল সমন্বয়ক।

পরিদর্শন বলতে কি বুঝায় ?

কোন প্রতিষ্ঠানে গমন করে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, উন্নয়ন, সমস্যা, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে তাকে পরিদর্শন বলে। যেখানে পরিদর্শন করা হয় সেখানে সাধারণ ভাবে উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যয় নির্বাহ কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ,

জনবল, হাজিরা, রেকর্ড পত্র রেজিস্টার মূল্যায়ন ও নিরিক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানই হলো সম্প্রসারণের ভাষায় পরিদর্শন।

পরিদর্শন ধাপ সমূহঃ

১. পরিদর্শন পরিকল্পনা (অনবোর্ড)

২. সম্ভাব্য অগ্রিম ভ্রমণ সূচী প্রস্তুতকরণ

৩. ভ্রমণ সূচী অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের এর নিকট দাখিল

৪. অনুমোদিত ভ্রমণ সূচী মোতবেক পারিবারিক/বাণিজ্যিক খামারে অথবা প্রতিষ্ঠানে গমণ করে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ এবং খামার/প্রতিষ্ঠান মালিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৫. প্রতিবেদন তৈরি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান।

দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ঃ

১. চাকুরির বিধিবিধান ও রীতি-নীতি মেনে চলা।

২. অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে কর্মোপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা।

৩. কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা।

৪. কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ এবং আন্তরিক হওয়া।

৫. যে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করা।

৬. অফিসে সময়মত উপস্থিত হওয়া।

৭. গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা।

৮. কারও ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়কে অফিসের সাথে সম্পৃক্ত না করা।

৯. প্রতিটি কাজে মাত্রা জ্ঞান রাখা।

১০. দাপ্তরিক কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

১১. দায়িত্ব গ্রহণের সময় কাজের পরিধি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

১২. অসমাপ্ত কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩. প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বদা সতর্ক থাকা।

১৪. Chain of Command এর বিষয়ে নিজে শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও অপরকে উৎসাহিত করা।

১৫. যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক তাড়াহুড়া না করা।

১৬. দাপ্তরিক ফাইলনোট, নথি, চিঠিপত্র স্বাক্ষরের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা।

১৭. কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলে তা সুষ্ঠুভাবে সমাধানের চেষ্টা করা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।

১৮. অফিসে বিলম্ব হলে উপযুক্ত কারণ ব্যখ্যা করা।

১৯. দক্ষ ও সৎ কর্মীকে পুরষ্কৃত করা।

২০. শুদ্ধাচার রীতি-নীতি মেনে চলা।

২১. দলীয় মনোভাব নিয়ে কাজ করা।

২২. সহকর্মীদের কাজের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা।

২৩. সরকারী পত্র লেখার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাষা প্রয়োগ করা।

২৪. নাতিদীর্ঘ পত্র লেখা।

২৫. চিঠি এবং ই-মেইল-এ বিষয়, প্রাপকের নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে লেখা।

২৬. অফিসের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

২৭. অফিস চলাকালীন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে অফিস ত্যাগ করা।

২৮. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রতি অনুগত থাকা।

২৯. ভাল কাজের দ্বারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করা।

৩০. উর্দ্ধতন অফিসার অফিস কক্ষে এলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।

৩১. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ডেকে পাঠালে যথা সম্ভব দ্রুত হাজির হওয়া।

৩২. উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বিধি বহির্ভূত নির্দেশনা প্রদান করলে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা নম্রতা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে সে কাজ থেকে বিরত থাকা এবং বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করা।

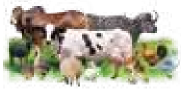

সেশন-৫

লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এলএসপি'র দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমূহঃ

১. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং প্রকল্পের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রোডিউসার অরগানাইজেশন (পিও) গঠন ও মবিলাইজেশনে সহায়তা করা।

৩. প্রোডিওসার অরগানাইজেশনের সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে কমপক্ষে ২টি সভা/ বৈঠক অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করা।

৪. প্রোডিউওসার অরগানাইজেশনের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়তা করা।

৫. প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ইউনিয়ন/ গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবা সমূহ বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা।

৬. এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত Software-এ প্রয়োজনীয় তথ্য/ ডাটা ও বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

৭. গ্রাম ও ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ জরিপ এবং পারিবারিক ও বাণিজ্যিক খামারের হালনাগাদ জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৮. পিও সদস্যদের প্রাণিসম্পদ পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ যেমন- খাদ্য, ঔষধ, মুরগির বাচ্চা, কৃত্রিম প্রজনন, ঘাসের কাটিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও সংগ্রহে সহায়তা করা।

৯. পিও ও নন-পিও নির্বিশেষে খামারীদের গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

১০. প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রযুক্তি প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

১১. ইউনিয়নের পিও সদস্যসহ অন্যান্য খামারীদের হাঁস মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণকরা।

১২. প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কম্পোনেন্ট-এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ এবং রেকর্ড সমূহ যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ।

১৩. প্রাণিসম্পদ মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহায়তা করা।

১৪. খামার পরিদর্শন ও নির্ধারিত সময় সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম সিডিউল প্রণয়ন করা এবং সিডিউল অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদন করা। প্রতিদিনের কার্যক্রম তথ্যাদি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা।

১৫. প্রকল্পের নীতি মালা অনুযায়ী প্রযুক্তি প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং বৎসর ভিত্তিক প্রকল্প'র আওতায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী ও মেলায় সহায়তা করা।

১৬. প্রকল্প দপ্তরের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমনঃ বন্যা, খরা, রোগের প্রাদুর্ভাব, দৈব দুর্ঘটনা ইত্যাদির সময় প্রাণিসম্পদের বিশেষ জরিপ পরিচালনা করা।

১৭. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা এবং চাহিদামত প্রতিবেদন দাখিল করা।

১৮. প্রতিদিনের সম্পাদিত কাজের তথ্যাদি প্রতিদিনই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা।

১৯. প্রকল্প হতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ও মালামাল প্রদান করা হবে সেগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

২০. দায়িত্ব পালনে অপারগ/অক্ষম অথবা অসমর্থ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অযোগ্য হলে PMU- হতে গ্রহণকৃত মালামাল যেমন-বাইসাইকেল, মোবাইলট্যাব, কিটবক্সসহ ইত্যাদি কর্তৃপক্ষর নিকট ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকা।

২১. দায়িত্ব পালন হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতির প্রয়োজন হলে নূন্যতম ৩ (তিন) মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করা।

২২. এলএসপি পদে যোগদানের পর অন্তত এক বছর কর্ম কালের পূর্বে নিজ দায়িত্ব থেকে বিরত/অপারগতা প্রকাশ করলে প্রশিক্ষণ বাবদ যাবতীয় খরচ ফেরৎ প্রদান করা।

২৩. দায়িত্বপালনে কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পরবর্তী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

২৪. প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সকল নিয়মকানুন মেনে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

সেশন-৬

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা
- উপাত্ত ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার

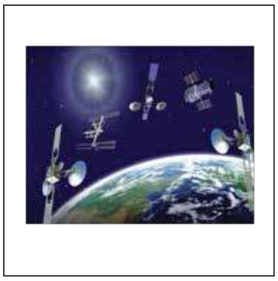

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং তথ্যসম্পর্কিত এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার, মিডলওয়্যার তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারে তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়। অন্য ভাবে বলা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো "যে কোনো প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি"।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারি। তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা এখন জানবো। ব্যাক্তিগত ও সামাজিকভাবে যোগাযোগ করতে আমরা মোবাইল ফোন, টেলিফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করছি। এগুলো ব্যবহারে তথ্য আদানপ্রদানে আমাদের জীবনযাত্রা গতিশীল হয়েছে। ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা যায়।

ব্যাক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে ঃ

ব্যাক্তিজীবনে, সমাজ জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের কাজের গতিকে রকেটের গতি প্রদান করেছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

শিক্ষাক্ষেত্রে

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে এখন স্কুলে পড়ানো হয়। একগাদা বইয়ের বদলে এখন ট্যাব ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায়। যেখানে হাজার হাজার বই সেভ করে রাখা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। পূর্ববর্তী সময়ে একটি তথ্য খুঁজে পেতে শত শত বই ঘাটতে হতো কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুহুর্তের মধ্যেই যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে www.nctb.gov.bd ওয়েভসাইট থেকে শিক্ষাবোর্ডের প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক-এর সফট পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করা যায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যপক উন্নতি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা যায়।

বিজ্ঞান এবং গবেষণা

বিজ্ঞান এবং গবেষণায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যপক অবদান রাখছে। যেমন আমাদের দেশের পাটের জিনোম আবিষ্কারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এখন ই-নথি এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার, ই-মেইল, স্ক্যানার মেশিন, প্রিন্টার মেশিন, বারকোড রিডার, ই-উপস্থিতি মেশিন, ট্যাবলেট, এনড্রয়েড ও আইওএস স্মার্টফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দাপ্তরিক কাজে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও গুরুত্ব

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখন অফিস আদালতের কার্যক্রম ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়েছে। সকল দপ্তরের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম, তথ্য, আদেশ, নির্দেশনা প্রকাশ করা যায়। ইন্টারনেটের সুফলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ সহজ হয়েছে। ইমেইল এর মাধ্যমে অতি সহজে এবং দ্রুত চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হচ্ছে। ইন্টারনেটের সুবিধার ফলে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের আবেদন প্রেরণ ও গ্রহন করা যায়। মোট কথা দাপ্তরিক কাজকে অনেক সহজ ও জবাবদিহিমূলক করেছে ইন্টারনেট।

সেশন - ৭

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- যে যে যন্ত্রগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়
- কম্পিউটার পরিচিতি
- মোবাইল ট্যাব এর পরিচিতি, ব্যবহার, অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ও এ্যাপস গুলোর পরিচিতি এবং গুরুত্ব
- মোবাইল স্মার্ট ফোন এর পরিচিতি, ব্যবহার, অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ও এ্যাপস গুলোর পরিচিতি এবং গুরুত্ব
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

যে যে যন্ত্রগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট পিসি, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ওয়েব ক্যাম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্যানার, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার, রাউটার, ওয়াইফাই ডিভাইস, প্রেনড্রাইভ, মডেম ইত্যাদি।

কম্পিউটার পরিচিতি ঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীতে যে বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়েছে তার পেছনে যে যন্ত্রটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার। কম্পিউটার শুধুমাত্র একটি বিশাল মনিটর, সিপিইউ এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নয়, বর্তমানে কম্পিউটার অনেক ছোট হয়ে এসেছে। যেমন- সুপার কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি। এগুলো কম্পিউটারের বিভিন্নরূপ।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ঃ

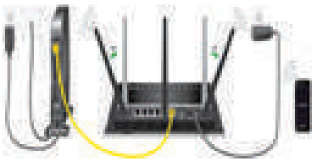

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারঃ

কম্পিউটার বানাতে সংশ্লিষ্ট যেসকল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পার্থিব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় যেমন মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, রম, মাউস, কীবোর্ড, মনিটর ইত্যাদিকে বুঝায়।

সফটওয়্যারঃ

কম্পিউটারের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করার জন্য এতে যে প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সফটওয়্যার। যেমন- আমরা কম্পিউটারে এই বইটি লেখার জন্য একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করছি। সেটা হলো মাইক্রোসফট অফিস-২০০৭। এটি একটি প্রোগ্রাম যাকে আমরা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলি। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয়।

ট্যাবলেট পিসি-এর পরিচিতি, ব্যবহার, অপারেটিং সিস্টেম ঃ

ট্যাবলেট পিসিঃ

কম্পিউটার প্রথম আবিষ্কারের সময় অনেক বড় আকারের ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৮ ইঞ্চি বড় একটি ডিভাইসে কম্পিউটারের সব কাজ করা যায়। এটিকে বলা হয় ট্যাবলেট পিসি।

ট্যাবলেট পিসি এর ব্যবহারঃ

বর্তমান বিশ্বে ট্যাবলেট পিসি এর ব্যবহার ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কারণ অনেক বড় ডেস্কটপ বা বড় কম্পিউটার সেট সাথে বহন করে নিয়ে এখানে সেখানে যাওয়া যায় না। কিন্তু ট্যাবলেট পিসি ছোট ও ওজন খুব কম হওয়ায় এটি সেখানে সেখানে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। মুহুর্তের কাজ মুহুর্তে করা সম্ভব। যেমন- তাৎক্ষণিক ই-মেইল, ওয়েব ব্রাউজিং, ডমুমেন্ট তৈরি করা ইত্যাদি। এমনকি এটি দ্বারা ছবিও তোলা সম্ভব।

মোবাইল স্মার্ট ফোন এর পরিচিতি ও ব্যবহার ঃ

স্মার্টফোনঃ

স্মার্টফোন হলো ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি পরিমাপের ছোট এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে কম্পিউটারের মতো বিশাল যন্ত্রের কাজটি এতে করা সম্ভব। বিশ্বের সর্বপ্রথম স্মার্টফোন বাজারে আনে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপল কোম্পানী। তারপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয় যা বর্তমানে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে।

স্মার্টফোনের ব্যবহারঃ

- ✓ কথা বলার পাশাপাশি উচ্চমানের ছবি তুলতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা হয়।
- ✓ স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনের জিপিএস ট্র্যাকার ব্যবহার করে লোকেশন জানা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি এবং ই-মেইল করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ওয়াইফাই চালু করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার, গুগল প্লাস) মাধ্যম ও ভিডিও (ইউটিউব) শেয়ারিং সাইট ব্যবহার করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনে ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, আবহাওয়া বার্তা এ্যাপস, ই-বুক পড়ার এ্যাপস, অনলাইন শপিং এ্যাপস, বিভিন্ন গেইম, বিমান-এর টিকেট কাটা, রেল টিকেট কাটা, ওয়ার্ড প্রসেসিং করা, সংবাদ পত্রের অনলাইন ভার্সন এপস ইত্যাদি সংযুক্ত করায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে আরো সহজ ও আনন্দময়।

সেশন -৮

ইন্টারনেট পরিচিতি (ওয়েভ ব্রাউজার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, গুগল, ইমেইল, জিপিএস)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট সম্পর্কে ধারণা
- ব্রাউজার পরিচিতি (মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগলক্রম, অপেরা, সাফারি ইত্যাদি) এবং ব্যবহার
- সার্চ ইঞ্জিন (গুগল, ইয়াহু, আমাজন, পিপীলিকা ইত্যাদি) ও তার ব্যবহার
- শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টানেটের ব্যবহার ও গুরুত্ব।

ইন্টারনেট ঃ

ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল হলো সারা পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার ও সার্ভার নেটওয়ার্কের সমষ্টি যা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। আইপি বা ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানে ডাটা বা তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

ওয়েবসাইট ঃ

ওয়েবসাইট বা ওয়েব সার্ভার হলো ওয়েব পৃষ্টা, ছবি, অডিও, ভিডিও ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যে সমষ্টিকে বোঝায়, যা ইন্টারনেট বা ল্যানের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। এটি একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্ট যা এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ওয়েব ব্রাউজারে স্থানান্তরিত করে ব্যবহার করে থাকে। যে ব্যক্তি ওয়েবসাইট তৈরী করে তাকে বলা হয় ওয়েব ডেভেলপার।

ব্রাউজার পরিচিতি (মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সফ্লোরার, গুগলক্রম, অপেরা, সাফারি ইত্যাদি) এবং ব্যবহার ঃ

ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী যেকোন ওয়েবপেইজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে অথবা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে অবস্থিত কোনো ওয়েবসাইটের যেকোনো লেখা, ছবি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুসন্ধান, ডাউনলোড কিংবা দেখতে পারেন। কোনো ওয়েবসাইটে অবস্থিত লেখা এবং ছবি একই অথবা ভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে আন্তসংযুক্ত (হাইপারলিংক) থাকলে একটি ওয়েব ব্রাউজার একজন ব্যবহারকারীকে দ্রুত এবং সহজে এইসকল লিঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অবস্থিত অসংখ্য ওয়েবপেইজের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। এভাবে ওয়েবপেইজের ভিতরকারের লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মধ্যে চলাচল করাকে ব্রাউজিং বলে।

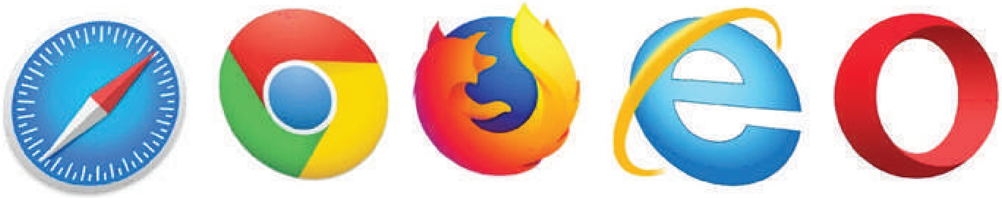

ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং তার ব্যবহার ঃ

ই-মেইল এর বর্ধিত রূপ হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল। ইলেক্ট্রনিক মেইল বা ই-মেইল এ চিঠি, ভিডিও বার্তা, অডিও বার্তা, ছবি ইত্যাদি এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় মুহুর্তের মাধ্যমেই। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কোম্পানী তাদের সার্ভারের মাধ্যমে এই ই-মেইল সেবা প্রদান করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গুগল মেইল, ইয়াহু মেইল তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটস এ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমেও ই-মেইল পাঠানো যায়। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ই-মেইল সম্পর্কে জানা ও ব্যবহার করা খুবই জরুরী।

সার্চ ইঞ্জিন (গুগল, ইয়াহু, আমাজন, পিপীলিকা ইত্যাদি) ও তার ব্যবহার ঃ

ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন বা আন্তর্জাল অনুসন্ধান ব্যবস্থা হল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা আন্তর্জালের দুনিয়াতে যে কোনো তথ্য বা ছবি খুঁজে বের করার প্রযুক্তি মাধ্যম। অনুসন্ধান ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন ক্রোলার বট এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। ইন্টারনেট অনুসন্ধান ইঞ্জিনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে। অবশ্য এর আগে ১৯৮৬ সালে হিউলেট প্যাকার্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম অনুসন্ধান ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৪ সালে চালু হয় প্রথম পূর্ণ টেস্ট ওয়েব অনুসন্ধান ইঞ্জিন ওয়েবক্রলার।

কয়েকটি সার্চ ইঞ্জিনের নাম হলো:

১. গুগল এর উৎপত্তি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় তথ্য খোঁজার সাইট।
২. পিপীলিকা এর উৎপত্তি বাংলাদেশ।
৩. ইয়াহু এর উৎপত্তি জাপান। এটিও বেশ জনপ্রিয় বিশ্বব্যাপী।
৪. বাইডু এবং এসওএসও এর উৎপত্তি গণচীনে।

সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে অনেক তথ্য সহজে আমরা ইন্টানেটের বিভিন্ন সার্ভার থেকে সংগ্রহ করতে পারি। World Wide Web এ বিদ্যমান অন্যান্য সাইট থেকে তথ্য খুঁজে নিতে সার্চ ইঞ্জিন আমাদের সহায়তা করে থাকে। যে কোন তথ্য পাওয়ার জন্য যদি আমরা গুগল এ সার্চ করি তাহলে ঐ সার্চসংশ্লিষ্ট শতশত সাজেশন্স দেখিয়ে দেয় গুগল।

সেশন- ৯, ১০

ইন্টারনেট পরিচিতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে -

- ➢ বিভিন্ন ব্রাউজারের ব্যবহার
- ➢ ই-মেইল একাউন্ট খোলা, রিপোর্ট প্রেরণ এবং ই-মেইল চেকিং
- ➢ সার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও ডাউনলোড

উপকরণ ঃ

ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, মডেম, পেনড্রাইভ

পদ্ধতিঃ

এ সেশনে প্রশিক্ষক নিজহাতে প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্রাউজারের ব্যবহার, ই-মেইল খোলা, রিপোর্ট প্রেরণ, ই-মেইল চেকিং, সার্চইঞ্জিন (ইয়াহু, গুগল) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, প্রোগ্রাম সফটওয়ারে তথ্য আপডেট বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সেশন - ১১
মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড এর পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে ধারণা
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সম্পর্ক এবং গুরুত্ব
- ওয়ার্ড প্রসেসর এর মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে কাজ চালানোর প্রক্রিয়া
  (বাংলা ও ইংরেজি কী-বোর্ড ব্যবহার কৌশল, ডকুমেন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)

ওয়ার্ড প্রসেসিং ঃ ওয়ার্ড প্রসেসিং এর অর্থ হচ্ছে শব্দ প্রক্রিয়াকরণ। কম্পিউটারের কি-বোর্ডের মাধ্যমে শব্দ টাইপ করে সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দরভাবে সাজিয়ে কাগজে ছাপানোর প্রক্রিয়াকে ওয়ার্ড প্রসেসিং বলা হয়। ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য কম্পিউটারে যে সব সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার বলা হয়। আমেরিকার বিখ্যাত মাইক্রোসপট কর্পোরেশন কর্তৃক বাজারজাতকৃত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (এম এস ওয়ার্ড) হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা একটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সম্পর্ক এবং গুরুত্ব ঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সম্পর্ক অনেক নিবিড়। কম্পিউটারে কাজ করতে গেলে ওয়ার্ড প্রসেসিং জরুরী। সফটওয়্যার থেকে শুরু করে রিপোর্ট বানানো সকল কাজে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া-

১. দলিল, প্রশ্নপত্র, চিঠিপত্র টাইপ করা, প্রিন্ট করা।
২. ডিজাইন করা।
৩. টেবিল এবং ডায়াগ্রাম তৈরি করা।
৪. ব্যক্তিগত নোট তৈরি করে সঞ্চিত রাখায় ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রয়োজন পরে।

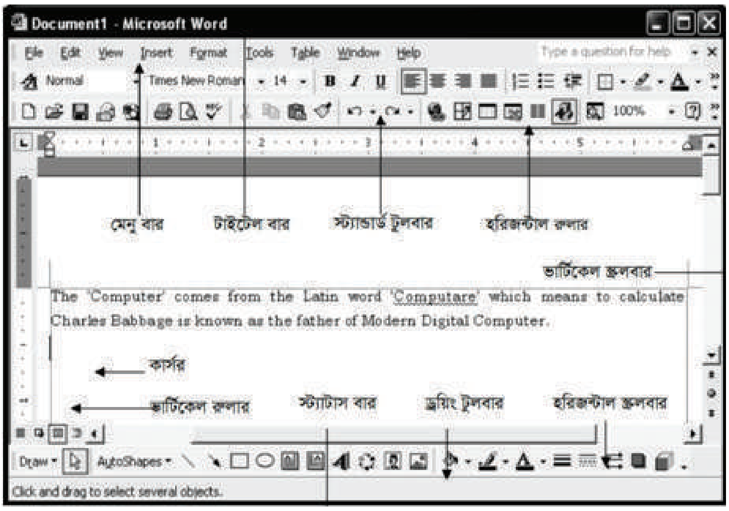
Document1 - Microsoft Word
File Edit View Insert Format Tools Table Window Help
Type a question for help
Normal Times New Roman 14
100%
মেনু বার
টাইটেল বার
স্ট্যান্ডার্ড টুলবার
হরিজন্টাল রুলার
ভার্টিকেল স্ক্রলবার
কার্সর
ভার্টিকেল রুলার
স্ট্যাটাস বার
ড্রয়িং টুলবার
হরিজন্টাল স্ক্রলবার
Draw AutoShapes

The 'Computer' comes from the Latin word 'Computare' which means to calculate
Charles Babbage is known as the father of Modern Digital Computer.

Click and drag to select several objects.

সেশন - ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫
মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- কম্পিউটারে মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড পরিচিতি ও খোলার পদ্ধতি
- দাপ্তরিক কাজে মাইক্রোসফট (এমএস) ওয়ার্ড এর ব্যবহার

উপকরণঃ

ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, মডেম, পেনড্রাইভ

পদ্ধতিঃ

এই সেশনগুলিতে প্রশিক্ষক কম্পিউটারের মাধ্যমে MS Word প্রোগ্রাম খোলা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করবেন এবং ডকুমেন্ট তৈরীর প্রাকটিস করাবেন।

সেশন - ১৬
মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল এর পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- এমএস-এক্সেল সম্পর্কে ধারণা
- এমএস-এক্সেলের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা কৌশল

এক্সেল (Excel) কি ?

Excel শব্দের আভিধানিক অর্থ শ্রেষ্ঠতর হওয়া। গুণ, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতর বা উৎকৃষ্টতর হওয়া। বিশ্বখ্যাত মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক তৈরী ও বাজারজাতকৃত এ প্রোগ্রামটি এক সাথে অনেক সমস্যা সামাধানে অন্যান্য অনেক প্রোগ্রামের থেকে শ্রেষ্ঠতর। তাই এর নামটি যথার্থ হয়েছে। উইন্ডোজ ভিত্তিক এ Application প্রোগ্রামটির সাহায্যে জটিল গাণিতিক পরিগণনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনায় নিখুঁত ভাবে চার্ট বা গ্রাফ তৈরী করা ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক জটিল কাজকে সহজে সমাপন করা যায়। এক্সেলের সুবিশাল পৃষ্ঠাটি কলাম ও সারিভিত্তিক সেলে বিভক্ত হওয়ায় এতে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করে তথ্য বিশেষণ করা যায় বলে একে স্প্রেডশীট এনালিসিস প্রোগ্রাম বলা হয়।

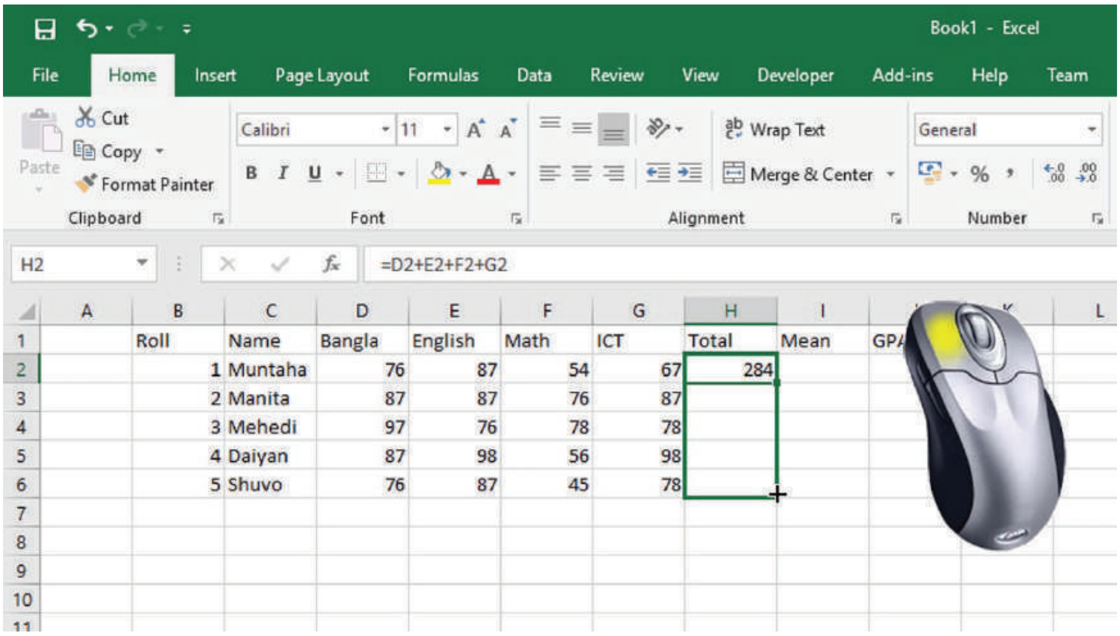
Book1 - Excel
File
Home
Insert
Page Layout
Formulas
Data
Review
View
Developer
Add-ins
Help
Team
Paste
Cut
Copy
Format Painter
Clipboard
Calibri
11
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number

H2 =D2+E2+F2+G2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Roll	Name	Bangla	English	Math	ICT	Total	Mean	GPA
2		1	Muntaha	76	87	54	67	284		
3		2	Manita	87	87	76	87			
4		3	Mehedi	97	76	78	78			
5		4	Daiyan	87	98	56	98			
6		5	Shuvo	76	87	45	78			

সেশন - ১৭, ১৮, ১৯, ২০
মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- কম্পিউটারে মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল পরিচিতি ও খোলার পদ্ধতি
- দাপ্তরিক কাজে মাইক্রোসফট (এমএস) এক্সেল এর ব্যবহার।

উপকরণঃ

ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, মডেম, পেনড্রাইভ

পদ্ধতিঃ

এই সেশনটিতে প্রশিক্ষক কম্পিউটারে MS Excel প্রোগ্রাম রান করা, Windows পরিচিতি, Spread Sheet, Work Book, বিভিন্ন ম্যানুর ব্যবহার এবং ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন।

সেশন- ২১
মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে ধারণা
- মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট উইন্ডো পরিচিতি
- মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর ব্যবহার

এমএস পাওয়ার পয়েন্টঃ

এমএস পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রেসফট অফিস সফটওয়ারের একটি প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম দ্বারা স্লাইড-শো এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র উপস্থাপনা করা যায়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সভায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনা বর্তমানে খুবই প্রচলিত।

এমএস পাওয়ার পয়েন্ট এর ব্যবহারঃ

পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য, ছবি স্লাইড তৈরি করে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থাপন করা যায়। বর্তমানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

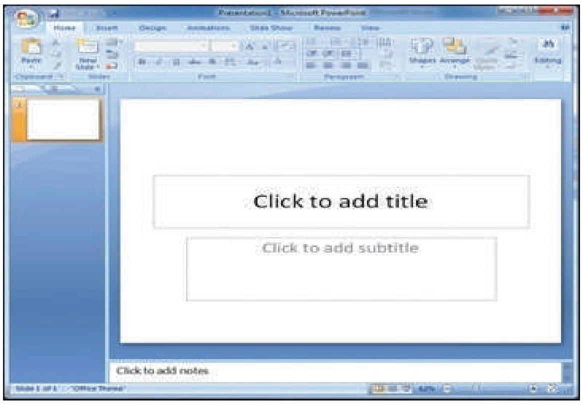

Technology

সেশন- ২২, ২৩, ২৪, ২৫
মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর পরিচিতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- কম্পিউটারে মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট পরিচিতি ও খোলার পদ্ধতি
- দাপ্তরিক কাজে মাইক্রোসফট (এমএস) পাওয়ার পয়েন্ট এর ব্যবহার

উপকরণঃ

ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, মডেম, পেনড্রাইভ

পদ্ধতিঃ

এই সেশনগুলিতে প্রশিক্ষক কম্পিউটারে MS Powerpoint প্রোগ্রামের উইন্ডো পরিচিতি, প্রেজেন্টেশন তৈরী ও প্রদর্শন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং প্রাকটিস করাবেন।

সেশন- ২৬

মাল্টিমিডিয়ার পরিচিতি ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে ধারণা
- বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া পরিচিতি
- মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

মাল্টিমিডিয়া ঃ

মাল্টিমিডিয়া এমন একটি মাধ্যম যাতে বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে (যেমন- লিপি, শব্দ, চিত্র, এনিমেশন, ভিডিও প্রভৃতি) একত্রে দর্শক/ব্যবহারকারীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া দিয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমকেও বোঝানো হতে পারে যেটির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কিত তথ্য ধারন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। মাল্টিমিডিয়া বলতে আসলে বোঝা যায় যে কম্পিউটারের তথ্যকে অডিও, গ্রাফিক্স, ছবি, ভিডিও ও এনিমেশন এবং এর সাথে লেখাও যুক্ত রেখে প্রকাশ করা যাবে।

মাল্টিমিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশগ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষালয়ে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়ার চিত্রঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়া তৈরি/রেকর্ড করা যায়। যেমন মাইক্রোফোন, ভিডিও ক্যামেরা, স্পিকার, ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার, স্ক্যানার ইত্যাদি। মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা মঞ্চে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো যায়। সম্প্রচার হচ্ছে মাল্টিমিডিযার একটি রূপ যেখানে স্থানীয়ভাবে ধারনকৃত অথবা সরাসরি কোন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয। সম্প্রচার এবং ধারনকৃত অনুষ্ঠান অ্যানালগ বা ডিজিটাল দুটি প্রযুক্তিতেই ব্যবহার করা যায। ডিজিটাল অনলাইন মাল্টিমিডিয়া অনলাইন থেকে নামিয়ে দেখা যায় অথবা সরাসরি অনলাইন থেকেও দেখা যায়।

মাল্টিমিডিয়া গেমস ব্যক্তিগতভাবে একা খেলা যায় অথবা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে অনলাইনে ইন্টারনেটে বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে একাধিক ব্যক্তি গেমসে যুক্ত হতে পারে।

সেশন-২৭

প্রাণিসম্পদ খামার ব্যবস্থাপনায় আইসিটিভিত্তিক রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- খামারে রেকর্ড সম্পর্কে ধারণা
- প্রাণি সনাক্তকরণের পদ্ধতি
- খামারে রেকর্ড রাখার সুবিধা
- একটি আদর্শ দুগ্ধখামারে রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি
- লাইভস্টক কম্পিউটারাইজড প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়ার (CPMIS) এর ধারণা

রেকর্ড ঃ

রেকর্ড বলতে নির্দিষ্ট তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা বুঝায়। রেকর্ড হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ডকুমেন্টেশন, উৎপাদনের সাথে পরিবেশগত ঘটনা যাহা একটি নির্দিষ্ট প্রাণির সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

প্রাণিসম্পদ খামারের রেকর্ড রাখার গুরুত্ব ঃ

রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ভাল প্রাণিসম্পদ ব্যবসা পরিচালনার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। কোনও লিখিত রেকর্ড না থাকলে কৃষকদের তাদের খামার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তবে স্মৃতিগুলি কয়েক দিন, মাস বা বছর পরে হারিয়ে যেতে পারে। যা খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

খামারে রেকর্ড রাখার সুবিধা ঃ

১. প্রাণির অতীতের রেকর্ড থেকে খামারের প্রাণি নির্বাচন মূল্যায়ন এবং বাছাইতে সহায়তা করে।

২. বংশবৃদ্ধি এবং পশুর ইতিহাস রেকর্ড তৈরিতে সহায়তা করে ট্রেসেবিলিটি পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাণি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

৩. পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি মূল্যায়ন করে ইনব্রিডিং প্রতিরোধ এবং ভাল প্রজনন পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করে।

৪. ষাঁড়ের বংশপরম্পরায় পরীক্ষা করতে সহায়তা করে।

৫. খাদ্য সরবরাহের ব্যয় বিশেষণে সহায়তা করে।

৬. পশুর রোগের অবস্থা সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

৭. অতীতের রোগবালাই খুঁজে পেতে এবং সময়সীমার আগে টিকা প্রদান নিশ্চিত করে।

৮. দুগ্ধ খামারের আয় এবং ব্যয় নির্ধারণে সহায়তা করে। দুধ উৎপাদনের তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।

৯. অন্যান্য খামারগুলির সাথে শ্রমের এবং পশুর দক্ষতার তুলনা করতে সহায়ক।

১০. প্রজনন ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে সহায়তা করে।

১১. টিবি ব্রুসেলোসিস সহ অন্যান্য জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সনাক্তকরণে সহায়তা করে।

১২. প্রজনন জেনেটিক্স এবং বংশানুক্রমিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

১৩. বার্ষিক লাভ / ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং খামারের জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা/ দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বছরে প্রাণির পারফরম্যান্স গুলির সাথে পারস্পরিক তুলনা করা যায়।

প্রাণি শনাক্তকরণের পদ্ধতি ঃ

১. ইয়ার ট্যাগিং (Ear Tagging)ঃ ইয়ার ট্যাগ যন্ত্রের মাধ্যমে কান ছিদ্র করে নাম্বার ট্যাগ লাগানো হয়।

২. ইয়ার টেট্টোইং (Ear Tattoing)ঃ কানে রঙ দিয়ে স্থায়ী সংখ্যা লিখা হয় যা সচারাচর ০০১ থেকে ৯৯৯ নম্বর বসানো যায়।

৩. নাম্বার ট্যাগিং (Number Tagging) গলায় চেইন পরিয়ে নির্দিষ্ট মেটালিক ট্যাগ নাম্বার লাগিয়ে দেওয়া হয়।

৪. ব্রান্ডিং (Branding)ঃ দুধাল বাছুর কে মেটালিক নাম্বার উত্তপ্ত করে চামড়ার উপর নির্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া হয়। যা চামড়ার উপর স্থায়ী দাগ পড়ে।

৫. এয়ার নোচিং (Ear Notching)ঃ কানের পাশ কেটে দিয়ে প্রাণিকে চিহ্নিত করা হয়। শুকুর, গাধাকে এরূপ করা হয়।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৫

চিত্র-৬

Livestock Management software এমন একটি সিস্টেম যা জন্ম থেকে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত পশুপালন রেকর্ড করতে এবং ট্র্যাক রাখতে কৃষকদের সহায়তা করে। এটি একটি প্রাণির সমস্ত ঘটনা রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রাণির জীবদ্দশায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হয়।

একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারে যে সকল রেকর্ড সংরক্ষণ রেজিষ্টার প্রয়োজন ঃ

১. গবাদিপশুর রেজিস্টারঃ প্রাণির জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, ওজন, বাচ্চা প্রদান তথ্য

২. ব্রিডিং রেকর্ড (Breeding Record) ঃ প্রজনন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করা হয়

৩. কাফ রেকর্ড (Calf Record) ঃ বাছুরের নাম্বার, জন্ম তারিখ, আইডি নম্বর, লিঙ্গ, ওজন

৪. ফিডিং রেকর্ড (Feeding Record) ঃ সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য, দৈনিক পরিমাণ, মজুদ তথ্য

৫. ভ্যাক্সিনেশন রেকর্ড (Vaccination Record) ঃ টিকার বিবরণ, তারিখ, পরবর্তী তারিখ, তথ্য

৬. স্বাস্থ্য রেকর্ড (Health Record) ঃ চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, রোগ নির্ণয় এবং ঔষধের খরচ তথ্য

৭. মৃত্যু রেকর্ড (Mortality Record) ঃ লিঙ্গ, বয়স, Post Mortem Report তথ্য

৮. সেলস রেকর্ড (Sale Record) ঃ বিক্রয়ের তথ্য, বিক্রয়মূল্য, বিক্রয়ের কারণ

৯. দুধ উৎপাদন রেকর্ড (Milk Record) ঃ দৈনিক, মাসিক, বার্ষিক দুধ উৎপাদন রেকর্ড

১০. জনবল রেকর্ড (Manpower Record) ঃ শ্রমিকের সংজ্ঞা, মজুরী, অন্যান্য ব্যয় তথ্য

১১. আয় ব্যয় রেকর্ড (Income and Expenditures Record) ঃ বার্ষিক আয় ব্যয় তথ্য

১. গবাদিপশুর রেজিস্টার

ক্রমিক নং	গরুর বর্ণনা		গরুর লিঙ্গ	আইডি নম্বর	গরুর বয়স	গরুর নাম/ শনাক্তকরণ চিহ্ন	মন্তব্য
	জাত	প্রাপ্তিস্থান					

২. ব্রিডিং বা প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টার

গরুর নম্বর	ডাকে আসার তারিখ	ইন্সেমিনেশন বা প্রজননের তারিখ	বীজের বর্ণনা/ ষাড়ের নম্বর/ জাত	প্রজননকারীর তথ্য		সম্ভাব্য বাচ্চা জন্মের তারিখ	মন্তব্য
				নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর		

৩. বাছুরের জন্মের রেজিস্টার

ক্রমিক নং	গাভীর নম্বর	বাচ্চা জন্মের তারিখ	বাছুরের জাত	বাছুরের নম্বার	বাছুরের লিঙ্গ	জন্মের সময় বাছুরের ওজন	মন্তব্য

৪. ফিডিং রেকর্ড বা দৈনিক খাবারের হিসাব রেজিস্টার

তারিখ :

ক্রমিক নং	তারিখ	গবাদি পশুর আইডি নম্বর	গরু প্রতি বরাদ্দকৃত সাইলেজ/সবুজ ঘাস (কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত দানাদার খাবার (কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত অন্যান্য খাদ্য উপাদান			মন্তব্য
			গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট	
মোট খাবারের পরিমাণ												

৫. ভ্যাক্সিনেশন রেজিস্টার

টিকার বিবরণ	প্রথম টিকা প্রদানের তারিখ	২য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৩য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৪র্থ বার টিকা প্রদানের তারিখ	৫ম বার টিকা প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ (FMD)						
বাদলা (BQ)						
গলা ফুলা (HS)						
তড়কা (Anthrax)						
পিপিআর (PPR)						
রেবিস						
গোট-পক্স/এলএসডি						
কৃমি নাশক	প্রথম বার	দ্বিতীয় বার	তৃতীয় বার	চতুর্থ বার	পঞ্চম বার	প্রতি তিন মাস পর পর

৬. স্বাস্থ্য রেকর্ড

প্রাণির নাম/আইডি/ ট্যাগ নাম্বার		চিকিৎসা তথ্য		রোগের বর্ণনা	
প্রাণির ধরণ		রোগ নির্ণয়		চিকিৎসকের নাম	
জাত/ব্রীড		চিকিৎসা		ঠিকানা	
ওজন				ফোন/ই-মেইল	
লিঙ্গ				চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও তারিখ	

৭. মৃত্যু রেজিস্টার

ক্রমিক নং	গবাদি পশুর আইডি নম্বর	মৃত্যুর তারিখ	মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ/লক্ষণ	লিঙ্গ	বয়স	ময়না তদন্তের রিপোর্ট

৮. সেলস রেকর্ড

ক্রমিক নং	প্রাণির বর্ণনা				বিক্রয়ের কারণ	বিক্রয় মূল্য	বার্ষিক বিক্রয়ের তথ্য	মন্তব্য
	আইডি নম্বর	লিঙ্গ	বয়স	ওজন				
১								
২								

৯. দুধ উৎপাদনের রেজিস্টার

দিনভিত্তিক দুধ উৎপাদন রেকর্ড (লি.)

মাসের নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	মোট দুধ	গড় প্রতিদিন	মন্তব্য
জানুয়ারি																																		
ফেব্রুয়ারি																																		
মার্চ																																		
এপ্রিল																																		
মে																																		
জুন																																		
জুলাই																																		
আগষ্ট																																		
সেপ্টেম্বর																																		
অক্টোবর																																		
নভেম্বর																																		
ডিসেম্বর																																		
বার্ষিক দুধ উৎপাদন:																																		
মোট দুধ উৎপাদনের দিন:																																		

১০. জনবল রেকর্ড

ক্রমিক নং	কর্মচারীর পদবী	নিয়োগের তারিখ	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	মোবাইল নম্বর	মাসিক বেতন	মন্তব্য
১									
২									

বার্ষিক আয় ব্যয় রেকর্ড

বার্ষিক আয়ের খাত

ক্রমিক নং		বিক্রয়	তারিখ	বিক্রয় মূল্য /ক্রয়মূল্য	বর্ণনা	প্রদানের ধরণ চেক/নগদ	পরিমাণ	ব্যালেন্স	মন্তব্য
ক	১	দুধ বিক্রয়							
	২	গাভী/বিক্রয়							
	৩	বাছুর/বকনা/ ষাড় বিক্রয়							
	৪	বার্ষিক মোট বিক্রয়							

১১. বার্ষিক ব্যয়ের খাত

খ	১	বার্ষিক খাদ্য খরচ							
	২	শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন							
	৩	বিদ্যুৎ খরচ							
	৪	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা খরচ							
	৫	অন্যান্য খরচ							
		মোট খরচ							
আয়(ক) - ব্যয়(খ) = নীট লাভ									

সেশন-২৮

প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- পণ্য সম্পর্কে ধারণা
- পণ্য, মূল্য সংযোজিত বা উচ্চ মূল্যের পণ্য, বাজারজাতকরণ
- বাজার ধাপ, বিপণন কৌশল, বাজার চাহিদা
- পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপনে করণীয়
- বিতরণ, বিতরণ প্রণালী ও বাজার সংযোগ

পণ্য/ সেবা ঃ

পণ্য হচ্ছে যে কোন জিনিস যা ব্যবহারের জন্য বা খাবার জন্য বাজারে ছাড়া হয়। পণ্যের মধ্যে থাকতে পারে বস্তু, সেবা, ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিক বা দর্শনীয় স্থান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। কৃষক সংগঠন যে সমস্ত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, হাঁস-মুরগী, গরু, ছাগল, মহিষ, দুধ, ডিম, মাংস, মধু, ফলমুল ইত্যাদি।

মূল্য সংযোজিত বা উচ্চ মূল্যের পণ্য ঃ

বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার পূর্বক মূল্য সংযোজন করে অধিক আর্থিক লাভ করা যায়। যেমন- দুধ থেকে দই, মিষ্টি, পনির, ঘি, মাখন, পেয়ারা থেকে পেয়ারার জেলি তৈরী, আনারস থেকে জুস ও জেলী তৈরী, আম থেকে আমের আচার ও জুস তৈরী, চাল থেকে মুড়ি ও চিড়া তৈরী ইত্যাদি। বিপণনের ভাষায় বাজার বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ককে বুঝায়। বাজার হচ্ছে একটি পণ্যের প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতা গোষ্ঠী। যেমন- সার ও বীজের বাজার হচ্ছে কৃষক সমাজ। জুতার বাজার হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষ যারা জুতা ব্যবহার করেন।

বাজারজাতকরণ ঃ

প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ বা পণ্যাদির বিনিময়ের পদক্ষেপ গ্রহণই বাজারজাতকরণ। বাজারজাতকরণ যে কোন স্থানে (হাট ও বাজার ছাড়াও) যে কোন সময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার সুবিধা অনুযায়ী সংঘটিত হতে পারে। বিপণন বা বাজারজাতকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে-

- ✓ কোন প্রয়োজন বা অভাব চিহ্নিত করা হয়।
- ✓ কার কি প্রয়োজন বা অভাব আছে তা চিহ্নিত করা হয়।
- ✓ প্রয়োজন বা সেবা মেটানে সঠিক পন্য/ সেবা চিহ্নিত করা হয়।
- ✓ পণ্য সম্পর্কে ভোক্তাদের জানানো/ প্রচার করা হয়।
- ✓ পণ্য/ সেবাকে ভোক্তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়
- ✓ ক্রেতার পছন্দনীয় ও উচ্চ ফলনশীল
- ✓ কৃষকদের নিকট পণ্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বা চাহিদা থাকতে হবে।
- ✓ পণ্যের মান ভাল হতে হবে।
- ✓ পণ্য কৃষকের দোরগোড়ায় ন্যায্যমূল্যে পৌঁছাতে হবে।।
- ✓ পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রচার করতে হবে।

বাজার চাহিদা ঃ

একটি নির্ধারিত সময়ে (যেমন ১ বৎসরে), একটি নির্দিষ্ট বাজার পরিবেশে, একটি সুনির্দিষ্ট বিপণন কর্মসূচির আওতায়, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় (উপজেলা, জেলা ইত্যাদি), একটি নির্দিষ্ট ভোক্তা বা ক্রেতাগণ যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করবে তাই সেই পণ্যের বাজার চাহিদা।

বাজার চাহিদার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় ঃ

১। পণ্য ঃ দেখতে হবে ক্রেতাগণ কী ধরণের পণ্য কিনতে আগ্রহী।

২। পরিমাণ ঃ পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ বা টাকায়।

৩। ক্রয় চাহিদা নিরুপণে ক্রয় করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতা কি এখনই ক্রয় করবেন না পরবর্তী মৌসুমের জন্য ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন।

৪। ক্রেতা গ্রুপ ঃ সকল ক্রেতা (বড় ক্রেতা, মাঝারি ক্রেতা, প্রান্তিক ক্রেতা) বা ক্রেতাদের একটি অংশবিশেষ বিবেচনা করে চাহিদা নিরুপণ করা যায়।

৫। ভৌগোলিক এলাকা ঃ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা (উপজেলা, জেলা, অঞ্চল, বিভাগ ইত্যাদি) বিবেচনা করেই চাহিদা নিরুপণ করতে হবে।

৬। সময় সীমা ঃ চাহিদা নিরুপণ সময়সীমা এক বছর, তিন বছর বা পাঁচ বছর হতে পারে।

৭। বাজার পরিবেশ ঃ বাজারের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর চাহিদা নির্ভর করে। যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

৮। বিপণন কর্মসূচি ঃ চাহিদা নিরুপনের সার্বিক বাজার মূল্য, প্রচার কর্মসূচি, পণ্যের উন্নয়ন, বিজ্ঞাপন কর্মসূচি প্রভাব রাখে।

যে কোন পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপনে করণীয় ঃ

- ✓ বাজার জরিপ
- ✓ বিগত ২-৩ বছরের প্রকৃত বিক্রয় নির্ণয়।
- ✓ বর্তমান বিক্রয়ের পরিমাণ
- ✓ ক্রেতাদের মনোভাব যাচাই।
- ✓ অন্যান্য বিক্রেতাদের বিক্রয়ের ধারা।
- ✓ পণ্যটির বৈশিষ্ট্য এবং বাজারে জনপ্রিয়তা।

বিতরণ ঃ

পণ্য উৎপাদকের পক্ষে সরাসরি বিপুল সংখ্যক ভোক্তাদের নিকট পণ্য বিতরণ সম্ভব নয়। বিতরণ প্রণালী উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে।

বিতরণ প্রণালী ঃ

বিতরণ প্রণালী হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান সমূহের জোট বা সংগঠন যারা ভোক্তাদের ভোগের জন্য বা ব্যবহারের জন্য কোন পণ্য বা সেবার বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

বিতরণ প্রণালীর উদ্দশ্য ঃ

- ✓ বিক্রয় বৃদ্ধি করা।
- ✓ সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে পণ্য পৌছানো।
- ✓ পণ্য দ্রুত সরবরাহ করা।
- ✓ উৎপাদনকারী ও ভোক্তার দূরত্ব হ্রাস করা।
- ✓ সেবার পরিসর বাড়ানো।
- ✓ লেনদেনের ধাপ কমানো।
- ✓ বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস।
- ✓ পরিবহণ ঝুঁকি হ্রাস।
- ✓ ক্রেতা অনুসন্ধান।
- ✓ কর্মসংস্থান।

বাজার সংযোগ/ মার্কেট লিংকেজ ঃ

কৃষক সংগঠনগুলো বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি হাতে নিতে পারে। গ্রাম অঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় সেগুলি হচ্ছে- হাঁস-মুরগী উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গরুর খামার তৈরী, নার্সারী স্থাপন, ফলচাষ, সবজি উৎপাদন, হস্তশিল্প ইত্যাদি। উৎপাদিত পণ্য সময়মত ও লাভজনকভাবে বাজারজাতকরণের জন্য ক্লাব নেতৃবৃন্দকে নিম্নবর্ণিত ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত সংযোগ/সমন্বয় রক্ষা করতে হবে-

- ✓ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের পাইকারী ব্যবসায়ী।
- ✓ স্থানীয় পরিবেশক ও আড়তদার/খুচরা ব্যবসায়ী।
- ✓ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ব্যবসা সংগঠন।
- ✓ পরিবহন মালিক সমিতি।
- ✓ কৃষক সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠন ।
- ✓ ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত পাইকারী বাজার।

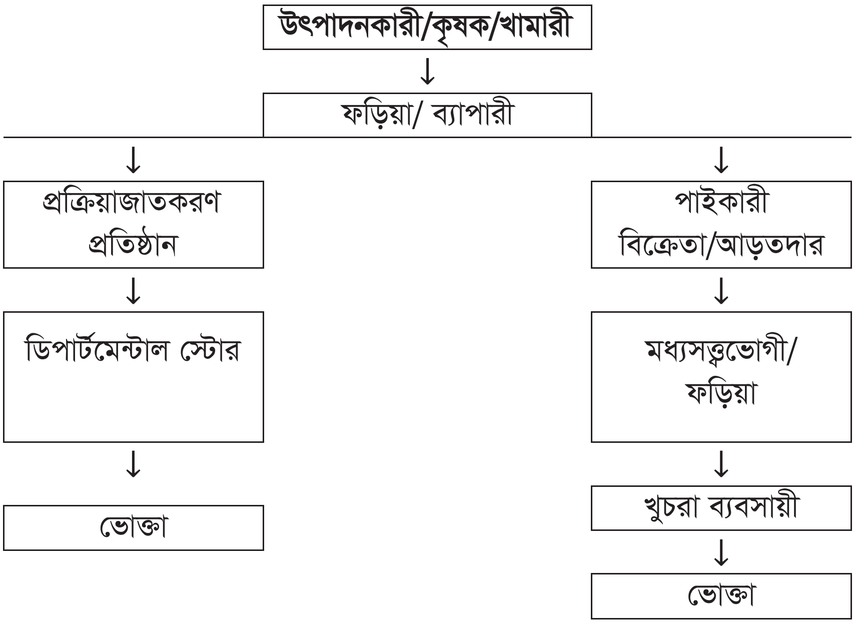
উৎপাদনকারী/কৃষক/খামারী
ফড়িয়া/ ব্যাপারী
প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান
পাইকারী বিক্রেতা/আড়তদার
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
মধ্যসত্ত্বভোগী/ ফড়িয়া
ভোক্তা
খুচরা ব্যবসায়ী
ভোক্তা

সেশন-২৯

উদ্যোক্তা, প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্যোক্তার উন্নয়ন

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ উদ্যোক্তার ধরণ
- ➢ ভাল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য
- ➢ মূল্য, প্রচার কাজ

প্রাণিসম্পদ খাত কৃষি খাতের এক গুরুত্বপূর্ণ খাত। GDP-তে এর অবদান প্রায় ২.৫%। ফসল খাতের প্রেক্ষিতে এ খাত খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্যপুষ্টি ও কর্মসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বল্প জমি ও কম মৌসুমী প্রভাব সত্ত্বেও পোল্ট্রী ও ডেইরি ফার্মিং এ ফসল, মৎস্য ও বন থেকেও অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছে। ডেইরি এবং পোল্ট্রি সেক্টরকে সমন্বিতভাবে প্রাণিসম্পদ খাত বলে।

উদ্যোক্তা (Entrepreneur) ঃ

একজন ব্যাক্তি যে অন্যের কর্মচারি না হয়ে নিজেই কোন প্রকল্প সংগঠিত করে অর্থনৈতিক ঝুঁকিসহ মুনাফা/লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন, তিনিই উদ্যোক্তা। একজন উদ্যোক্তা যিনি সর্বদা নতুন কিছু ধারণা ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অনুসন্ধান করেন এবং জ্ঞান, দক্ষতা, পুজি কাজে লাগিয়ে লাভজনক ব্যবসা অর্জনের প্রক্রিয়াকে Entrepreneurship বলে।

উদ্যোক্তা বিভিন্ন ধরনের ঃ

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা
২. বড় ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা
৩. সামাজিক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা

কিভাবে উদ্যোক্তা হওয়া যায় ঃ

- ব্যবসার ধরন খোঁজা (Find your business)
- বাজার গবেষণা (Market Research)
- ধীরে ধীরে ব্যবসা পরিচালনা করা (Build your business slowly)

ভাল উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- সুশৃঙ্খল (Disciplined)
- আত্মবিশ্বাস (Confidence)
- খোলামন (Open Minded)
- স্বচালক (Self Starter)
- শক্তিশালী জন যোগাযোগ দক্ষতা (Strong communication skill)
- শক্তিশালী কর্মনীতি (Strong work principle)
- প্রতিযোগিতাপ্রবণ (Competitive)
- সৃজনশীলতা (Creativity)
- দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (Determination)
- ক্রেতা বান্ধব (Customer oriented)
- ঝুঁকি নেয়া এবং ব্যর্থতার ভয়ে ভীত নয়
- কাজের প্রতি তীব্র আসক্তি (Passion)
- নমনীয়তা (Humility)

উদ্যোক্তার বাজারজাত করণের সফলতা নির্ভর করে ৪টি মৌলিক উপাদানের উপর

- পণ্য (Product)
- মূল্য (Price)
- স্থান (Place)
- প্রচার (Promotion)

পণ্য (Product) ঃ

- মান সম্মত (Quality)
- ডিজাইন (Design)
- মোড়কীকরণ (Packaging)
- পণ্যের বৈশিষ্ট্য (Feature)
- রং (Colors)
- আকার (Size)

মূল্য (Price) ঃ

- মোড়কীকরণ (Packaging)
- আকার (Size)
- ডিসকাউন্ট (Discount)
- সময় (Timing)
- লোকেশন (Location)
- শিপিং (Shipping)
- অন্যান্য

স্থান (Place) ঃ

- তথ্য আদান প্রদান
- মজুদ মালের তালিকা (Inventory)
- পণ্য সরবরাহের কৌশল (Logistics)
- বণ্টন (Distribution)
- পণ্য সরবরাহের কৌশল (Logistics)
- বণ্টন (Distribution)

প্রচারকাজ (Promotion) ঃ

- প্রচারমূলক কাজ (Advertising)
- বিক্রয়কর্মী (Sales force)
- বিজ্ঞাপণ (Publicity)
- বিক্রয় উৎসাহ (Sales Promotion)

কাস্টমার এর দিক থেকে বিবেচনা করা হলে-

- ক্রেতার সমস্যার সমাধান (Customer satisfaction)
- খরচ (Cost)
- সহজতা (Convenience)
- ভাব বিনিময় (Communication)

এখন বাজারজাত সংক্রান্ত বিষয়ে আরও উন্নত চিন্তা করা হচ্ছে। সেটি হচ্ছে ৪ ‘এ’ ঃ

- ক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্যতা (Accessibility)
- ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার সামর্থ্য (Affordability)
- ক্রেতা সহজেই পণ্যের কাছে পৌছতে পারে (Accessibility)
- ক্রেতাকে অবহিতকরণ (Awareness)

সেশন-৩০

প্রাণিজাত পণ্যের সাপ্লাই চেইন, ভ্যালুএ্যাডিশন ও ভ্যালুচেইন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রাণিসম্পদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ
- সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা
- ভ্যালুচেইন ও মূল্য সংযোজন
- ডেইরি ভ্যালুচেইন ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ ঃ

পোল্ট্রি- ডিম, মাংস, দুধ।

ডেইরি- প্যাকেটজাত দুধ, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য- বাটার, চিজ, আইসক্রিম, দই, হিমায়িত এবং শুকনো গুড়ো দুধ।

সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ঃ

সরবরাহ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন সংগঠন এবং এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং একত্রীকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জন হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা।

সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ ঃ

সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, বণ্টনকারী বা প্রবেশক পাইকার, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা বা ক্রেতা এরা সকলেই হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ।

সাপ্লাই চেইনের মূল উদ্দেশ্য ঃ

সর্বোচ্চ ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সাপ্লাই চেইনের কোন বিষয়ের প্রবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

সাপ্লাই চেইন কাঁচামাল, পণ্য, সেবা, তথ্য এবং অর্থের প্রবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সাপ্লাই চেইন কৌশল ঃ

সাপ্লাই চেইন কৌশল কাঁচামাল সংগ্রহের প্রকৃতি পরিবহনের ধরন, উৎপাদন, বণ্টন, বিক্রয়োত্তর সেবা ইত্যাদি।

সাপ্লাই চেইনের পরিকল্পনা ঃ

ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাপ্লাই চেইন কি কি কার্য সম্পাদন করবে তার অগ্রিম নকশা প্রনয়ণই হচ্ছে সাপ্লাই চেইন পরিকল্পনা।

সরবরাহ লজিস্টিকস ঃ

সাপ্লাই চেইন প্রক্রিয়ায় অংশ যা ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎস থেকে ভোক্তার নিকট পণ্য সেবা এবং তথ্যের দক্ষ এবং কার্যকর প্রবাহের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

ভ্যালু (Value) ঃ

ভ্যালু হচ্ছে পণ্য বা সেবার গুণগতমান (Quality), অনন্যতা (Exclusivity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), সুবিধা (Convenience) ইত্যাদি। ভ্যালু, মূল্যায়ণ করা হয় পণ্যের কার্য ক্ষমতা, সরবরাহের গতি, বিক্রয় পরবর্তী সেবা এবং ব্যয়। একটি পণ্য বা সেবা থেকে ক্রেতার প্রত্যাশা এবং সেই পণ্য বা সেবার জন্য ক্রেতার ব্যয় এ দুয়ের পার্থক্য হল ভ্যালু (Value) যেমন ১ হালি ডিম ক্রয় করা হল। তার মধ্যে ১ টি পচা পাওয়া গেল। ক্রেতার প্রত্যাশার চেয়ে ব্যয় বেড়ে গেল। অর্থাৎ এখানে ভ্যালু কমে গেল।

মূল্য সংযোজন (Value addition) ঃ

বাছাইকরণ (Sorting), গ্রেডিং (Grading), মোড়কীকরণ (Packaging) এবং হিমাগারে সংরক্ষণ ইত্যাদি ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে। যদি ভ্যালু সংযোজিত না করা হয় তবে তাকে সাপ্লাই চেইন বলা হবে।

ভ্যালু চেইন (Value Chain) ঃ

কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্য/ সেবা পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখন ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে।

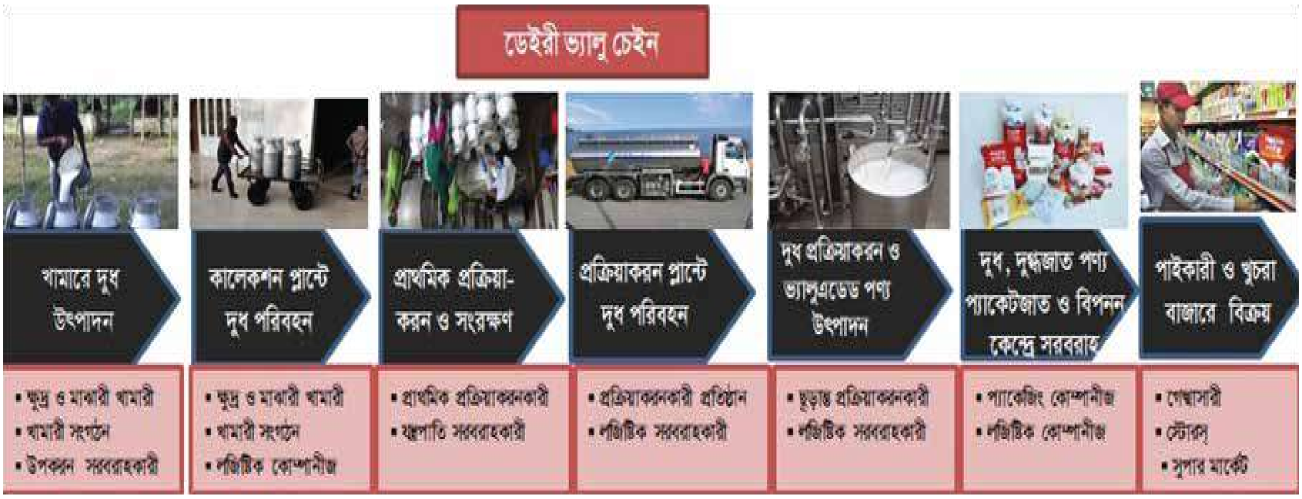
ডেইরী ভ্যালু চেইন
খামারে দুধ উৎপাদন
কালেকশন প্লান্টে দুধ পরিবহন
প্রাথমিক প্রক্রিয়া-করন ও সংরক্ষণ
প্রক্রিয়াকরন প্লান্টে দুধ পরিবহন
দুধ প্রক্রিয়াকরন ও ভ্যালুএডেড পণ্য উৎপাদন
দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য প্যাকেটজাত ও বিপনন কেন্দ্রে সরবরাহ
পাইকারী ও খুচরা বাজারে বিক্রয়
• ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারী
• খামারী সংগঠন
• উপকরন সরবরাহকারী
• ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারী
• খামারী সংগঠন
• লজিষ্টিক কোম্পানীজ
• প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরনকারী
• যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী
• প্রক্রিয়াকরনকারী প্রতিষ্ঠান
• লজিষ্টিক সরবরাহকারী
• চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরনকারী
• লজিষ্টিক সরবরাহকারী
• প্যাকেজিং কোম্পানীজ
• লজিষ্টিক কোম্পানীজ
• গোদ্ধাসারী
• স্টোরস্
• সুপার মার্কেট

খামারে দুধ উৎপাদন → পরিবহন → প্রক্রিয়াজাতকরণ → মোরকীকরণ → বিক্রয়কেন্দ্র

সেশন-৩১

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) পরিচিতি ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- পিআরএ (PRA) সম্পর্কে ধারণা
- পিআরএ বনাম অন্যান্য জরিপ
- পিআরএ এর সুবিধাদি ও সীমাবদ্ধতা
- পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগের মূলভিত্তি
- পিআরএ পদ্ধতির বিবেচ্য বিষয় ও প্রধান কৌশল

পিআরএ (PRA) কী ?

P= অংশগ্রহণমূলক (Participatory) ঃ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ- একটি বটম আপ এ্যাপ্রোচ যেখানে প্রকল্প জনবলের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাল যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

R = গ্রামীণ (Rural) ঃ সমীক্ষার বিভিন্ন কৌশলসমূহ যে কোন অবস্থায় যেমন গ্রাম বা শহরে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগণের সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে।

A = সমীক্ষা (Appraisal) ঃ সমীক্ষা হলো গ্রামীণ সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার পদ্ধতি।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal) হল এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের তথা এলাকার মানুষকে তাদের নিজেদের জীবনের ও পরিবেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে, বহিরাগতদের সংগে মত বিনিময় করতে এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারকী ও মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য যোগায়।

অর্থাৎ PRA-কে প্রায়শ:ই "এক ঝুড়ি কৌশল" হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সকল কৌশল গ্রামবাসীদেরকে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম, চার্ট বা মানচিত্র তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে যার মাধ্যমে ঐ সকল গ্রামবাসীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

পিআরএ বলতে গ্রামের বা এলাকার জনগণের দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি হল পিআরএ অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প তাদের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও সমাধান নির্ণয় করাকেই পিআরএ বলা হয়।

পিআরএ বনাম অন্যান্য জরিপ

পিআরএ	অন্যান্য জরিপ
যে সব উপাত্ত প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে কেবল সে সব উপাত্তই সংগৃহীত হয়।	পরে ব্যবহৃত হয় না বা কাজে লাগে না এমন সব উপাত্তও সংগৃহীত হয়।
উপাত্তে কোন রকম তথ্য ঘাটতি থাকলে আলোচনা করে তা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব।	একবার উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে বাদ পড়া তথ্য বা ভুলভাবে নেওয়া তথ্য সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
দল ও সমাজ কর্তৃক সাবেক ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের ভিত্তির ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব।	পূর্ব নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহপত্র (Questionnaire) ব্যবহার করে তা সম্ভবপর হয় না।
'কেন' এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।	'কেন' এর বদলে 'কী' এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

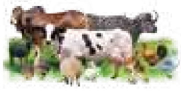

পিআরএ এর সুবিধাদি ঃ

১. অভীষ্ট দলের জন্য যথার্থ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ :
   পিআরএ কৌশল স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরুতেই স্থানীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাতিল করা যায় ।

২. স্থায়িত্ববোধের সঞ্চার :
   স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কোন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন হয় বিধায় এর সকল দায়িত্ববোধ অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে সঞ্চারিত হয়। ফলে বাস্তবায়ন কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল হয়।

৩. স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও ব্যবহার :
   পিআরএ'র মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় বিধায় উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় কর্মী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়। তাদের কর্মস্পৃহা উজ্জীবিত করা যায় এবং শ্রমের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে অধিকতর কার্যকর যোগাযোগ :
   উন্নয়নের প্রাথমিক সুফলভোগী স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের সহায়তাদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্টতর এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যাবলী পূরণ হয়।

৫. স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার :
   স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সম্পদের খোঁজ স্থানীয় লোকেরাই ভাল জানেন। ফলে পিআরএ'র মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সন্ধান লাভ ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৬. সামাজিক সম্পদসমূহের ব্যবহার :
   স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তিকরণ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য অন্যান্য সম্পদ যেমন- অর্থ, সঞ্চয়, সময় ইত্যাদি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৭. অধিক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড :
   এ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারী পরোক্ষ প্রভাব অন্যত্রও অনুভূত হয়। ফলে বাইরের সাহায্য-সহায়তা ছাড়া কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় জনগণের উদ্যোগেই আরম্ভ হতে পারে।

পিআরএ এর সীমাবদ্ধতা ঃ

১. বাস্তবায়ন অসম্ভব এমন সব আশা জাগিয়ে তুলতে পারে: পিআরএ'র ফলে স্থানীয় জনগণের মাঝে এমন কিছু বাড়তি আশা তৈরি হতে পারে যা স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে হতাশা গ্রাস করতে পারে, জনগণকে নিরুদ্যম করতে পারে।

২. দূরত্বের সৃষ্টি: এমন সব উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব স্থানীয় জনগণের নিকট হতে আসতে পারে যা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনাসমূহ এমন কি বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৩. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করার ব্যর্থতা: ধনী-গরীব, তথাকথিত উচ্চ বংশ এবং নিম্ন বংশজাত, নারী-পুরুষ, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এসবের উপস্থিতি বুঝতে না পারা বা বুঝতে পারলেও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকলকে সম্পৃক্ত করায় বহিরাগতদের ব্যর্থতা পুরো পিআরএ কার্যক্রমকে কম কার্যকর এমনকি ব্যর্থও করে দিতে পারে।

পিআরএ বাস্তবায়নে একজন সহায়তাকারী-

১. গ্রামবাসীদের প্রতি বিনম্র হবেন
২. আগ্রহী/উৎসাহী হবেন
৩. স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হবেন
৪. সহায়তাদানে ইচ্ছুক হবেন
৫. প্রয়োজনে সকলের সাথে সরাসরি যোগাযোগে সচেষ্ট থাকবেন
৬. দলের সাথে বসবেন (অর্ধ-বৃত্তাকারে)
৭. একজন অনুঘটক হিসেবে কাজ করবেন
৮. বলার চেয়ে শোনায় বেশি আগ্রহী থাকবেন
৯. অভীষ্ট দলের নিকট শিখতে আগ্রহী হবেন
১০. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
১১. নিজের মতামত আরোপের চেষ্টা করবেন না
১২. সঠিক প্রশ্ন সঠিকভাবে করবেন
১৩. বিব্রত করার মত প্রশ্ন করবেন না
১৪. শ্রদ্ধাসহকারে ও বিনীতভাবে প্রশ্ন করবেন
১৫. একবারে কেবল একটি প্রশ্নই করবেন
১৬. প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানাবেন
১৭. উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন করবেন
১৮. খোলামেলা প্রশ্ন করে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেবেন
১৯. উত্তর সঠিক হলো কিনা তা জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করবেন
২০. যে কোন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
২১. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

পিআরএ বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়ঃ

১. খামার বিষয়ক জ্ঞান ঃ

খামারীর খামার বিষয়ক জ্ঞানের অবস্থা জানলে তাঁর/তাদের জন্য কার্যকর ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়াদি প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব। প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতিও এর ওপর নির্ভরশীল।

২. পরিবেশ ঃ

পরিবেশ একটি দ্বিমুখী বিষয়। বাহ্যিক পরিবেশ খামারীকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এটি জানার পাশাপাশি খামার পরিচালনা বিশেষ করে নিবিড় পদ্ধতির ব্যবহার, পরিবেশের ওপর এর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে জানা জরুরী।

৩. উপকরণ ঃ

লাভজনক খামার গড়তে হলে ভাল জাতের প্রাণি/পাখি প্রয়োজন। একটি খামার স্থাপনের পূর্বে উপকরণের প্রতুলতা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে । এটি কেবল কারিগরি দিক থেকেই বিবেচ্য নয়, ব্যবহার-অধিকার এবং আর্থিক বিনিয়োগের দিক থেকেও সমভাবে বিবেচ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৪. মৌসুম ঃ

বর্ষা মৌসুমে কৌশলগত ধান ক্ষেতে হাঁস পালন করলে ধান ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা খামারীর খাদ্য খরচ কমানোর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে ।

৫. অভীষ্ট দল চিহ্নিতকরণ ঃ

অভীষ্ট দল চিহ্নিতকরণ যে কোন গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গ্রামে কাদেরকে নিয়ে কাজ করলে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে পদক্ষেপ রাখা যায় তা PRA দ্বারা সুন্দরভাবে নির্ণিত হতে পারে।

৬. শ্রম ও সময় ঃ

খামারীর শ্রম ও সময় গুরুত্বপূর্ণ উপাদন। কী পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়া এবং সময়মত দেওয়া- দুটোই আলোচনায় প্রাধান্য পাবে যা পরবর্তীতে কার্যকর প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশে পরিণত হবে।

৭. জেন্ডার ঃ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন তথা গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকর্মের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলে এ বিষয়ের সুব্যাখ্যা ও উপলব্ধি সৃষ্টিতে PRA'র ভূমিকা অপরিসীম।

৮. খামারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

শুধু প্রভাব নিরূপণ (impact) সমীক্ষার জন্যই নয়, পিআরএ'র মাধ্যমে খামারীর অবস্থা জানা গেলে খামার-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা অতীব সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৯. প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ঃ

খামারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদের উপর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে খামারীদের অবস্থান এবং পরবর্তীতে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পিআরএ মারফৎ জানা সম্ভব।

১০. প্রাণিসম্পদ ঋণ ঃ

অন্যান্য যে কোন খাতের ন্যায় খামার স্থাপনেও ঋণের প্রয়োজন আছে। কত ঋণ দরকার কেবল তা নিরূপণ করাই নয়, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সাথে জড়িত করার ব্যাপারেও পিআরএ মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ উভয় ক্ষেত্রেই এর সীমা বিস্তৃত।

১১. উৎপাদিত প্রাণি, প্রাণিজাত পণ্য এবং নগদ অর্থ ঃ

খামারে যে প্রাণী ও প্রাণীজাত পণ্য উৎপাদিত হবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খুবই ছোট আয়তনের বেলায়, কেবল পরিবারের খাদ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন কোন খামারী পুরো বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে কেবল নগদ অর্থ প্রাপ্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। তবে বৃহদাংশ খামারী একে খাদ্য ও নগদ অর্থ প্রাপ্তির উৎস, উভয় হিসেবেই গ্রহণ করতে পারেন। এর যে কোন ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে এবং সার্বিক উৎসাহ যোগাতে পিআরএ ভূমিকা রাখতে পারে।

১২. চাহিদা ও বাজার ঃ

পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য যেমন- ডিম, দুধ ইত্যাদি বাজারে বিক্রয়ের জন্য বা উভয়ক্ষেত্রের চাহিদার ভিত্তিতে সার্বিক খামার ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে প্রজাতি নির্বাচন, বিক্রয় পরিমাণ, বিক্রয় সময়, ইত্যাদি বিবেচিত হবে। পিআরএ'র মাধ্যমে গ্রামব্যাপী একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হতে পারে। সম্পর্ক স্থাপনের পর PRA পরিচালনার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল বা কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হবে।

পিআরএ'র প্রধান কৌশলসমূহ ও ব্যবহার

কৌশলসমূহ	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
পরিভ্রমণ (Walk)	গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটার মাধ্যমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে জানা, স্থানসমূহের ভূমির গঠন, ব্যবহার, উৎপাদন, সমস্যা ইত্যাদি জানা।
সামাজিক মানচিত্রায়ণ (Social Mapping)	সাধারণভাবে গ্রামের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা
সম্পদ মানচিত্রায়ণ (Resource Mapping)	গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা। যথা-ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, নদী-খাল-পুকুর, ফসলের জমি, বনভূমি ইত্যাদি।
আর্থিক স্বচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (Wealth Ranking)	সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (ধনী-গরীব শ্রেণীবিন্যাস) করা।
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস (Matrix Ranking)	বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে গুরুত্ব বা প্রয়োজীয়তা জানা।
সচলতার চিত্র (Mobility Chart)	বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের জনগণের বিভিন্ন স্থান/সংস্থার সাথে যোগাযোগ বিষয়ে জানা।
চাপাতি ডায়াগ্রাম (Venn Diagram)	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে জনগণের সম্পর্ক জানা, এলাকার বিভিন্ন ব্যাক্তির বা সংস্থার প্রভাব জানা।
সমস্যা নিরূপন (Problem Census)	খামারীদের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রদান করার জন্য খামারীদের তথ্য/চাহিদা সনাক্ত করা।
ঋতুভিত্তিক পার্থক্য (Seasonality Analysis)	ঋতুভিত্তিক উৎপাদন/ কাজের পার্থক্য, রোগ, শ্রম চাহিদা, অভাব, ঋণ সুবিধা, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি জানা ও বিশ্লেষণ করা।

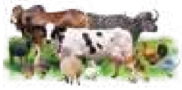

সেশন ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫

অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীণ সমীক্ষা পদ্ধতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- পিআরএ বাস্তবায়নে কৌশলসমূহ ও ব্যবহার
- পিআরএ এর প্রতিবেদন ছক তৈরী
- সমীক্ষা কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন

এই সেশনগুলিতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষে বা সংশ্লিষ্ট গ্রামে গিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবেন। সমীক্ষার পর প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপন করাবেন।

সমীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- মোটামুটি একই ধরনের অবস্থা সম্পন্ন প্রায় ৩০ জন খামারী/কৃষক এর একটি দলের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।
- আলোচনার জন্য একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা, যেমন- প্রাণির খাদ্য উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- দলটিতে ৫-৬ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে, তাদেরকে কাগজকলম দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তারা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বলতে হবে।
- তালিকা করা শেষ হলে ছোট দলগুলো একটি পূর্ণ অধিবেশনে নিজ নিজ তালিকা পেশ করবেন।
- এরপর সমস্যার একটি বড় তালিকা হবে এবং এ তালিকা হতে সকল দলের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ নির্বাচন করতে হবে এবং প্রাপ্ত সমস্যার একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- সমস্যাগুলো সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে খামারীদের নিকট হতে জানতে হবে। সে সময়ে তারা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সহায়তাকারী টীমের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ ডাইরিতে আলোচনার সারমর্ম লেখতে হবে।

পিআরএ এর প্রতিবেদন প্রণয়ন ছক ঃ

পিআরএ এর প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দিষ্ট কোন ছক নেই। পিআরএ পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধামত ছক ব্যবহার করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে। উল্লেখ্য, পিআরএ পরিচালনার সময় সহায়তাকারীকে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে কাগজে বিশেষ বিশেষ তথ্যাদি লিখে রাখতে হবে। পিআরএ অধিবেশন শেষে দলের সকলে মিলে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে (প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই করে) প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

- শিরোনাম (প্রতিবেদনের বিষয়ভিত্তিক নাম)
- পটভূমি ও ভূমিকা
- উদ্দেশ্য
- প্রক্রিয়া/পদ্ধতি (গ্রামের নাম, পিআরএ পরিচালনার স্থান, সময়কাল, তারিখ, অংশগ্রহণকারী, সহায়তাকারী দল, পিআরএ কৌশলের নাম ও বিবরণ)
- ফলাফল
  - প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত এবং
  - প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক
- ফলাফল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (পিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্য এবং প্রাণিসম্পদ পালন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক রেখে)
- সুপারিশমালা

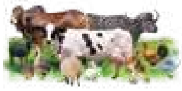

সেশন-৩৬

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম
- প্রযুক্তি প্রদর্শনী
- প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা
- প্রদর্শনীর জন্য সংক্ষিপ্ত কৃষক/খামারী প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং
- প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ঃ

প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন এবং প্রদর্শনীর জন্য নিম্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে-

১. কৃষক গ্রুপ/খামারীগণ এলডিডিপি এর প্রস্তাবিত কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি সনাক্ত করবে প্রতিটি গ্রুপ এর প্রদর্শনীর সংখ্যা নির্ভর করছে ঐ গ্রুপ এর সক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং সুযোগের উপর। প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনে কৃষক/খামারীর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শণী পরিচালনার জন্য কৃষক/খামারী-কে নির্বাচন করা হবে।

২. যদি একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি একাধিক স্থানে প্রদর্শীত হয়, সে ক্ষেত্রে হিসাব করা হবে এক প্রযুক্তি দ্বারা দুইটি প্রদর্শণী করা হয়েছে

৩. সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রদর্শণীদের মাঠে/খামারে/প্লটে প্রদর্শিত হবে।

৪. প্রযুক্তি প্রদর্শণী আয়োজনে এলডিডিপি থেকে সকল প্রকার উপকরণ সরবরাহ করা হবে এবং কৃষক/খামারী উক্ত প্রদর্শণীতে প্রয়োজনীয় শ্রম ও জমি/খামারী প্রদান করবেন।

৫. প্রদর্শণীর জন্য নির্ধারিত কৃষক/খামারী প্রদর্শণকৃত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রতিবেশী কৃষক/খামারীদেরকে উৎসাহিত করবেন।

৬. প্রদর্শণীর জন্য নির্ধারিত কৃষক/খামারী উক্ত প্রদশর্ণীর মাঠ দিবস পরিচালনায় এলডিডিপি-কে সর্বাত্নক সহযোগিতা করবেন।

৭. প্রতিটি প্রদর্শণীর জন্য একটি করে মাঠ দিবস থাকতে হবে। দলীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রদর্শণীর ফলাফল অর্থাৎ উৎপাদনের দিন এই মাঠ দিবসের অয়োজন করা হবে।

৮. প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শণীতে তথ্যবহুল দৃশ্যমান সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শণীর জন্য কৃষক/খামারী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

১. প্রদর্শণীর জন্য নির্বাচিত/মনোনয়নকৃত কৃষক/খামারী অবশ্যই প্রগতিশীল, স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্থানীয়ভাবে সকলের নিকট সুপরিচিত হবেন।

২. তিনি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারবেন।

৩. প্রদর্শণীর জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় প্রাণি/চাষযোগ্য জমি, ইত্যাদি থাকবে এবং তিনি উক্ত প্রাণি/জমি প্রদর্শণীর কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক থাকবেন।

৪. প্রদর্শণী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ও উদ্বুদ্ধকরণে ক্ষমতাবান হবেন।

৫. তিনি নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবেন।

৬. নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষক/খামারীদের তিনি সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।

৭. প্রদর্শণীর শর্তাবলী পালনে তিনি সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন।

প্রযুক্তি প্রদর্শণী প্লট/খামার নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় ঃ

প্রযুক্তি প্রদর্শণী প্লট/খামার নির্বাচনে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

১. প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো অবশ্যই দৃশ্যমান স্থানে হওয়া উচিৎ যাতে কৃষক/খামারীগণ উক্ত প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলোতে সহজেই প্রবেশ করে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য রাস্তার পার্শ্বের প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো অগ্রাধিকারযোগ্য।

২. প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো উচু জমিতে করতে হবে যাতে বন্যায় প্রদর্শণী প্লট/খামার ক্ষতি না হয় এবং সারা বছর ব্যবহারযোগ্য হয়।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী ঃ

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা কৌশল ব্যবহারের ফলে কৃষকের খামারে উৎপাদনের উপর যে প্রভাব পড়ে তা প্রদর্শন করাই প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য । নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের পূর্বে উক্ত প্রযুক্তি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা এবং প্রযুক্তিটি কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে করা হয়েছে কিনা এ সব যাচাই বাছাই করে প্রযুক্তি নির্ধারণ করতে হবে। খামারীদের নিকট প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রদর্শনীর সুবিধা হচ্ছে ঃ

১. খামারীদের লেখাপড়া কম জানা থাকলেও, প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁদের বুঝাতে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়।

২. খামারী প্রযুক্তি দেখে ও নিজ হাতে করে সহজেই তা শিখতে পারেন এবং অতি সহজেই ভালভাবে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

৩. এর ফলে খামারী ও সম্প্রসারণ কর্মীর মধ্যে বিশ্বাস এর স্তর বেড়ে যায় এবং সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সাধারণত দুই প্রকারের, যথা- (ক) ফলাফল প্রদর্শনী ও (খ) পদ্ধতি প্রদর্শনী

(ক) ফলাফল প্রদর্শনী ঃ

যখন কোন উপকরণ ব্যবহার বা কোন কৌশল প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের উপর এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ফলাফল প্রদর্শনী বলা হয়। যেমন- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি গরুকে ইউএমএস খাওয়ানোর ফলে গরুর যে ওজন বৃদ্ধি হয় তা এ প্রযুক্তির ফলাফল। খামারী/কৃষকের সমস্যা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে ফলাফল প্রদর্শনী করা হলে খামারী/কৃষকগণ উৎসাহিত হবে।

(খ) পদ্ধতি প্রদর্শনী ঃ

যখন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কোন প্রযুক্তি বা কোন কৌশল এক বা একাধিক খামারীকে হাতে কলমে শেখানো/দেখানো হয় তাকে পদ্ধতি প্রদর্শনী বলা হয়। পদ্ধতি প্রদর্শনী একটি দলীয় (গ্রুপ) সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যা এক হতে দু-ঘন্টা স্থায়ী হতে পারে।

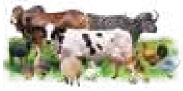

তবে পদ্ধতি প্রদর্শনীর বিষয়ে কৃষক/খামারীদের চাহিদা বা সমস্যার ভিত্তিতে চিহ্নিত কতে হবে। এ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ দক্ষতা ধাপে ধাপে প্রদর্শন করে এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করে, যেমন UMS প্রস্তুতকরণ। এ পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক এবং কৃষক/খামারীগণ UMS প্রস্তুত করণ প্রযুক্তি পদ্ধতিটি এক হতে দু-ঘন্টার মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে সমর্থ হয়। পদ্ধতি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উৎপাদন খরচ ও আয়ের ১টি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রদর্শনীর জন্য সংক্ষিপ্ত কৃষক/খামারী প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং ঃ

প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, প্রদর্শনী থেকে কী অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে তা প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীদের পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে। তাই এ সম্পর্কে প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারী/কৃষককে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং দিতে হবে। এটা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একই ধরণের প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী সকল খামারীকে একটি অধিবেশনে ঐ প্রদর্শনী সমন্ধে অবহিত করতে পারেন। তবে উক্ত প্রযুক্তি এবং প্রদর্শনী বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি বর্ণনামূলক লিফলেট খামারীকে সরবরাহ করতে পারলে ভাল হবে।

প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ঃ প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের জন্য জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন-

- প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রশিক্ষণ/সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এর দিনেই কৃষক/খামারীকে উক্ত প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
- প্রদর্শনী প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষক/খামারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।
- প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর জন্য একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে, যেখানে প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য যথা- প্রয়োগের তারিখ, প্রয়োগ পদ্ধতি, উপকরণ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায়, ফলাফল, আয়-ব্যয়, প্রদর্শনী পরিদর্শনকারীর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- প্রদর্শনী খামার/প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী পরিচালনাকারী খামারীর সাথে সাক্ষাৎ করা।
- প্রদর্শনী স্থানে মাঠ দিবস ও অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- প্রতিটি প্রদর্শনীর ছবি তুলে রাখতে হবে। ছবির নিচে উক্ত প্রদর্শনীর তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ ডিএলএস এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- প্রদর্শনী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সাইন বোর্ড যেভাবে প্রস্তুত করতে হবেঃ

------------- প্রদর্শনী			
১।	খামারী সংগঠনের নাম	ঃ	
২।	খামারী /কৃষকের নাম	ঃ	
৩।	প্রযুক্তির নাম	ঃ	
৪।	শুরুর তারিখ	ঃ	
বাস্তবায়নে ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,---------- এলডিডিপি/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।			

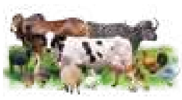

সেশন-৩৭

নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- নেতার সংজ্ঞা
- নেতার কাজ
- আদর্শ নেতার গুণাবলী
- জেন্ডার
- নারীর ক্ষমতায়ন কি?

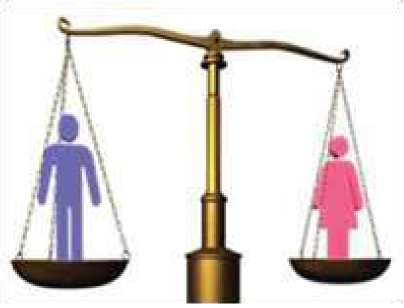

নেতার সংজ্ঞা ঃ

সাধারণত একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণকে যিনি পরিচালনা করেন তিনিই নেতা। পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রেখে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী বা দলকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে যিনি পথ চলার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, সহযোগীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগান এবং সর্বোপরি যিনি দল পরিচালনা করেন তাকেই নেতা বলে।

নেতার কাজ ঃ

- ✓ দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করা।
- ✓ দলের ঐক্য ও আদর্শ রক্ষা করা।
- ✓ দলের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে মূখ্য ভূমিকা পালন করা।
- ✓ দলের সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করা।
- ✓ দলের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- ✓ দলের চাহিদা নির্ধারণ করা।
- ✓ দলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা।
- ✓ আর্থিক লেনদেন ও হিসাব রাখতে সাহায্য করা।
- ✓ দলের সভা পরিচালনা করা।
- ✓ দলের কাগজপত্র ও সম্পদ রক্ষা করা।
- ✓ সদস্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

আদর্শ নেতার গুণাবলী ঃ

১। সংগঠনের কাছে দায়িত্বশীল হতে হবে।
২। নীতিবান ও সৎ হতে হবে।
৩। বুদ্ধিমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
৪। শক্ত মনোবল সম্পন্ন হতে হবে।
৫। সাহসী হতে হবে।
৬। আত্মসমালোচক হতে হবে।
৭। সহযোগী মনোভাবাপন্ন হতে হবে।
৮। পরিবর্তন গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে।
৯। মিশুক বা বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে।
১০। ভাল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

নেতৃত্ব ঃ

নেতৃত্ব হচ্ছে একজন নেতার এমন কর্ম প্রক্রিয়া, যা দ্বারা তিনি তার দলীয় সদস্যদের পরিচালনা করে দলের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। নেতৃত্ব হলো নেতার কাজ। অর্থাৎ দলের জন্য নেতা যেসব দায়িত্ব পালন করেন তাই নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের ধরণ ঃ

ক) একনায়কত্ব বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব
খ) অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

নেতার দায়িত্ব হচ্ছে কাঙ্কিত ফলাফল অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি লোকজন ও সুবিধাদি সংগঠিত করেন এবং সদস্যদেরকে কাজে নিয়োজিত করেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সদস্যরা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োগ না করছেন ততক্ষন পর্যন্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এসব পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়।

- ✓ একজন নেতা নিবেদিত প্রাণ
- ✓ সদস্যদের সুবিধাদি সংগঠিত করা
- ✓ সদস্যদের দায়িত্বে নিয়োজিত করা
- ✓ সদস্যদের আচরন পরিবর্তনে সহায়তা করা
- ✓ সমিতির প্রতিনিধিত্ব করা
- ✓ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা

জেন্ডার ও লিঙ্গ ঃ

জেন্ডার শব্দটি কোন বিশেষ বা বিশেষ্য বাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করা জন্য যেমন-পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে জেন্ডার এর ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যাকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। আর তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাত: দৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক। এসব কারণে জেন্ডার ও লিঙ্গ এই প্রত্যয় দুটির ব্যাখ্যা পরিস্কার ভাবে জানা দরকার।

লিঙ্গ ঃ

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্যতা; কিংবা শরীরবৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়।

জেন্ডার ঃ

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন/ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

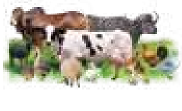

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার নামই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে প্রথম দুটি বিষয় বিবেচ্য (১) নারীর অবস্থা (২) নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থা বলতে বুঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা, যেমন-পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপার্জন। দ্বিতীয়ত নারীর অবস্থান বলতে বুঝায়, সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের মালিকানা, অধিকতর পছন্দ অপছন্দ, অগ্রাধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ, নিজের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত করার অধিকার সক্ষমতা বা যোগ্যতা এবং ন্যায্য সুযোগ অর্জন।

সেশন-৩৮
দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ দল বা সংগঠন সম্পর্কে ধারণা
- ➢ দল ব্যবস্থাপনা কাঠামো, দল পরিচালনার কৌশল
- ➢ দলের গঠনতন্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী, রেজিস্ট্রেশন ও কর্মপরিকল্পনা
- ➢ রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ, সমবায় সমিতি

১. দল ঃ

দল বলতে এই শ্রেণীর বা পেশার অথবা একই গোত্রের কয়েকজন মানুষ মিলিত হয়ে নিজের উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়।

দল গঠনঃ

কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য সমমনা কিছু লোকের সমষ্টিকে দল বলে। একক ভাবে অনেক সময় একটি কাজ সুষ্ঠ ভাবে করা সম্ভব হয় না বা একক ভাবে করে ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণত একটি বড় দলকে পরিচালনা করা কষ্টকর। তাছাড়া দল বড় হলে দলের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। পাশাপাশি সহায়তাকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে ঘনিষ্ট ভাবে থেকে শেখাতে পারেন বা সহায়তা দিতে পারেন।

দলের উদ্দেশ্য ঃ

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-

ক) সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা।

খ) ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ) আয় করার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সামাজিক উদ্দেশ্য-

- ✓ দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও একতা বৃদ্ধি করা, সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা।
- ✓ দারিদ্রের কারণ চিহ্নিত করা ও আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ✓ নিজেদের সংঘবদ্ধ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা কমানো।
- ✓ দলের ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ✓ এলাকার সামাজিক উন্নয়ন করা।
- ✓ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ নিজেদের উন্নয়ন করা।

সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা ঃ

কোন নির্বাচিত এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণ একমত হয়ে যখন দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেই সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক) সদস্য/সদস্যা হতে হলে অবশ্যই দলের কার্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

খ) কমপক্ষে ১৮ বছর থেকে উপার্জনক্ষম বয়সের নারী ও পুরুষ হতে হবে।

গ) আবেদনকারী যদি বছরে ১২ মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ নির্ভর এবং কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে (সেইসব পরিবারের পুরুষ, মহিলা ও যুবক, যুবতী) তবেই দলের সদস্য হতে পারবে।

ঘ) আবেদনকারী যদি গৃহিনী হয় দল করার জন্য উক্ত আবেদনপত্রে অবশ্যই স্বামী বা অভিভাবকের সম্মতি থাকতে হবে।

ঙ) আবেদনকারীকে মানসিক ও আত্মীকভাবে সুস্থ্যতার অধিকারী হতে হবে। আবেদনকারীকে নিয়মিত নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয় জমা দিতে এবং নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে সম্মত থাকতে হবে।

চ) আবেদনকালী অন্য সংস্থার/ কোন দলের সদস্য হতে পারবে না।

জ) কোন পরিবার থেকে একাধিক ব্যাক্তি একই দলের সদস্য/সদস্যা হতে পারবে না।

দলের সদস্য/ সদস্যাদের সমমনা, সমপ্রকৃতির (পেশা, সংস্কৃতি ইত্যাদি) এবং একই রকম সামাজিক অবস্থান বাঞ্ছনীয়।

ঞ) পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে।

ট) দলীয় নিয়ম কানুন মেনে চলার আগ্রহ থাকতে হবে।

ঠ) আত্মনির্ভরশীলতার বিশ্বাসী হতে হবে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ-

১। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫ নং বিধি অনুযায়ী ফরম নং-১ অনুসারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র। (নূন্যতম ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ, প্রত্যেকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং প্রতি সদস্যের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ জমি থাকতে হবে।)

২। প্রাথমিক সমিতি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালান।

৩। সমিতির নাম হবে প্রাণিসম্পদ সমবায় সমিতি।

৪। প্রথম সাধারণ সভার রেজুলেশন। সমিতির নামকরণ, সদস্য সংখ্যা, ২টি আর্থিক বছরের বাজেট, কোন ব্যাংকে একাউন্ট খোলা হবে ও কে/কারা পরিচালনা করবে তা রেজুলেশনে থাকতে হবে।

৫। ব্যাংক একাউন্ট।

৬। সমিতির ৩ (তিন) কপি উপ-আইন (গঠনতন্ত্র)

৭। প্রাথমিক সমিতি হিসাবে ৩০০০/- টাকার পরিশোধিত শেয়ার এবং ৩০০০/- টাকার সঞ্চয় দেখাতে হবে এবং মূলধন সংক্রান্ত শেয়ার হোল্ডারদের তালিকা। (প্রতি সদস্যকে শেয়ার কিনতে হবে)।

৮। প্রাথমিক সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য পরবর্তী ২ সমবায় বর্ষের বাজেট।

৯। কার্যনির্বাহী কমিটি ৬, ৯ বা ১২ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ ৩ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।

১০। সদস্যদের পরিচিতি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সনদপত্র।

১১। দুই বছর অন্যের সাহায্য ছাড়া সমিতি পরিচালনার অঙ্গীকারনামা।

স্বোচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ

১। অধ্যাদেশের ৪ নং বিধি অনুয়ায়ী “খ” ফরমে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

২। রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২০০০/- টাকার ট্রেজারী চালান দাখিল করতে হবে।

৩। গঠনতন্ত্রের ৫ (পাঁচ) কপি। (প্রেত্যেক পাতায় সভাপতি ও সেটেরীর স্বাক্ষর সহ)

৪। ক্লাবের নামের ছাড়পত্রের মূল কপি। (জেলা অফিস থেকে)

৫। ক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুমোদনের সভার রেজুলেশনের সত্যায়িত কপি।

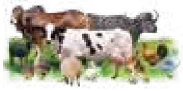

৬। ব্যাংক একাউন্ট।

৭। ক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুমোদনের সভার রেজুলেশনের সত্যায়িত কপি।

৮। ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা। (কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নাম, পদবী, পেশা, স্বাক্ষর এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দুইকপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।)

৯। ক্লাবের সাধারণ সদস্যদের নাম, পিতার নাম, পেশা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা সহ তালিকা।

১০। কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য জীবিত এবং এক অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত এ মর্মে ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি প্রত্যয়ন পত্র।

১১। ক্লাব ঘর অবস্থানের জমির মালিকানা দলিল অথবা ভাড়া বাড়ি হলে ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে লিজ এগ্রিমেন্টের ফটোকপি।

১২। ক্লাবের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন।

১৩। ক্লাবের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা।

১৪। ক্লাবের অবস্থান ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে ইহার সম্পৃক্ততা প্রত্যয়ন পূর্বক ক্লাবকে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট হতে এফিডেভিট এর মাধ্যমে সুপারিশ পত্র।

১৫। ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে এফিডেভিট এর মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং সদস্যদের মধ্যে কেউ এক পরিবারভুক্ত নয়।

১৬। ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে এফিডেভিট এর মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে য, দরখাস্তের সঙ্গ সংযুক্ত সকল কাগজ পত্র , দলিলাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ দ্বারা স্বাক্ষরিত।

পরিশিষ্ট: ১ (বি ফরম)
(অর্ডিনেন্স এর ৪ নং ধারায় দ্রষ্টব্য)
১৯৬১ এর ৬০ নং অর্ডিনেন্স অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্তের ফরম

বরাবর
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ,
স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজসেবা অধিদপ্তর,.............................।

মহাত্মন,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ১৯৬১ সনের ৬০ নং স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের (নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিনেন্স অনুযায়ী বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কে নিবন্ধীকরণের জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:...

২। ঠিকানা: গ্রাম:..ডাকঘর:..

উপজেলা:.. জেলা:...

৩। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: (অর্ডিনেন্স উল্লেখিত কর্মসূচি অনুযায়ী)

....

৪। প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকা (স্থানীয় শহর বা সমগ্র বাংলাদেশ): ....

৫। প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিকল্পনা (কর্মসূচি): (পরিচালক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত মান যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তি এবং সরঞ্জামাদি গত বৎসরের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি সংক্ষেপে বিভিন্ন কাগজে উল্লেখ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উল্লেখ করিতে হইবে।)

৬। আয়ের উৎস :

৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নাম, পেশা ও ঠিকানা:

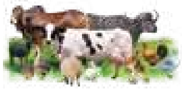

ক্র:নং	সদস্য/সদস্যাদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.			
২.			

৮। যে ব্যাংকে টাকা রাখা হইবে তাহার নম্বর:...

উপরোক্ত অর্ডিনেন্স অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধীকরণের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কার্যকরী পরিষদের কোন রদ বদল ঘটিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য অঙ্গীকার করিতেছি।

৯। সংযুক্ত:

ক) ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান এবং ৩ (তিন) কপি বাঁধানো গঠনতন্ত্র।

খ) যে যে সভায় গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে সেই পূর্ণ কার্য্য বিবরণী।

গ) সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার সুপারিশ।

আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনা সত্য।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের স্বাক্ষর	স্বাক্ষীর স্বাক্ষল (নাম ও ঠিকানা)
১	১
২	২

সুপারিশ সমূহঃ

ক) আমি আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে তদন্ত করিয়াছি। নিবন্ধীকরণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আবেদন পত্রের সহিত রহিয়াছে। পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী (যাবতীয় অনুলিপি সংযোজন করা হইল) রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

খ) আমি সংস্থাটির আবেদন পত্রের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সংস্থাটি রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য/ না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি।

জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা

রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

সেশন-৩৯

প্রাণিসম্পদ খামারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ তথ্য এবং উপাত্ত পরিচিতি
- ➢ সাক্ষাৎকার, সার্ভে পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
- ➢ খামার পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ও সুবিধা
- ➢ খামার ও গৃহ পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা

Collecting Data

Presented By:
Dr.Deepthi Athuluru
Dept. of Public Health Dentistry

তথ্য (Data) এবং উপাত্ত (Information) পরিচিতি

ডাটা বলতে বিভিন্ন তথ্য বুঝায়। কোন গবেষণা বা সার্ভে করে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকেই মূলত ডাটা বলে।

তথ্য (Data)	উপাত্ত (Information)
১. এক বা একাধিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর যে অর্থপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় তাকে তথ্য বলে।	২. উপাত্ত হল তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক। এটি একটি ধারণা।
৩. সব তথ্য উপাত্ত হতে পারে এবং এটি সরাসরি ব্যবহার করা যায়।	৪. সব উপাত্ত তথ্য নয় এমনকি এটি সব সময় অর্থপূর্ণ নয়।
৫. তথ্য সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ করতে হয় না।	৬. উপাত্ত সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। উপাত্তকে প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়।
৭. তথ্য থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এটি আউটপুট স্বরূপ।	৮. উপাত্ত থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় না। এটি উপাত্ত ইনপুট স্বরূপ।

সাক্ষাৎকার ঃ

তথ্যদাতা ও তথ্য-গ্রহিতার সামনা সামনি কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকে ইন্টারভিউ বলে। কোন নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশ্নগুলো সাজানো থাকে। কৃষক বা খামারীর বাসায় গিয়ে বা কোন রাস্তা বা বাজারে বসে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য তথ্য সংগ্রহকারীকে একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করে নিয়ে যেতে হয়। প্রশ্নপত্রে তথ্যগুলো লিখে রাখা হয়।

ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার ঃ

একজন তথ্যদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

একটি ভাল সাক্ষাৎকার অনুসূচি বা কোয়েশ্চেনিয়ারে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ

১. সাক্ষাৎকার অনুসুচীর এমন একটি শিরোনাম দিতে হবে যাতে যে কেউ অতি সহজেই পত্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বুঝতে পারবে।
২. প্রশ্নপত্রের শুরুতে উত্তরদাতা/তথ্য সরবরাহকারীর জন্য কিছু দিক নির্দেশনা থাকবে।
৩. প্রশ্নগুলোর ক্রমিক সংখ্যা থাকবে।
৪. প্রশ্নগুলো সরাসরি ও সুস্পষ্ট হতে হবে যাতে উত্তরদাতা সহজেই উত্তর দিতে পারেন।
৫. চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করার পূর্বে ইহার একটি পর্ব পরীক্ষা করে নিতে হবে।
৬. প্রশ্নের পাশে উত্তর দেয়ার জন্য খালি জায়গা রাখতে হবে।
৭. প্রশ্নপত্র টাইপ ছাপানো হতে হবে।

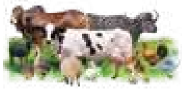

সার্ভে এবং সার্ভের উদ্দেশ্য ঃ

সার্ভে হল এমন একটি রিসার্চ মেথড যার মাধ্যমে কোন পূর্ব নির্ধারিত স্থান থেকে নিজেদের প্রয়োজন মত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সার্ভের মাধ্যমে এমনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যেন তথ্যদাতা পক্ষপাতিত্ত্ব বিহীন ভাবে সঠিক তথ্যটি দান করে। সার্ভে করার জন্যে একটি কোয়েশ্চেনিয়ার ব্যবহার করা হয় যাতে সংগ্রহকৃত তথ্যগুলো লিখে রাখা হয়।

১. কোন সামাজিক সমস্যার কারন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

২. কোন গ্রাম বা মহল্লা বা স্থানের জনগনের চাহিদা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

৩. বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার মধ্যকার সম্পর্ক খুজে বের করা।

৪. কোন উন্নয়ন কার্য সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা।

সার্ভে পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাথে সাথে সার্ভের নিয়ম ও পরিবর্তন হচ্ছে। এখন শুধু কাগজে কোয়েশ্চেনিয়ারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন সার্ভে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

অনলাইন সার্ভে ঃ

বর্তমানে অনলাইনে সার্ভে অনেক ব্যপক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট ছড়িয়ে পড়ছে। অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যায়। কাউকে ই-মেইলের মাধ্যমে কোয়েশ্চেনিয়ার পাঠিয়ে দিলে সে নিজেই তার পছন্দমত সময়ে তা পূরণ করে আবার তা পাঠিয়ে দিতে পারে।

টেলিফোন সার্ভে ঃ

সামনা সামনি সার্ভের চেয়ে টেলিফোন সার্ভেতে সময় কম লাগে এবং এতে সস্তায় করা যায়। এতে সঠিক তথ্যগুলো পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা কম থাকে।

ফেস টু ফেস বা সামনা সামনি সার্ভে ঃ

এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতার সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যায়। এতে তথ্য সংগ্রহকারী নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই কারনে তিনি তার সাধ্যমত চেষ্টা করেন সবগুলো তথ্য সংগ্রহ করার।

পেপার সার্ভে ঃ

এটি তথ্য সংগ্রহের সবচেয়ে কম ব্যবহৃত পদ্ধতি। কার্যতপক্ষে এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ কঠিন হওয়ার বিভিন্ন গবেষক বা রিসার্চাররা এ পদ্ধতি থেকে দূরে এসেছে।

খামার পরিভ্রমণ ঃ

খামার পরিভ্রমণ হলো একদল খামারী কোন একটি খামার পরিদর্শন করবেন এবং খামারটি ঘুরে ফিরে দেখবেন। এ সময় খামারের মালিক ও কর্মী তাদের সাথে থাকবেন।

খামার পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ

১. একজন প্রতিবেশী কৃষক কিভাবে একটি নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা বা গ্রহণ করেছেন তা দেখার একটা সুযোগ করে দেয়া;

২. খামার ব্যবস্থা বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়া এবং উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করা;

৩. একটি নির্দিষ্ট সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় বা গ্রুপে কিভাবে নতুন প্রযুক্তির ওপর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়, সে ব্যাপারে একমত হতে কৃষকদেরকে একটি সুযোগ দেয়া।

খামার পরিদর্শনের সুবিধা ঃ

১. এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মী জনগনের অবস্থা, সমস্যা এবং মনোভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারেন।

২. প্রাণিসম্পদ কর্মীর সাথে কৃষকদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, ফলে কলাকৌশল বিস্তারে সুবিধা হয়।

৩. প্রাণিসম্পদ উপকরণের চাহিদা নিরূপণ করা সহজ হয় ।

৪. এলাকায় কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা দরকার, খামারীদের কোন ধরণের প্রশিক্ষণ দরকার ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

খামার ও গৃহ পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা ঃ

১. এটি ব্যয় বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং অনেক সময় ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও খামার ও গৃহ পরিদর্শনের যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

২. খামারীদের চাহিদা ও সময়মত অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করা সম্ভব হয় না।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের খামারীদের চেয়ে বড় ধরণের খামারীদের সাথেই যোগাযোগের প্রবণতা দেখা যায়।

খামার পরিদর্শন কেন দরকার ঃ

১. হাতেকলমে শিক্ষা, বইয়ের শিক্ষা থেকে বেশি ফলপ্রসু হয়।

২. এর ফলে অনেক উন্নত প্রযুক্তি সরাসরি দেখা যায়, যেগুলো ক্লাশে দেখানো সম্ভব হয় না।

৩. এ ধরনের শিক্ষা অনেকদিন মনে থাকে এবং খামারীদের আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। যেমন একটি খামারের পুকুরের উপর মাচাতে মুরগি পালে। এটা সরাসরি দেখার পর কৃষক এটা করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

খামার পরিদর্শনের আগে ও পরিদর্শনের সময় যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

১. যে ফার্ম বা খামার পরিদর্শন করা হবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে হবে।

২. নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে পরিদর্শনের আগেই তাদের জানাতে হবে।

৩. খামারে যাবার আগে খামার সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে। ফার্মের জৈব নিরাপত্তা, ফার্মের বিধি-নিষেধ এগুলো সব কিছু জানাতে হবে।

৪. পরিদর্শনের সময় সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে যা নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করবে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন শেষে একটি রিপোর্ট তৈরী করা যেন পরবর্তী দল সমস্যা ও সুবিধাগুলো বুঝতে পারে।

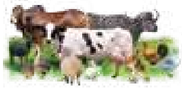

সেশন-৪০

গাভী পালনের প্রাথমিক তথ্য ও জাত পরিচিতি।

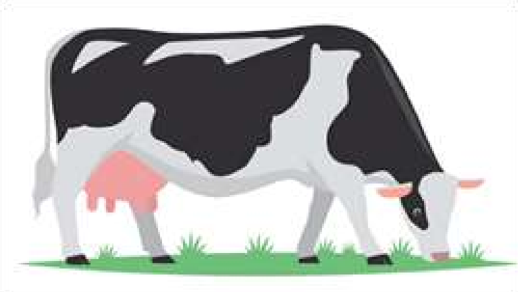

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ গরুর জাত পরিচিতি
- ➢ প্রসব পরবর্তী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা
- ➢ সংকর জাতের দুধাল গাভীর বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বিশেষ উৎপাদনশীল গাভী পরিলক্ষিত হয়। যেমন- চট্টগ্রামের লাল গরু, পাবনা জেলার গরু ও ফরিদপুর জেলার গরু।

বাংলাদেশের স্থানীয় গরুর পরিচিতি ঃ

চট্টগ্রামের লাল গরু ঃ

১. চট্টগ্রাম এলাকার বিশেষ প্রজাতির গরু যা রেড চিটাগাং নামে পরিচিত। গরুর আকৃতি মধ্যম। মূলত মাংস ও দুধ উৎপাদনের জন্য এ জাতীয় গরু পালন করা হয়। হালকা লাল বর্ণের এজাতের গরু দেখতে মাঝারি, পিছনের দিক বেশ ভারী, চামড়া পাতলা, শিং ছোট ও চ্যাপ্টা।

২. মুখ খাটো ও চওড়া, লেজ যথেষ্ট লম্বা এবং শেষ প্রান্তে চুলের গুচ্ছ লাল বর্ণের।

৩. ওলান বেশ বর্ধিত বাঁট সুডৌল, মিল্ক ভেইন স্পষ্ট, দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়।

৪. ষাঁড় ও বলদ বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী । কৃষি ও ভার বহনের কাজে উপযোগী।

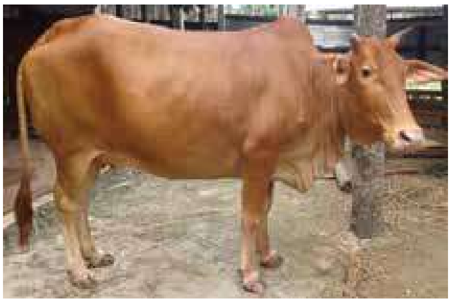

রেড চিটাগাং জাতের গরু

ঢাকা মুন্সিগঞ্জ এলাকার গরু ঃ

১. মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিশেষ প্রজাতির এই গরু গুলো বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী গরু।

২. গরুর আকৃতি মধ্যম, একটু লম্বাটে ধরণের বিভিন্ন বর্ণের হয়। মূলত মাংস ও দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই জাত।

৩. মুখ কিছুটা সরু ও লম্বা । গাভীর চূড়া প্রায় থাকে না। পিঠ সোজা, শিং সরু ও খুব ধারালো।

৪. দেহের সাথে আটসাট ওলান সম্মুখের দিকে একটু বাঁকানো। মিল্ক ভেইন মোটা ও স্পষ্ট।

৫. দৈনিক ৭-৮ লিটার দুধ দোহন করা যায়।

৬. কুরবানির হাটে এই গরুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

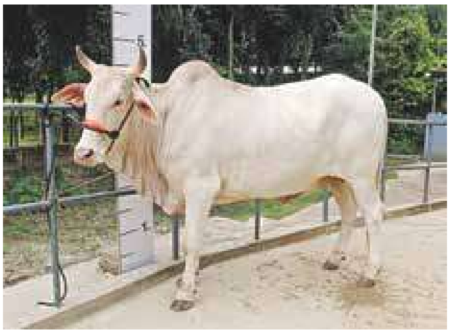

মুন্সিগঞ্জ এলাকার গরু

পাবনা অঞ্চলের গরুঃ

- ✓ এ জাতের গাভী ও বলদ উভয়েই আকারে বেশ উঁচু ও লম্বা হয়।
- ✓ দেহের রং গাঢ় ধূসর হতে সাদা চাপযুক্ত হয়ে থাকে।
- ✓ একটি গাভীর দৈনিক ৬-৯ কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়।

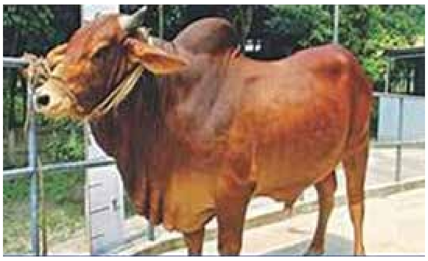

পাবনা অঞ্চলের গরু

ফরিদপুর জেলার গরুঃ

- ✓ বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুরের গরু বেশ উন্নত ধরনের।
- ✓ হরিয়াণা জাতের সংকর গরু ফরিদপুর জেলায় দেখা যায়।
- ✓ এরা মাথা উঁচু করে হাটে। গায়ের রং লাল, সাদা বা হালকা ধূসর হয়।
- ✓ চামড়া পাতলা থাকে।
- ✓ ষাঁড়ের ওজন ৩০০-৪০০ কেজি হয় এবং গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হয়।

ফরিদপুর অঞ্চলেরর গরু

উন্নত জাতের গরুর পরিচিতি

হলষ্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের গরু ঃ

এ জাতের গরুর উৎপত্তি স্থান হল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড প্রদেশে। হল্যান্ডের ভাষায় এদেরকে ফ্রিজিয়ান বলা হয়। এজাত সাধারণত শীত প্রধান অঞ্চলের জাত। দুধাল গাভীর সকল জাতের মধ্যে এটা বড় আকৃতির জাত।

বৈশিষ্ট্যঃ

- ✓ ফ্রিজিয়ান গাভীর বর্ণ সাধরণত ছোট বড় কাল ছাপযুক্ত এবং কখনো পুরোপুরি সাদা, কালো ও বাদামী হয়ে থাকে।
- ✓ হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গাভী সাধারণত বড় ও মাথা লম্বাটে সোজা হয়, কুজ অনুন্নত হয়।
- ✓ গাভীর ওজন থাকে ৫৫০ কেজি থেকে ৭০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৯০০-১০০০ কেজি পর্যন্ত হয়।
- ✓ প্রথম গর্ভধারণ বয়স ১৮-২৪ মাস এবং বছরে গড় দুধ উৎপাদন ৮০০০ থেকে ১২০০০ লিটার পর্যন্ত হয়।
- ✓ দৈনিক এ জাতের গাভী ২০-৪৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

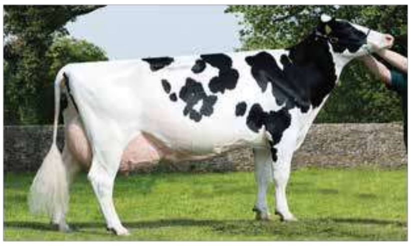

ফ্রিজিয়ান জাতের গরু

জার্সি জাতের গাভী ঃ

জার্সি জাতের উৎপত্তি ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি নামক ব্রিটিশ দ্বীপ থেকে। এই জাতটি এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✓ এ জাতের গরু আকারে ছোট
- ✓ গায়ের রং লাল বা মেহগনি রং বিশিষ্ট।
- ✓ জিহ্বা ও লেজ কালো থাকে।
- ✓ শিং পাতলা এবং সামনের দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে।
- ✓ এ জাতের গাভীর ওজন ৪০০-৬০০ কেজি হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ষাড়ের ওজন ৬০০-৮০০ কেজি হয়।
- ✓ জন্মের পর বাছুরের ওজন প্রায় ২৫-২৭ কেজি হয়।
- ✓ জার্সি জাতের গাভী থেকে বছরে ৪০০০-৬০০০ লিটার দুধ পাওয়া যায়।

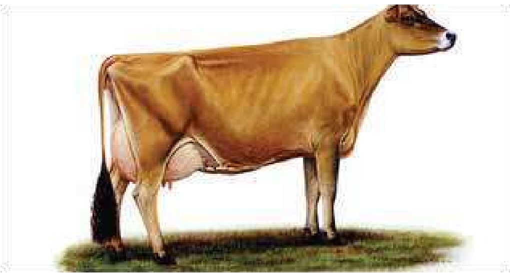

জার্সি জাতের গরু

শাহীওয়াল জাতের গাভী ঃ

শাহীওয়াল গরুর উৎপত্তি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারী জেলায়।
শাহীওয়াল গরু বেশ লম্বা মোটাসোটা ও ভারী হয়।

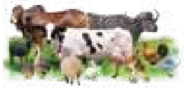

বৈশিষ্ট্যঃ

- শাহীওয়াল গরুর গায়ের রং হালকা লাল, বাদামী এবং সাদা হয়।
- এ গরুর কুঁজ ও গলকম্বল বড় ও ঝুলানো থাকে।
- এ জাতের গরু শান্ত প্রকৃতির হয়।
- এ জাতের গাভীর ওজন ৫০০-৫৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৬০০-১০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- জন্মকালে বাছুরের ওজন ২২-৩০ কেজি হয়।
- বছরে দুধ উৎপাদন হয় ২৫০০-৪০০০ লিটার।

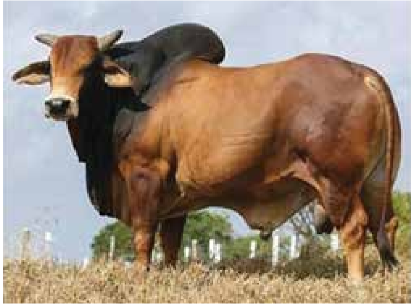

শাহীওয়াল জাতের গরু

সিন্ধি জাতের গাভী ঃ

লাল সিন্ধি জাতে গরুর উৎপত্তি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের করাচী, লাসবেলা ও হায়দারাবাদে। উৎপত্তি পাকিস্তানে হলেও বাংলাদেশ, ভারতসহ অনেক দেশে এ জাতটির বিস্তার রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যঃ

- গায়ের রং লাল, গাঢ় লাল বা চকলেট বর্ণের হয়।
- শিং ভোঁতা, পাশে বা পিছনে বাঁকানো থাকে।
- কপাল চওড়া এবং কপালের মাঝের অংশ উঁচু থাকে।
- এ জাতের গাভীর ওজন ৩৫০-৪০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৪৫০-৫৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- জন্মকালে বাছুরের ওজন হয় ২১-২৪ কেজি।
- বার্ষিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ হলো ৩০০০-৪০০০ লিটার এবং দুধে চর্বির পরিমাণ ৫% এর বেশি থাকে।

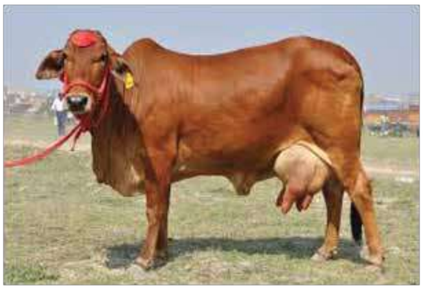

সিন্ধি জাতের গরু

হরিয়াণা জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- হরিয়ানা গরুর রং সাধারণত সাদা রঙের হয়।
- গাঢ় লম্বা ও সুগঠিত থাকে।
- গলকম্বল ছোট ও পাতলা থাকে।
- পা লম্বা হয়।
- কুঁজ বড় ও প্রশস্ত থাকে।
- গাভীর ওজন ৫০০-৫৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৬০০-৭০০ কেজি হয়।
- বার্ষিক দুধ উৎপাদন ৩০০০-৩৫০০ লিটার ।

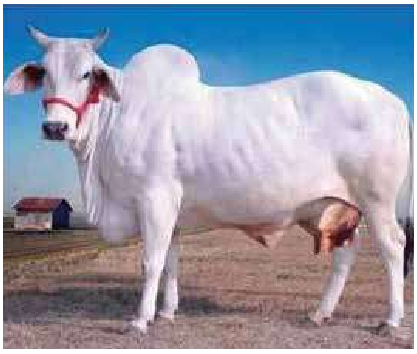

হরিয়াণা জাতের গরু

থারপারকার জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- এ জাতের গরুর রং সাধারণত সাদা হয়।
- মাঝারি আকার, সুগঠিত দেহ, কপাল উঁচু, চোখের পাপড়ি কালো, এবং শিং বাঁকা ও ধনুকের মতো হয়। শিং এর গোড়া মোটা হয়।
- গাভীর ওজন ৪০০-৫০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৫০০-৬০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- বছরে গড় দুধ উৎপাদন ৩০০০-৪০০০ লিটার।

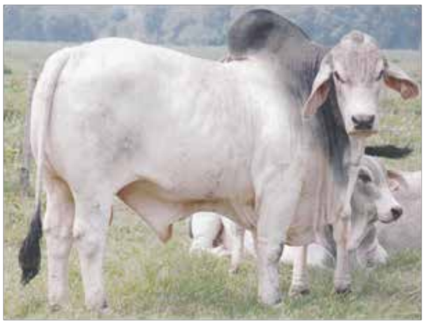

থারপারকার জাতের গরু

ব্রাহামা জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✓ এ জাতের গরুর উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশে।
- ✓ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এবং মেক্সিকো উপকূল এলাকায় এ গরু দেখা যায়।
- ✓ এ জাতের গরুর কুঁজ বড়, গলকম্বল ঝুলন্ত গায়ের রং হালকা থেকে গাঢ় ধূসর হয়ে থাকে।
- ✓ এ জাতের ষাঁড়ের ওজন ১০০০ থেকে ১২০০ কেজি হয়ে থাকে। গাভীর ওজন হয় ৪০০-৬০০ কেজি হয়।

ব্রাহামা জাতের গরু

একটি উৎকৃষ্ট গাভী চেনার উপায় ঃ

একটি উৎকৃষ্ট গাভী চেনার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

- ✓ গাভী লম্বা আকৃতি, পিছনের অংশ প্রশস্ত এবং ভারী, সামনের অংশ সরু হবে।
- ✓ মাথা হালকা ও ছোট আকারের হবে। কপাল প্রশস্ত, চোখ উজ্জ্বল হবে। অধিক খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী হবে।
- ✓ দেহের সামনের দিক হালকা এবং পিছনের দিক ভারী ও সুগঠিত হবে। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংগঠিত হবে। দৈহিক আকার আকর্ষণীয় হবে। শরীরের গঠন ঢিলা হবে।
- ✓ পাঁজরের হাঁড় সুস্পষ্ট অনুভব করা যাবে। হাঁড়ের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- ✓ চামড়া পাতলা হবে। চামড়ার নীচে চর্বির বাহুল্য থাকবে না। লোম সমৃণ ও চকচকে হবে।
- ✓ গাভীর ক্ষেত্রে ওলান বড় ও সুগঠিত হবে ও দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পিছনের দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত হবে। বাটগুলি একই আকারের হবে। ৪টি বাট সমান দূরত্বে ও সমান্তরাল হবে।
- ✓ দুগ্ধ শিরা মোটা ও স্পষ্ট হবে। তলপেটে নাভীর পাশ দিয়ে দুগ্ধশিরা আঁকাবাঁকাভাবে বিস্তৃত থাকবে।

প্রসবপরর্তী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা ঃ

১. বাচ্চা প্রসবের পরপরই নিমপাতা বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক (Flank) এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।

২. গাভীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. বাচ্চা প্রসবের পরপরই গাভীকে হালকা গরম পানি বা এধরণের পানি দিয়ে গুড়ের সরবত (১০ লিটার পানির সাথে ২৫০ গ্রাম আখেড় গুড় এবং ১০০ গ্রাম লবণ) তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।

৪. গাভী যাতে নবজাতক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।

৫. প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।

৬. সাধারণত প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। যদি ৮-১২ ঘন্টার মধ্যেও গর্ভফুল বের না হয় তবে গাভীকে আরগট মিশ্রণ (Ergot mixture) খাওয়ানো যেতে পারে। ২৪ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭. গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী যেন গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৮. দুধজ্বর ও ম্যাস্টাইটিস রোগের সম্ভাবনা কমাবার জন্য বাচ্চা প্রসবের পর ১-২ দিন পর্যন্ত গাভীকে সম্পূর্ণভাবে দোহন না করাই ভালো। বাছুরকে কাচলা দুধ বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।

৯. গাভীকে প্রথমত হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একইসাথে অল্পপরিমাণ কাঁচা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

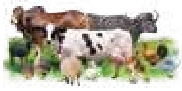

সেশন-৪১

গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গবাদিপশুর বাসগৃহের স্থান নির্বাচন
- গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণিবিন্যাস
- উদাম ও বাঁধা ঘর পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
- এক সারি ও দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা সম্পর্কে ধারণা

গবাদিপশুর বাসগৃহ ব্যবস্থাপনা (Housing of cattle) ঃ

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যপ্রাণী, চোর প্রভৃতি থেকে খামারের গবাদিপশুকে রক্ষা করার জন্য এবং উন্নত আরামদায়ক অবস্থা ও উন্নত পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য আশ্রয় স্থলকে গবাদিপশুর বাসগৃহ (Housing of cattle) বলা হয়। গবাদিপশুর বাসগৃহ আরও যে সকল কারণে আবশ্যক তা হলো-১) প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝড়, বৃষ্টি, অত্যধিক রোদের গরম ও ঠান্ডায় আশ্রয়দান; ২) হিংস্র ও বন্য মাংসাশী জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করা ৩) প্রাণিকে আরামে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালন পালনের সুবিধা; ৪) সুষ্ঠু চিকিৎসার সুবিধা ও সংক্রামক রোগব্যাধি থেকে অন্য পশুকে রক্ষা করা ৫) প্রাণিকে শান্ত, ধীরস্থির ও অনুগত করার সুবিধা এবং সহজেই পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিতকরণের সুবিধা ৬) রাত্রে প্রাণিকে আশ্রয়দান করা ও চোরের হাত থেকে রক্ষা করা ৭) রোগাক্রান্ত প্রাণির রোগ নির্ণয় এবং নিয়মিত গর্ভধারণ ও প্রসবের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সুবিধা এবং ৮) গাভীকে দুধ দোহনে সুবিধা সৃষ্টি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ও জীবাণুমুক্ত উপায়ে দুধ দোহন।

দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন (site selection)। গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

- স্থানটি শুকনো, উঁচু ও সমতল হবে যেখানে বৃষ্টির পানি জমবে না এবং সহজেই বর্জ্য পদার্থ সমূহ নিস্কাশন করা যাবে।
- যে স্থানে খামার করা হবে সেখানকার মাটি বালু ও কাঁকর মিশ্রিত হতে হবে এবং মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।
- যেখানে খামার করা হবে সেখানে বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- দুগ্ধ খামার অবশ্যই জনবসতি ও জনবহুল রাস্তা থেকে দূরে হতে হবে। ঘাস চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি থাকা উচিত।
- খামারের আশেপাশে জলাভূমি থাকা চলবে না এবং ভবিষ্যতে খামারটি বড় করার সুযোগ থাকা আবশ্যক।
- খামার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত স্থানের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম কিনা সেটাও বিবেচনা করতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সহজে ও স্বল্পমূল্যে শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণিবিন্যাস ঃ

গবাদিপশুর বাসগৃহ প্রধানত আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের গবাদিপশুর বাসগৃহ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের দেশের উপযোগী প্রধানত দু'ধরনের গরুরঘর নির্মাণ করা যায় যথা- (১) উদাম ঘর পদ্ধতি এবং (২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি।

১) উদাম ঘর পদ্ধতি (Loose housing system)ঃ

এ পদ্ধতিতে বাচ্চা প্রসব ও দুধ দোহার সময় ছাড়াও দিন ও রাত্রিতে গবাদিপশুকে দেয়াল বেষ্টিত খোলা জায়গায় (paddock) পালন করা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, গরম, ঠান্ডা ইত্যাদি সময় প্রাণির নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খোলা স্থানের সংলগ্ন ঘর সংযুক্ত থাকে। এধরনের বাসগৃহে একটি খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র সকল প্রাণির জন্য উন্মুক্ত থাকে। বয়স্ক বাছুর ও দুধ দিচ্ছেনা এমন গাভীর জন্য উদাম ঘর পদ্ধতি সুবধাজনক। একটি গাভীর জন্য ৩.৫ বর্গমিটার আবৃত স্থান এবং ৭.০ বর্গমিটার খোলাস্থান আয়তনের মেঝের প্রয়োজন।

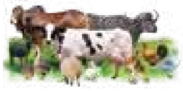

২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি (Stanchion row system)ঃ

এই পদ্ধতির গোশালাকে প্রচলিত গোশালা (conventional barn) বলা হয় ।এই পদ্ধতিতে গরুর গলায় দড়ি বা লোহার জিঞ্জির দিয়ে সীমাবদ্ধ স্থানে বেঁধে পালন করা হয়। একই স্থানে গাভীর দুধ দোহন ও খাওয়ানো সম্পূর্ণ করা হয়। বাঁধা ঘর পদ্ধতির গোশালায় গবাদিপশু সব সময় বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। সেজন্য গোশালা সহজে যাতে পরিস্কার করা যায় এবং গরু যাতে আরামে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গোশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রধানত বাঁধা গোশালা দু'ধরনের হয়। (ক) এক-সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালা।

এক সারি বিশিষ্ট গোশালা (Single row system cowshed)ঃ

সাধারণত অল্পসংখ্যক গবাদিপশুর জন্য গ্রাম অঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িতে একটি লম্বা সারিতে গরু বেঁধে পালনের জন্য এ ধরনের গোশালা তৈরি করা হয়। প্রতিটি প্রাণিকে পৃথক রাখার জন্য লোহার তৈরি জিআই পাইপ দিয়ে পার্টিশন দেয়া ভাল। সাধারণত পার্টিশনের পাইপ লম্বায় ৩ ফুট ও উচ্চতায় ১.৫ ফুট হওয়া প্রয়োজন। গোশালা হবে এক চালা বিশিষ্ট ঘর। এক চালা ঘরের ছাদ প্রায় ১০ ফুট উঁচু করতে হবে।

দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা (double row system cowshed) ঃ

অধিক সংখ্যক পশু পালনের জন্য দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা প্রয়োজন হয়। এধরনের গোশালায় দু'সারি গরুর মাঝখানে ৪ ফুট চওড়া একটি সাধারণ পথ থাকে। এই ধরনের গোশালায় পশুকে দুভাবে দুসারিতে রাখা হয়। যথা- মুখোমুখি পদ্ধতি এবং লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি পদ্ধতি। মুখোমুখি (Face-in or Face to Face system) পদ্ধতিতে গোশালায় দুই সারি পশু সামনা সামনি থাকে। লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি (Face-out or Tail to Tail system) পদ্ধতিতে উভয় সারির মাথা বহির্মুখী থাকে।

চিত্র ঃ (ক) উদাম প্রকৃতির একটি গরুর ঘরের নমুনা। ১ = ঘরের দেয়াল, ২ = মেনজার, ৩ = আবৃত মেঝে, ৪ = ছাদ, ৫ = গাটার, ৬ = খোলা মেঝে, ৭ = প্রাচীর; (খ) মুখোমুখি পদ্ধতিতে গরু রাখার গেশালার নমুনা; (গ) পিছোপিছি পদ্ধতিতে গরু রাখার গেশালার নমুনা; (ঘ) আদর্শ গোশালায় গরু বাঁধার স্থানের নমুনা।

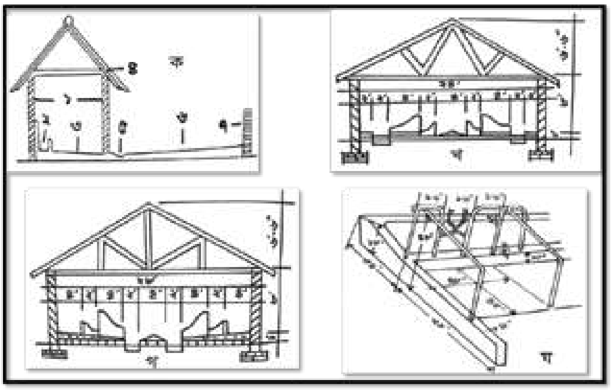

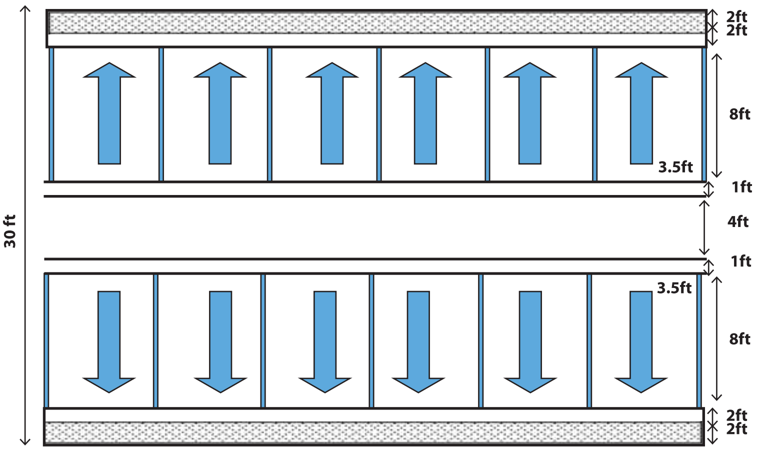

দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালার নকশা

প্রতি গরুর জন্য জায়গা ঃ ৮ফুট X ৩.৫ফুট

খাবার পাত্রের জন্য জায়গা ঃ ৩ফুট X২ফুটX২ফুট

পানির পাত্রের জন্য জায়গা ঃ ৩ফুট X২ফুটX২ফুট

ড্রেন ঃ ১ফুট X ০.৫ফুট

মধ্য পথঃ ৪ফুট (প্রশস্থ)

সেশন-৪২

গবাদিপশুর রেশন, আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য ও পশুখাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

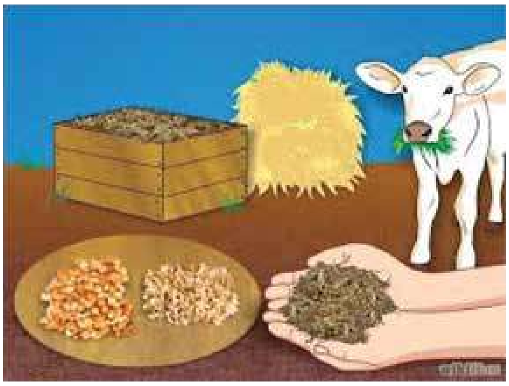

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ রেশন সম্পর্কে ধারণা
- ➢ আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য
- ➢ রেশন তৈরির বিবেচ্য বিষয়
- ➢ পশুখাদ্যের শ্রেণী বিভাগ

কোনো প্রাণিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে খাদ্য সরবারহ করা হয় তাকে রেশন বলে। রেশন দুই প্রকার। যথা-

- মেইনটিন্যান্স রেশন (Maintenance Ration)
- প্রোডাকশন রেশন (Production Ration)

প্রাণি যখন কোনো কাজ করে না অর্থাৎ বিশ্রাম অবস্থায় থাকে তখন যে রেশন দেয়া হয় তাকে মেইনটিন্যান্স রেশন বলে। আবার যখন প্রাণিদেরকে মেইনটিন্যান্স (Maintenance) রেশনের সংগে তার উৎপাদন যেমন- দৈহিক বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন, গর্ভাবস্থা, হালচাষ এর জন্য অতিরিক্ত রেশন সরবারহ করা হয় তখন ঐ রেশনকে Production রেশন বলে। ইহা প্রাণির দৈহিক ওজন এবং উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। উৎপাদন মাত্রা বেশি হলে দেখা যায় একই দৈহিক ওজন বিশিষ্ট প্রাণির প্রোডাকশন রেশনের চাহিদা বেড়ে যায়।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য ঃ

- একটি আদর্শ রেশনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকতে হবে।
- রেশনে ব্যবহৃত উপকরণ অবশ্যই সুস্বাদু হতে হবে।
- রেশনে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ উপকরণ যোগ করা উচিত।
- রেশনের খাদ্য উপকরণগুলো বিষাক্ত পদার্থ বঞ্চিত হবে।
- রেশন অবশ্যই রেচক হবে।
- রেশন আয়তন বেশি হবে।
- রেশন বেশির ভাগ সবুজ ফডার ব্যবহার করা উচিৎ।
- হঠাৎ করে রেশন পরিবর্তন আনা যাবে না।
- প্রতিদিন একই সময়ে রেশন সরবারহ করতে হবে।
- রেশন তৈরির সময় অর্থনৈতিক দিক খেয়াল রাখতে হবে।
- রেশনে ব্যবহত খাদ্য উপাদনগুলো যেন সহজলভ্য হয়।
- একই জাতের ও একই বয়সের প্রাণিদের একই রেশন সরবারহ করতে হবে।
- রেশনে প্রয়োজনীয় খণিজ উপাদান বিদ্যমান থাকতে হবে

রেশন তৈরির বিবেচ্য বিষয় ঃ

যে কোন প্রাণির রেশন তৈরিতে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো

- রেশন তৈরির উদ্দেশ্য কী তা জানতে হবে।
- কোন বয়সের প্রাণির রেশন তৈরি করব তা জানতে হবে।
- প্রাণিটি উৎপাদনের কোন স্তরে আছে তা জানতে হবে।
- প্রাণিটি অসুস্থ হওয়া চলবে না।

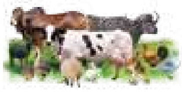

- রেশন ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলোর রাসায়নিক গঠন জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে শক্তির হিসাব জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণ সস্তা ও সহজলভ্য হতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে কোনো টক্সিক পদার্থ আছে কিনা তা জানতে হবে।
- প্রাণির দৈহিক ওজন জানতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উৎস অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet) ঃ সুষম খাদ্য বলতে আমরা ঐ খাদ্যকে বুঝি যাতে দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

খাদ্যের আর্ন্তজাতিক শ্রেণিবিন্যাস ঃ

- শুকনো ফরেজ ও রাফেজ- খাদ্যের এ শ্রেণিতে সকল ফরেজ এবং রাফেজ অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্য যেগুলো ১৮% এর বেশি আঁশ বা ৩৫% কোষ প্রাচীর ধারণ করে, সেগুলোও এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। ফরেজ, রাফেজ, এবং হে (লিগুম ও ননলিগুম), খড়, ফডার, ভূট্টা, স্টোভার, হালস, ইত্যাদি যাদের শক্তির পরিমাণ কম। এগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এর কারণ কোষ প্রাচীরের আয়তন বেশি। চারণ ভূমির ঘাস, গাছের পাতা, সাইলেজ ইত্যাদি ফরেজ ফিড এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।
- এনার্জি ফিড- যে সকল দ্রব্যে আঁশ ও টিডিএন এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৮% এর কম এবং ৬০% এর বেশি। সেগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। যেমন- দানাদার ও তাদের উপজাত।
- প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট। যাদের আমিষের পরিমাণ ২০% এগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।
- মিনারেল বা খণিজ সাপ্লিমেন্ট
- ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট
- অ্যাডিটিভস

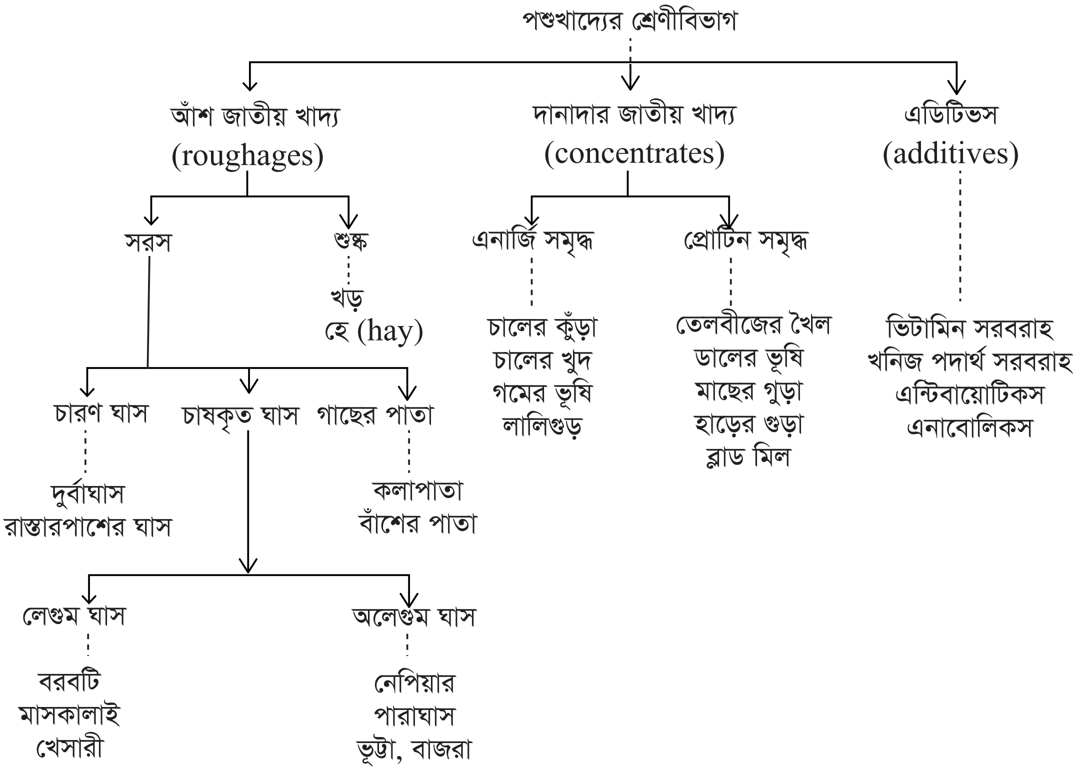
পশুখাদ্যের শ্রেণীবিভাগ
আঁশ জাতীয় খাদ্য
(roughages)
দানাদার জাতীয় খাদ্য
(concentrates)
এডিটিভস
(additives)
সরস
শুষ্ক
খড়
হে (hay)
এনার্জি সমৃদ্ধ
প্রোটিন সমৃদ্ধ
চালের কুঁড়া
চালের খুদ
গমের ভূষি
লালিগুড়
তেলবীজের খৈল
ডালের ভূষি
মাছের গুড়া
হাড়ের গুড়া
ব্লাড মিল
ভিটামিন সরবরাহ
খনিজ পদার্থ সরবরাহ
এন্টিবায়োটিকস
এনাবোলিকস
চারণ ঘাস
চাষকৃত ঘাস
গাছের পাতা
দুর্বাঘাস
রাস্তারপাশের ঘাস
কলাপাতা
বাঁশের পাতা
লেগুম ঘাস
অলেগুম ঘাস
বরবটি
মাসকালাই
খেসারী
নেপিয়ার
পারাঘাস
ভূট্টা, বাজরা

সেশন -৪৩

গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- গবাদিপশুর খাদ্য উপকরণ পরিচিতি
- গাভীর সুষম খাদ্য তৈরী ও সরবরাহ

গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

বিভিন্ন প্রাণির দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রাণিখাদ্য নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-

- স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (Maintenance) ঃ প্রাণির দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য।
- দৈহিক বৃদ্ধিসাধন (Growth) ঃ বাড়ন্ত প্রাণির সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।
- বাচ্চা উৎপাদন (Reproduction) ঃ প্রাণি সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব তথা প্রাণির উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী প্রাণির গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।
- দুধ উৎপাদন (Milk production) ঃ প্রাণির দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রাণিখাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার পরিমাণ ও মান নির্ভর করে।
- প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা (Daily work) ঃ প্রাণির কাজের ধরন ও পরিশ্রমের উপর প্রাণিখাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাণি শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে।
- মাংস উৎপাদন (Meat production) ঃ প্রাণির মাংস প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎকৃষ্টমানের মাংসের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম পশুখাদ্যে ছয় প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে। যথা- (ক) পানি, (খ) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, (গ) আমিষ বা প্রোটিন (ঘ) চর্বি বা স্নেহ পদার্থ, (ঙ) খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস এবং (চ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।

ভূট্টা	সয়ামিল	রাইস পলিশ	ডিসিপি পাউডার
তিলের খৈল	ভূট্টা ভাঙ্গা	খড়	নাড়িকেলের খৈল
গম ভাঙ্গা	লবণ	কাঁচা ঘাস	ঝোলাগুড়

চিত্রঃ গবাদিপশুর বিভিন্ন খাদ্য উপাদান

পশুখাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ঃ

গবাদিপশুর খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পশুখাদ্য সামগ্রীকে সাধারণত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- আঁশ জাতীয় খাদ্য এবং দানাদার খাদ্য। তবে অনেকে এডিটিভস-কে আলাদা একটি ভাগ হিসেবে দেখেন। তাই গবাদিপশুর খাদ্যকে নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা হল।

আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য ঃ

যেসব খাদ্যে উচ্চমাত্রায় তন্তু বা আঁশ এবং নিম্ন মাত্রায় মোট হজমী উপাদান (TDN) থাকে তাদের আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে। খড়, কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা গুল্ম ইত্যাদি। আর্দ্রতার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এই জাতীয় খাদ্য আবার দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-

- শুস্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (Roughages) ঃ এই জাতীয় খাদ্যে ১০-১৫% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- ধানের খড়, গমের খড়, শুষ্ক ঘাস বা হে, ডাল জাতীয় গাছের ভুষি ইত্যাদি।
- রসালো আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ এই জাতীয় খাদ্যে ৬০-৯০% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- বিভিন্ন প্রকার কাঁচা ঘাস, সাইলেজ, ফড়ার জাতীয় গাছের পাতা, মিষ্টি আলু, মুলা, গাজর, পাতাকপি ইত্যাদি।

গাভীর সুষম খাদ্য

১। কাঁচা সবুজ ঘাস ঃ দৈনিক ১২-১৫ কেজি
২। শুকনা খড় ঃ দৈনিক ৩-৪ কেজি
৩। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ঃ

দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা	
(ক) চালের কুঁড়া	২ কেজি
(খ) গমের ভূষি	৫ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১.৮ কেজি
(ঘ) তিল বা বাদাম খৈল	১ কেজি
(ঙ) লবণ	০.১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.১ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

দানাদার খাদ্য সরবরাহ-
ক) ১০০ কেজি ওজনের শুষ্ক গাভীকে প্রতিদিন উপরোক্ত মিশ্রণের ২-৩ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
খ) গাভী গর্ভবতী হলে ৫ম মাস থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত ১.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
গ) গাভী দুধাল হলে প্রতি ২.৫ লিটার দুধের জন্য অতিরিক্ত ১ কেজি হারে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৪। পানি ঃ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি। শরীরের ওজনের ১০-১৫% পানি সরবরাহ করা প্রয়োজন।

সেশন-৪৪

গো-খাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস (ফডার) পরিচিতি ও চাষ পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ গোখাদ্য হিসাবে ভূট্টা ঘাষের চাষ পদ্ধতি
- ➢ জার্মান ঘাসের চাষ পদ্ধতি
- ➢ হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি

ভূট্টা ঘাষ ঃ

চাষ পদ্ধতি ঃ উঁচু নিচু কিন্তু পানি জমে না এমন জমিতে ভূট্টা চাষ করা যায়। সারা বছরই ভূট্টার চাষ করা যায়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস, শীতের শেষে, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসেও পানি সেচ দিয়ে ভূট্টার চাষ করা যায়। অধিক শীত অধিক বৃষ্টি কোন অবস্থাতেই ভূট্টা ভালো হয় না। বীজ বপনের আগে ৫-৬ বার জমি চাষ করতে হয়। বিঘা প্রতি ৫-৬ কেজি ভূট্টার প্রয়োজন পড়ে।

বপন প্রণালি ঃ

সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা ভালো। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫-২ ফুট। ১০ ইঞ্চি পর পর বীজ বপন করতে হয়। ক্ষেত সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সারপ্রয়োগ ও পানিসেচ ঃ

জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ১-২ ঘন গোবর সার, ১৫ কেজি ইউরিয়া, ৬ কেজি টিএসপি এবং ৩ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।

গবাদি পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণ ঃ

২.৫-৩ ফুট উচু হলেই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। মোচা আসার পর দুধ অবস্থায় সাইলেজ তৈরি করে রেখে দিলে সারা বছর প্রাণিকে খাওয়ানো সম্ভব হয়।

ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার ঃ

- ❑ দুধ উৎপাদন খরচ ৬০% কমে যায়।
- ❑ বছর ব্যাপী উৎপাদন পাওয়া যায়।
- ❑ সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।
- ❑ লিগুম জাতীয় ঘাসের সাথে চাষ করা যায়।

জার্মান ঘাস ঃ

জার্মান ঘাস এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। এ ঘাসের কান্ডের গিটে শিকড় থাকে এবং পারা ঘাসের মত লাগানোর পর ঘাসের লতা সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘাস গরুর খুব পছন্দনীয়, দ্রুত-বর্ধনশীল ও উচ্চ ফলনশীল। বাংলাদেশে এ ঘাস আবাদের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

জমি নির্বাচন ঃ জার্মান ঘাস পারা ঘাসের মত নিচু ও জলাবদ্ধ জমিতে চাষ করা যায়। জার্মান ঘাস দাঁড়ানো পানিতে জন্মানো যায়। সে সমস্ত জমিতে সারা বছর পানি থাকে অথবা কিছু কাল ডুবে থাকে, সেসব জমিতে এ ঘাস চাষ করা যায়। এছাড়া খাল, বিল, মজাপুকুর, নদীর ধার, ডোবা,নালাতে এই ঘাস চাষের জন্য উপযুক্ত।

রোপনের সময় ঃ মার্চ হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ ঘাস চাষের উপযুক্ত সময়।

রোপনের দুরত্ব ঃ সারি থেকে সারি, গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১-১.৫ ফুট।

বংশবিস্তার ঃ এ ঘাস হতে ভালো বীজ উৎপাদন হয় না। কাজেই কাটিং ও মোথা দ্বারা বংশ-বিস্তার করতে হয়।

কাটিং বা মোথার প্রাপ্তিস্থান ঃ জেলা বা উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসে বিনামূল্যে কাটিং বা মোথা বিতরণ করা হয়।

চারা তৈরি ঃ গাছ পরিপক্ক হলে কান্ডের গিট হতে শিকড় বের হয়। এ রকম পরিপক্ক গাছের কমপক্ষে ৩ টি গিট নিয়ে কাটিং করতে

হয়। সমতল শুকনা জমিতে লাগালে কয়েকটা চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে কাটিং গুলো কাত করে অর্থাৎ ৪৫-৬০ ডিগ্রি কোণে লাগাতে হবে। এরপরে কয়েকটা চাষ দিয়ে জমি আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে কোদাল দিয়ে গর্ত করে চারা বা কাটিং রোপন করতে হবে। মাটির নীচে একটি মাটির সমান এবং অপর গিট মাটির উপরে থাকে।

সার প্রয়োগ ঃ জার্মান ঘাস উর্বর জমিতে ভাল হয়। ভাল ফলনের জন্য জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর দিতে হবে এবং চারা লাগানোর ২/৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে, প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি ইউরিয়া সার উপরে প্রয়োগ করতে হবে।

ঘাস কাটা ঃ জার্মান ঘাস দ্রুত-বর্ধনশীল । রোপনের ৫০-৬০ দিন পর প্রথম কাটার উপযোগী হয় এবং এরপর শীতকালে এ ঘাসের তেমন বৃদ্ধি ঘটে না।

ফলন ঃ জার্মান ঘাস বছরে প্রায় ৫ বার কাটা যায়। উর্বর জমিতে ও ভালো ব্যবস্থাপনায় বছরে একর প্রতি ৩০-৪৫ টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়।

হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস ঃ

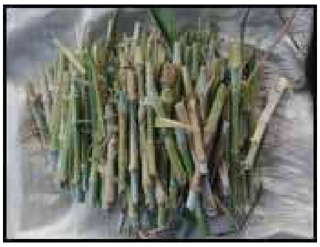

১. নেপিয়ার প্রাণি খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় ঘাস। নেপিয়ার এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। দেখতে আখের মত, লম্বা ১৬ ফুট বাতার চেয়ে ও বেশি হয়ে থাকে। রং সবুজ, এ ঘাসের খাদ্য-মান কচি অবস্থায় বেশি।
২. প্রতি ২৫ থেকে ৩৫ দিনে এ ঘাস কাটা সম্ভব। বছরে ৮ থেকে ১০ বার কাটা যায়।
৩. প্রোটিন কনটেন্ট প্রায় ১৬%। এক হেক্টরে বছরে উৎপাদন প্রায় ৬০০ টন।
৪. রোপন কাল বর্ষা মৌসুম। ভাল ফলন ও পুষ্টি পেতে হলে সেচ ও সার সুবিধা থাকা ভাল।
৫. জমি থেকে কেটে এনে এ ঘাস সরাসরি পশুকে খাওয়ানো ভাল।
৬. একবার রোপন করলে ২ বছর পর্যন্ত এর ফলন পাওয়া যায়। সারা বছরই এ ঘাস চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

- এই ঘাস আবাদের জন্য উঁচু ও ঢালু জমি যেমন বাড়ির পার্শ্বে উঁচু অনাবাদি জমি, পুকুরের পাড়, রাস্তার ধার ও বেড়ী বাঁধ সবচেয়ে উত্তম। ডোবা, জলাভূমি কিংবা প্লাবিত হয় এমন অঞ্চলে এই ঘাস আবাদ করা যায় না।
- সমতল জমিতে ৪/৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি আগাছা মুক্ত করে কাটিং বা চারা লাগাতে হবে। এই ঘাস আখেঁর কাটিং এর মত কাটিং অর্থাৎ কান্ডের দুই মাথায় কমপক্ষে দুটি বা তিনটি গিট রেখে কাটতে হবে। একসারি রোপন করা উচিত। একটি গিট মাটির নীচে, মধ্যের গিট মাটি সমানে রেখে চারা বা কাটিং আনুমানিক ৪৫ ডিগ্রি কৌনিক ভাবে লাগাতে হয়।
- পচা গোবর ও ফার্ম জাত আবর্জনা, পচানো ঘাস হেক্টর প্রতি প্রায় ৩০০০/৪০০০ কেজি চাষের সময় ভালভাবে ছিটিয়ে দিলে মাটিতে পুরোপুরি মিশে যায়। বেশি ফলন পেতে হলে এর সাথে হেক্টর প্রতি ২২৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টিএসপি এবং ৭৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হয়।
- রোপনের প্রায় ১০/১২ দিন পর হেক্টর প্রতি ৮০ কেজি
ইউরিয়া সার দিলে ভাল হয়। প্রত্যেক কাটিং এরপর দুই-সারির মাঝের জমি ভালভাবে লাঙ্গল বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- জমিতে সার ছিটাবার ২ (দুই) সপ্তাহ পর ঘাস কাটা উচিত। সার ছিটাবার পরে দীর্ঘদিন খরা থাকার পর হঠাৎ অধিক বৃষ্টিপাতের পরদ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ঘাস কেটে খাওয়ানো উচিত নয়।

সেশন-৪৫

হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাইড্রোফনিক ঘাস সম্পর্কে ধারণা
- হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে ভূট্টা ঘাস চাষ
- হাইড্রোফনিক ঘাস খাওয়ানোর উপকারিতা

হাইড্রোফনিক ঘাস

হাইড্রোফনিক বা মাটি ছাড়াই ঘাসের চাষ ঃ

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় বর্তমানে আমাদের দেশেও মাটি বিহীন ঘাস চাষ শুরু হয়েছে। মাটির স্পর্শ ছাড়াই পানির ওপর ফসল উৎপাদনের হাইড্রোফনিক পদ্ধতি আমাদের দেশে অবিস্কার করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিবিধ ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ। তাই মাটি ছাড়াই প্রাণি খাদ্যের চাহিদা পূরণে হাইড্রোফনিক চাষ পদ্ধতি হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট কৌশল।

হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে বীজ হিসেবে গম, ছোলা, খোরি, ভুট্টা, সয়াবিন, মাষকলাই সহ বিভিন্ন শস্যের অংকুরোদগম বীজ ব্যবহার করে খাদ্যটি উৎপাদন করা যায়।

হাইড্রোফনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি (ভূট্টা ঘাস) ঃ প্রথম ভূট্টার বীজকে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে ভেজা চটের বস্তা অথবা কালো সুতিকা পড়ের ভেতরে করে ২৪ ঘন্টা অন্ধকার স্থানে রাখতে হয়। শেষে একপাশ ছিদ্র যুক্ত ট্রের ভেতরে পাতলা করে ঐ বীজ বিছিয়ে কালো কাপড় দিয়ে দুই দিন ঢেকে রাখতে হবে। এই দুই দিন খেয়াল রাখতে হয়, বাইরের আলো-বাতাস যেন না লাগে। কাপড়টি সারাক্ষণ ভেজা রাখতে হয়। তৃতীয় দিন কাপড় সরিয়ে আধাঘন্টা পরপর পানি ছিটাতে হবে। তারপর টিনশেডের একটি ঘরে বাঁশ বা কাঠের তাক বানিয়ে ট্রেগুলো সাজিয়ে রাখতে হয়। এক কেজি বীজ থেকে ৯ দিন পরে ৭ থেকে ৮ কেজি ঘাস পাওয়া যায়। পাঁচ বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করা হয় মাত্র ৩০০ বর্গফুটের একটি টিন শেডের ঘরে সেই পরিমাণ হাইড্রোফনিক খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

উপকারিতাঃ

জমিতে ঘাস চাষের প্রচলিত ধারণা বদলে ঘরের ভেতরে মাটি ছাড়া কেবল পানি ছিটিয়ে প্রাণি খাদ্য উৎপাদিত হয়। হাইড্রোফনিক ফডার নামের এই প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রাণি খাদ্য উৎপাদনে খরচও কম। এই খাদ্যে বাজারের দানাদার ও মাঠের সবুজ ঘাসের প্রায় সব পুষ্টি উপাদান আছে। তাই ধিরে ধিরে বিষয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। হাইড্রোফনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিখাদ্য তৈরি খুবই সম্ভাবনাময়। শুধু এই খাদ্য দিয়ে গরু, ছাগল, ভেড়া খরগোশ ও রাজহাঁস পালন করা সম্ভব। হাইড্রোফনিক ঘাষের মূল ও বীজ সংযুক্ত থাকে যা প্রাণির জন্য বাড়তি পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেয়।

সেশন-৪৬

সাইলেজ পরিচিতি, উন্নত জাতের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরী প্রক্রিয়া

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- সাইলেজ উপকারিতা
- ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য
- সংরক্ষণ ও খাওয়ানোর পদ্ধতি

সাইলেজ ঃ

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। সাইলেজ হলো গাজনকৃত সবুজ ঘাস। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশ সংরক্ষণ করাহয়। এই প্রক্রিয়াজাত ফডারকে সাইলেজ বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

সাইলেজের উপকারিতা ঃ

১. সবুজ ঘাসকে রসালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। সারা বছর ব্যাপী আঁশ জাতীয় প্রাণিখাদ্যের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

২. সবুজ ঘাসের যেসব কান্ড সবুজ অবস্থায় গরু খেতে পারে না, গাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কারণে উহা নরম ও খাওয়ার উপযোগী হয়। ঘাসের সাইলেজে ৮৫% পুষ্টি পাওয়া যায়।

৩. এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়। বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।

৪. সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড খাদ্য। এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।

৫. সাইলেজের ঘ্রান প্রাণির খাদ্যের রুচি বাড়িয়ে দেয়।

অধিক উপযোগী ফডার ঃ

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধারণত নন-লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। যে গর্তে বা প্রকোষ্ঠে সাইলেজ তৈরী করা যায় তাকে সাইলেজ পিট বলে। সাইলেজপিট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে-

সাইলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঃ

১. টাওয়ার সাইলো ২. গ্যাসটাইট সাইলো ৩। পিট সাইলো ৪। সমান্তরাল সাইলো ৫। প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ সাইলো

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ ২. গন্ধ-আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ ৩. পিএইচ ৩.৫-৪.৫

সাইলেজ খাওয়ানো ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যেখানে সাইলেজ কে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমাণ সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাচা ঘাস অথবা শুকনা খড় ও একত্রে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

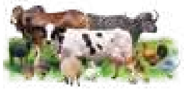

সেশন-৪৭

উন্নত জাতের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- সাইলো পিট তৈরী
- সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি

এই সেশনে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে সাইলেজ তৈরীর উপকরণ সংগ্রহ করে সাইলেজ তৈরীর পদ্ধতি হাতেকলমে শিখাবেন। নিচে একটি সাইলেজ তৈরী পদ্ধতির নমুনা দেওয়া হলো-

উপকরণ ঃ

উন্নত জাতের ঘাস- ভুট্টা/নেপিয়ার/পারা/জার্মান, চিটাগুড়, পানি, বালতি, ঝর্ণা, পলিথিন, শুকনো খড়, কোদাল ইত্যাদি।

পদ্ধতি-

মাটির গর্ত তৈরী ঃ

একশত ঘনফুট (১০০) একটি মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে,যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারণত সবুজ ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলায় চার কোনা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে। মাটির গর্তে ঘাস সাজানোর সময় সাইলোর চারিদিকে পলিথিন মুড়ে অথবা সাইলোর নীচে এবং চারিদিকে খড় দিয়ে মাটি ঢেকে তার উপরে স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে সাইলেজ করলে ঘাস নিশ্চিন্তে অনেক দিন রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি ঃ

যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা কেটে নিতে হবে। সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার যত বেশী চাপাইয়া মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশি উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলাসেস ছাড়া ও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ ঃ ১ অথবা ৪ ঃ ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে।ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভাল ভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে। সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন প্রাণি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ ঃ

মাটির গর্ত ছাড়া ও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরি খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগে পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিতে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি প্রাণি না থাকলে ও তিনি তার নিজস্ব জমিতে ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউড গবেষণা করে দেখেছেন যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে যে ধরনের সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সেশন-৪৮

সবুজ ঘাস এবং ভিজা খড় সংরক্ষণ ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি
- ভিজা খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি

কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

মৌসুম ভিত্তিক কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করলে শুস্ক মৌসুম গো-খাদ্যের বিশেষ করে ঘাসের অভাব দূর করে গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের দেশের কৃষক সহজে ও স্বল্প ব্যায়ে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে শুস্ক মৌসুমে গরুর জন্য গো-খাদ্য সরবারহ অব্যাহত রাখতে পারেন। সংরক্ষিত এ ঘাসের গুনগত ও খাদ্যমান কাঁচা ঘাসের চেয়ে বেশী।

প্রাথমিক প্রস্তুতি ঃ

প্রথমে উঁচু জায়গায় মাটিতে গর্ত তৈরি করতে হবে। গভীরতা এবং গর্তের আকার হবে ঘাসের পরিমাণ অনুযায়ী।

উপাদান ঃ কাঁচা ঘাস ঃ গর্ত ভর্তি হয় এমন পরিমাণ।

চিটাগুড়া : প্রতি ১০০ কেজি কাঁচা ঘাসের জন্য ৩-৪ কেজি চিটা-গুড়।

পানি : চিটা-গুড়ের সমপরিমাণ বা সামান্য বেশী।

পলিথিন : গর্তটিতে সম্পূর্ণ বিছিয়ে গর্ত ভর্তি ঘাস আচ্ছাদন বা ঢেকে দেওয়া যায় এই পরিমাণ । চিটা-গুড় মিশ্রিত পানি ছিটাবার ঝর্ণা- ১ টি।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ

১. প্রথমে গর্তে পলিথিন বিছাতে হবে। পলিথিনের পরিমাণ এরূপ যেন উপরিভাগের অংশ দ্বারা গর্ত ভর্তি ঘাস ঢেকে দেয়া যায়।

২. এবার গর্তে ঘাস ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম ৪০ কেজি ঘাস গর্তে প্রবেশ করিয়ে তার উপর ১ কেজি চিটাগুড় বা নালি ও ১ লিটার পানির মিশ্রণ ঝর্ণা দ্বারা ঘাসের উপর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৩. চিটাগুড় মিশ্রিত পানি ঘাসের উপর ছড়ানোর পর পা দিয়ে উত্তম রূপে মাড়িয়ে যথাসম্ভব ঘাসের ভিতরের বাতাস বের করে নিতে হবে। পুনরায় প্রথমবারের মত একই পরিমাণ ঘাস ছড়িয়ে একই পরিমাণ চিটাগুড় মিশ্রিত পানি ছিটাতে হবে।

৪. গর্তটি ঘাস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরাট না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ ভাবে পরতে পরতে ঘাস সাজাতে হবে। গর্তটি ঘাস দ্বারা পূর্ণ হলে ঘাসের স্তুপটি বাড়তি পলিথিন দ্বারা এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরবর্তী সময়ে পলিথিন ছিড়ে না যায় বা কোন ছিদ্রের সৃষ্টি না হয়।

৫. লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানি গর্ত ভর্তি ঘাসে প্রবেশ করতে না পারে।

৬. গর্ত ভর্তি রাখার ১৫ দিন পর এ ঘাস গরুকে খাওয়ানোর উপযোগী হয়। সংরক্ষিত এ ঘাসের গুণগত মান সাধারণ ঘাস হতে বেশী এবং গরুর জন্য অত্যন্ত পছন্দনীয়।

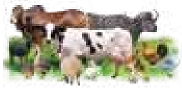

ভিজা খড় সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

বর্ষা মৌসুমে অনেক সময় ফসল আহরণের পর অবশিষ্ট ভিজা খড় শুকানো সম্ভব হয় না এবং পঁচে নষ্ট হয় অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে গুনগত মান নষ্ট হয়। ভিজা খড় না শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত এই ভিজা খড়ের পুষ্টিমান সাধারণ খড়ের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণের উপায় ঃ

১. ভিজা খড় সংরক্ষণের জন্য উঁচু, প্রাণিজ মেনা অথবা পানি দ্রুত সরে যায় এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত।

২. ৬ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার গর্ত ১২ ফুট গভীর হতে হবে।

৩. ভিজা খড় সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (প্রতি ১০০ কেজি খড়ের জন্য পরিমাণ মতো পলিথিন, ১.৫-২ কেজি ইউরিয়া) সমাবেশ ঘটাতে হবে।

৪. খড় সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত স্থানে পলিথিন বা পুরানো খড়কুটা বিছাতে হবে।

৫. এবারে ভিজা খড় ছড়িয়ে প্রতি ১০০ কেজি ভিজা খড়ের উপর ১.৫-২.০ কেজি ইউরিয়া স্তরে স্তরে ছিটিয়ে লম্বাটে গর্তের ভিতর খড়ের স্তুপ সাজাতে হবে। খড় বেশী ভিজা হলে প্রতি ৩ স্তর পর ১ স্তর শুকনা খড়ের স্তর সাজাতে হবে।

৬. অতঃপর সম্পূর্ণ স্তুপটি পলিথিন দ্বারা এরূপে আবৃত হবে যেন কোনভাবেই স্তুপের ভিতর বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। এজন্য স্তুপের চার ধারের বাড়তি পলিথিন মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে।

৭. লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাক, চিল, পলিথিনে কোন ছিদ্র সৃষ্টি করতে না পারে। এভাবে খড় সংরক্ষণ করলে সংরক্ষনের দুই সপ্তাহ পর হতেই সংরক্ষিত খড় গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। সংরক্ষিত এ খড় ১ বৎসর পর্যন্ত গরুকে খাওয়ানো যাবে।

শুকনো খড় ও সংরক্ষিত ভিজা খড় এর পুষ্টিমান ও কার্যাবলীর তুলনা নিম্নে দেওয়া হলো-

পুষ্টি ও কার্যাবলী	শুকনো খড়	সংরক্ষিত খড়
প্রোটিন বা আমিষ	৪-৫%	৯-১২%
রুমেনে পাচ্যতা	২৭%	৪৫%
বিপাকীয় শক্তি (প্রতি কেজিতে)	৭ মেগাজুল	১০ মেগাজুল
প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনে খাদ্য গ্রহণ	১.৭২ কেজি	২.৫ কেজি

সেশন-৪৯

খরগোশ পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- খরগোশ পালনের সুবিধা ও জাত নির্বাচন
- খরগোশের বাসস্থান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- খরগোশের প্রজনন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে খরগোশকে সাধারনত শখের বা পোষা প্রাণি দিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ পালন করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টি করা যায়।

খরগোশের মাংসে প্রোটিন, শক্তি, খনিজ ইত্যাদির পরিমাণ বেশী এবং ফ্যাট, সোডিয়াম ও কোলেস্টেরল এর পরিমাণ কম। অন্যসব প্রাণির তুলনায় খরগোশ সহজেই পালন করা যায়। ইহার খাদ্য এবং ব্যবস্থাপনা সহজ বিধায় বাড়ির মহিলা ও ছেলে মেয়েদের কাজের ফাঁকে এদের যত্ন করতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

খরগোশ পালনের সুবিধা ঃ খরগোশ দ্রুত বর্দ্ধনশীল প্রাণী। একসাথে ২-৮টি বাচ্চা প্রসব করে এবং ১ মাস পরপর বাচ্চা প্রদান করে। অল্প জায়গায়, স্বল্প খাদ্যে ও খরচে পারিবারিক পর্যায়ে পালন করা যায়। খরগোশের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সকল ধর্মের লোকই ইহার মাংস খেতে পারে। রান্না ঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, বাড়ির পাশের ঘাস, লতা পাতা খেয়ে এর উৎপাদন সম্ভব।

জাত নির্বাচন ঃ বিশ্বে বিভিন্ন প্রজাতির খরগোশ দেখা যায় এর মধ্যে ডার্ক গ্রে (নেটিভ), ফক্স, ডাচ, মিনি রেক্স, নিউজিল্যান্ড লাল, নিউজিল্যান্ড সাদা, নিউজিল্যান্ড কালো, বেলজিয়াম সাদা, ছিনছিলা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাংস উৎপাদনের জন্য ডার্ক গ্রে (নেটিভ), বেলজিয়াম সাদা, নিউজিল্যান্ড লাল, ডাচ রেবিট উপযোগী।

বাসস্থান ঃ ডিপ লিটার ও খাঁচা পদ্ধতিতে খরগোশ পালন করা যায়। তবে ডিপ লিটার পদ্ধতির চেয়ে খাঁচা পদ্ধতিতে খরগোশ পালন সহজ ও লাভজনক। ডিপ লিটার পদ্ধতিতে পাকা ঘরে বা কাঠের ঘর বানিয়ে মেঝেতে ২ইঞ্চি পুরু করে কাঠের গুড়া বিছিয়ে খরগোশ পালন করা হয়।

খাঁচা পদ্ধতি ঃ বানিজ্যিকভাবে খরগোশ পালনের জন্য লোহার পাত ও নেট দিয়ে তৈরী ৩-৪ তাক বিশিষ্ট খাঁচা অধিক উপযোগী। খাঁচাতে খরগোশের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা-ক) পর্ণ বয়স্ক পুরুষ খরগোশের জন্য ৪ বর্গফুট। খ) পূর্ণ বয়স্ক মা খরগোশের জন্য ৬ বর্গফুট (প্রসূতি ঘরসহ) গ) বাচ্চা/বাড়ন্ত খরগোশের জন্য ১.৫ বর্গফুট। পূর্ণ বয়স্ক প্রতি জোড়া খরগোশের জন্য খাঁচা ৩ ফুট লম্বা, ১.৫ ফুট চওড়া এবং ১.৫ ফুট উচ্চতা হওয়া উচিত।

খরগোশের খাদ্য ও পুষ্টি ঃ একটি বয়স্ক খরগোশের খাদ্যে ক্রুড প্রোটিন ১৭-১৮%, আঁশ ১৪%, খনিজ ৭%, বিপাকীয় শক্তি ২৭০০ কিলো ক্যালোরী/কেজি থাকা প্রয়োজন। খাদ্য গ্রহন-বয়স্ক খরগোশের জন্য ১৩০-১৪৫ গ্রাম/দিন, দুধালো খরগোশের জন্য২৫০-৩০০ গ্রাম/দিন, বাড়ন্ত খরগোশের জন্য ৯০ গ্রাম/দিন হিসেবে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। মুরগির জন্য তৈরীকৃত দানাদার মিশ্রণ খরগোশের রেশন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

খরগোশের প্রজনন ব্যবস্থা ঃ খরগোশ সাধারণত: ৫-৬ মাস বয়সে প্রথম প্রজননক্ষম হয়। গর্ভবতী খরগোশ ২৮-৩৪ দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয়। খরগোশের দুগ্ধদানকাল সময় ৬-৮ সপ্তাহ। প্রজননের সময় একটি পুরুষ খরগোশের সাথে ৩-৪টি স্ত্রী খরগোশ রাখা যেতে পারে তবে গর্ভবতী খরগোশকে পৃথক করে রাখা ভাল।

খরগোশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খোরগোশ লালন পালন করলে খরগোশের রোগব্যাধি কম হয়। নোংরা পরিবেশে খরগোশ পালন করলে মাইকোপ্লাজমেসিস (লক্ষণ-শ্বাসকষ্ট), ককসিডিওসিস (লক্ষণ-রক্ত আমাশয়), এন্টারাইটিস (লক্ষণ-পেট ব্যাথা, পাতলা পায়খানা) প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগের লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধে খরগোশের বাসস্থান নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুনাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে। প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। খরগোশের ঘরে বন্যপ্রাণি, পোকা মাকর যেন প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

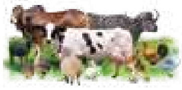

সেশন-৫০

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে ধারণা
- ➢ কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ও অসুবিধা
- ➢ কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি

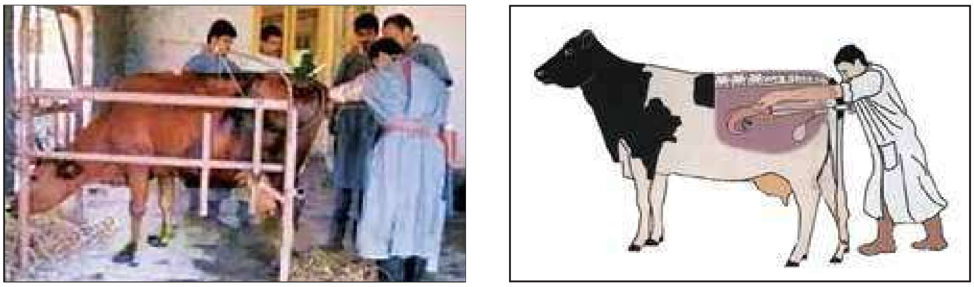

চিত্রঃ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন

গরুর প্রজনন পদ্ধতি

কৃত্রিম প্রজনন (Artificial insemination)ঃ

গবাদিপশুর কৌলিক মান উন্নয়নের (Genetic improvement) জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ষাঁড় ব্যবহার করে বহুসংখ্যক গাভীকে পাল দেওয়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বহুলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কৃত্রিম প্রজননের অদিকথা (History of artificial insemination)ঃ

খ্রীস্টের জন্মের ১৩০০ বছর পূর্বে একজন আরব বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ঘোড়ীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারন ঘটাতে সক্ষম হন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম প্রজননের প্রথম সফলতা লাভ করেন ইটালির বিজ্ঞানী স্পেলেনজানি ১৭৮০ সালে। তিনি সাফল্যজনকভাবে কুকুরীতে কৃত্রিম প্রজনন করেন। ১৯২৮ সালে থেকে রাশিয়াতে ব্যাপকভাবে গাভীতে কৃত্রিম প্রজনন প্রয়োগ শুরু হয়। পাকভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালে মহিষের দুগ্ধ খামারে কৃত্রিম প্রজনন শুরু হয়। স্বাধীনতা পূর্ব পঞ্চাশ-এর দশকে এদেশে সরকারীভাবে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

কৃত্রিম প্রজনন কী ?

কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে-

- কৃত্রিম প্রজনন ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়।
- সংগৃহিত বীর্যের গুনাগুন পরীক্ষা করা হয়।
- বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীর্যকে সংরক্ষণ করা হয়। বীর্যকে তরল করা হয় এবং
- যান্ত্রিক উপায়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীর্য প্রবেশ করানো হয়।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা (Advantage of artificial insemination)

কৃত্রিম প্রজনের মাধ্যমে ভালো গুণাবলী সম্পন্ন উন্নত ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করে গাভীকে পাল দেওয়া যায় এবং এভাবে জাতের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ষাঁড় বছরে ৫০ টি গাভীর সাথে মিলিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের বেলায় ঐ ষাঁড়ের বীর্য দিয়ে বছরে কমপক্ষে ১০,০০০ গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব হয়।

উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীর্য সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়।

বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড় আমদানি না করেও দেশী অনুন্নত জাতের গাভীকে পাল দেওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় বড়ো আকারের ষাঁড় দিয়ে ছোট আকারের গাভীকে প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়া অসুবিধা হয়ে পড়ে। কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়। একস্থান থেকে অন্যস্থানে গাভী গাভী বা ষাঁড় পরিবহণের খরচ এবং ঝামেলা পোহাতে হয় না।

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ষাঁড় থেকে গাভীতে সংক্রমক রোগ (যেমন-ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি) বিস্তার প্রতিহত করা যায়। গাভীতে বীর্য প্রবেশ করানোর পূর্বে বীর্যের গুণাবলী পরীক্ষা করে দেখা হয় বলে গাভীর গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা (Disadvantages of artificial insemination)

১) দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপারেটর এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

৩) প্রাকৃতিকভাবে পাল দেওয়ার চেয়ে বেশি সময়য়ের প্রয়োজন হয়।

৩) যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিস্কার করা না হলে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকলে গাভীর গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যায়।

কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ঃ

১) কৃত্রিম যোনীর মাধ্যমে প্রজনন ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ।

২) সিমেনের গুনাগুন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করন। ক) খালি চোখে পরীক্ষা- পরিমান, রং, ঘনত্ব পরীক্ষা করা হয়। খ) অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে- শুক্রানুর গতিশীলতা, জীবিত/মৃত শুক্রানু, শুক্রানুর গঠন পরীক্ষা করা হয়।

৩) সিমেনের আয়তন বৃদ্ধিকরণ- সিমেনের আয়তন বৃদ্ধি ও শুক্রানুর কার্যক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে সংগৃহীত সিমেনকে ডাইলুন্টে দ্বারা পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

৪) সিমেন সংরক্ষণ।

  ক) তরণ সিমেন- ষাঁড় হতে বীর্য সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করার পর ৪-৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ২-৩ দিন সংরক্ষণ করা যায়। তরল সিমেনে প্রতিমাত্রায় (১ সিসি) ১০-১৫ মিলিয়ন শুক্রানু থাকে। রেফ্রিজিরেটরে এই সিমেন সংরক্ষণ করা যায় এবং থার্মোফ্লাক্সে পরিবহন করা সম্ভব।

  খ) হিমায়িত সিমেন- সিমেন সংরক্ষনের আধুনিকতম পদ্ধতি হলো গভীর হিমায়িত মাত্রায় সংরক্ষণ। প্রজনন ষাঁড় হতে সংগৃহীত সিমেন তরলীকৃত করে ফিলিং-সিলিং মেশিনের সাহায্যে ০.২৫-০.৫ সিসি সিমেন ক্ষুদ্র স্ট্র এর মধ্যে ভরে কম্পিউটারাইজড ফ্রিজিং মেশিনের মাধ্যমে হিমায়িতকরে তরল নাইট্রোজেনে ক্যানের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতি স্ট্র এর মধ্যে প্রতিমাত্রা সিমেনে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রানু থাকে। -১৯৬ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় তরলীকৃত নাইট্রোজেনে ২০-২৫ বৎসর পর্যন্ত শুক্রাণু সংরক্ষণ করা যায়।

৫) কৃত্রিম প্রজনন।

- ডাকে আসা বা গরম হওয়া গাভী/বকনাকে প্রজনন করানো হয়। গাভী/বকনা ঠিকমত গরম বা হিটে আসলে ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন করাতে হবে। সঠিক সময়ে প্রজনন করানো না হলে গাভী/বকনা গর্ভধারন করবে না।
- প্রজননের পূর্বে গাভী/বকনার যোনি ও পার্শ্ববর্তী স্থান পরিষ্কার করতে হবে।
- গ্লাভস পরা হাতে মল দ্বারে হাত ঢুকিয়ে সম্পূর্ণ গোবর বের করে ফেলতে হবে।
- মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে জরায়ু গ্রীবা খোলা কিনা নিশ্চিত হতে হবে।
- প্রজননের পূর্বে এ.আই গান পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করে গানে সিমেন সঠিকভাবে ভরতে হবে এবং গ্লাভস পরা হাত দিয়ে যোনীমুখ খুলে এ.আইগান প্রজনন অংগে সঠিকভাবে প্রবেশ করাতে হবে।
- এ.আই গান সার্ভিক্সের তিনটি রিং পার হয়েছে অনুভূত হলে পিষ্টনে চাপ দিয়ে সিমেন জরায়ুতে নিক্ষেপ করতে হবে।
- প্রজননের পর প্রজননের তথ্যাবলী এ.আইকার্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সেশন-৫১

দুধ দোহন পদ্ধতি এবং দোহনের বিভিন্ন ধাপ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- দুধ দোহন চেকলিস্ট
- দুধ দোহনের বিভিন্ন ধাপ
- দুধ দোহন পদ্ধতি

প্রকৃতির আদর্শ খাদ্য হচ্ছে দুধ। দুধের সমস্ত অংশই খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয় এবং খাদ্যের সবকয়টি উপাদান দুধে আছে। খাদ্যের সকল উপাদানসমৃদ্ধ দুধ অতীব সুস্বাদু, সহজ পাচ্য, সব বয়সের মানুষের ভারসাম্য-রক্ষাকারী সুষম খাদ্য, স্বল্প ব্যয়বহুল, দোহনের পরই পান করতে বিশেষ কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না, সকল অংশই খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয় এবং দুধ থেকে বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য তৈরি করা যায়।

দুধ দোহন ঃ

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাকে দুধ দোহন বলে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে গাভী থেকে দ্রুত দুধ দোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে গাভী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং উৎপাদন সঠিক থাকে।

দুধ দোহনের বিভিন্ন ধাপ ঃ

সঠিকভাবে দুধ দোহন সম্পন্ন করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়-

দুধ দোহনের সময় ঃ

নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিদিন দু'বার, তিনবার বা চারবার দুধ দোহন করা উচিত। যখন তখন দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন কমে যায়।

দুধ দোহন চেকলিস্ট ঃ

ক. দোহনকারীর প্রস্তুতি।
খ. গাভীর প্রস্তুতি।
গ. দুধ দোহনে ব্যবহৃত তৈজসপত্রের প্রস্তুতি।

ক. দোহনকারীর প্রস্তুতি:

দোহনকারীর শরীর ও হাত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। হাতের নখ ছোট থাকতে হবে। মাথায় কাপড় বা গামছা দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং দোহনকারীর শরীর সুস্থ্য থাকতে হবে।

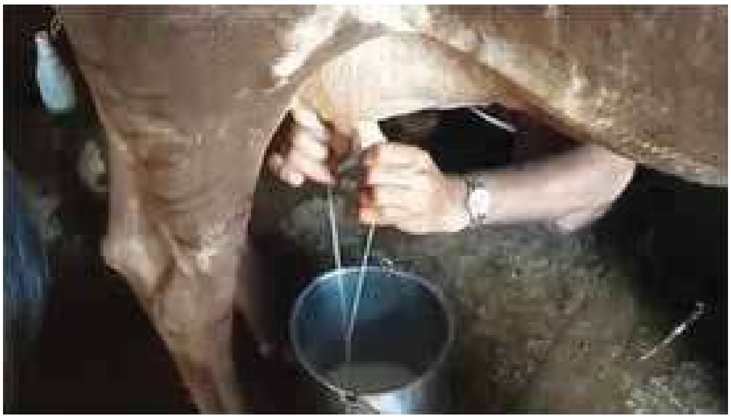

চিত্রঃ দুধ দোহন পদ্ধতি

খ. গাভীর প্রস্তুতি: গাভীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। ওলান বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ধৌত করে নিতে হবে এবং শুকনো পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দুধ দোহন প্রস্তুতি বর্ণনা করা হলো-

↓

১. গাভী এবং দোহনকারীকে প্রস্তুত করা ঃ দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে বিরক্ত করা উচিত নয় অথবা উত্তেজিত করা উচিত নয়। দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান এবং বাঁট অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন অথবা নিমপাতার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে, তোয়ালে বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং নিয়মিত নখ কাটতে হবে। দুধ দোহনের সময় মুখ থেকে থুতু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি দোহনের সময় কথা বলা উচিত নয়।

↓

২. পরিষ্কার তৈজসপত্র ব্যবহার করা ঃ প্রত্যেকবার দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত র‍্যাকে পাত্রগুলো উপুড় করে সাজিয়ে রাখতে হবে।

↓

৩. মশা মাছির আক্রমণ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখা ঃ দোহনের সময় মশা মাছি বা কোনো বিকট শব্দের ফলে গাভী যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

↓

৪. গাভীকে উদ্দীপিত করা ঃ বাছুরের সাহায্যে গাভীর বাঁট চুষে অথবা দোহনকারী কর্তৃক ওলান ম্যাসেজ করে গাভীকে উদ্দীপিত করতে হবে।

↓

৫. দোহনের সময় খাওয়ানো ঃ দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণ দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো ভালো। এতে সহজে দুধ দোহন করা যায়।

↓

৬. দুধ দোহনকালে আশেপাশে শান্ত পরিবেশ থাকতে হবে। অন্য কোন প্রাণি বা মানুষ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

↓

৭. প্রতিদিন একই জায়গায় একই সময়ে দুধ দোহন করা উত্তম।

স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা ঃ

গাভী ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা হয়। দোহনের শুরুতেই প্রতিটি বাট থেকে এক থেকে দুই ফোঁটা দুধ স্ট্রিপ কাপে নেয়া হয়। এতে করে দুধে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তা দোহনকারী বুঝতে পারে এবং পাশাপাশি বাঁটে কোনো ময়লা থাকলে তা বের হয়ে আসে।

দুধ দোহন ক্রম (Milking order) ঃ

কোনো দলে একের অধিক গাভী থাকলে নিচের ক্রম অনুযায়ী দুধ দোহন করা উচিত।

১. ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত বকনা বাছুর (প্রথম)।

২. ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত বয়স্ক গাভী (দ্বিতীয়)।

৩. যে সমস্ত গাভীর পূর্বে ম্যাস্টাইটিস রোগ হয়েছিলো কিন্তু তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ম্যাস্টাইটিস রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি (তৃতীয়)।

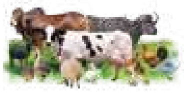

সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা

দুধের পাত্র জীবানুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা

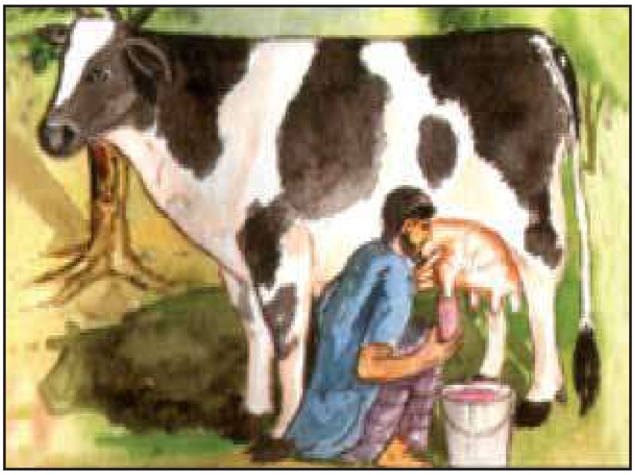

ওলান ও বাট পরিষ্কার করা হচ্ছে

দুধ দোহন শুরু

Teat Disinfection Using Teat Dip

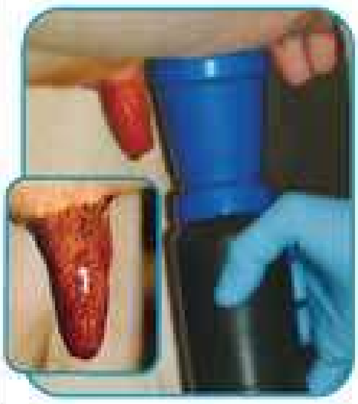

Teat Cleaning Using Disinfectant Solution

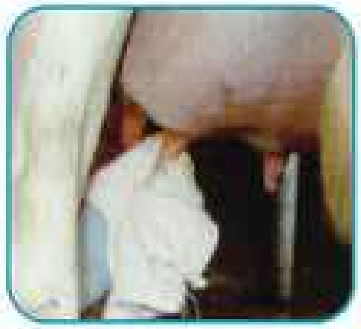

Teat Wiping

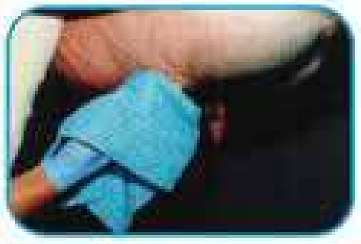

ওলান ও বাট পরিষ্কারের ধাপ

গাভী এবং দোহনকারীকে প্রস্তুত করা (Preparing the cow and milker) ঃ

দোহনকারী ও যে গাভীর দুধ সংগ্রহ করা হবে এদের মধ্যে পারস্পরিক পছন্দ থাকা উচিত। দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে বিরক্ত করা উচিত নয় অথবা মারধোর করা উচিত নয়। দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান এবং বাঁট অ্যান্টিসেপ্‌টিক লোশন অথবা নিমপাতার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে, তোয়ালে বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন নখ কাটতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর যদি কোনো বদভ্যাস যেমন- মুখ থেকে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি দোহনের সময় কথা বলা ইত্যাদি থাকে তাহলে ঐ দোহনকারীকে দিয়ে দুধ দোহন করানো উচিত নয়।

পরিষ্কার তৈজসপত্র ব্যবহার করা (Use of clean utensils) ঃ

দুধ সংগ্রহের জন্য বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা স্টেইনলেস স্টীল বা এ্যালুমিনিয়ামের বালতি ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেকবার দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত র‍্যাকে পাত্রগুলো উপুড় করে সাজিয়ে রাখতে হবে।

মশামাছির আক্রমণ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখা (Keep cows free from flies etc.) ঃ

দোহনের সময় মশা মাছি বা কোনো বিকট শব্দের ফলে গাভী যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গাভীকে উদ্দীপিত করা (Stimulation of cows) ঃ

বাছুরের সাহায্যে গাভীর বাঁট চুষে অথবা দোহনকারী কর্তৃক ওলান ম্যাসেজ করে গাভীকে উদ্দীপিত করতে হবে। দোহন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, দুধ যেনো সম্পূর্ণভাবে দোহন করা হয়।

দোহনের সময় খাওয়ানো (Feeding during milking) ঃ দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণ দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো ভালো। এতে করে গাভী খেতে ব্যস্ত থাকে এবং সহজে দুধ দোহন করা যায়।

স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা (Using strip cup) ঃ গাভী ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা হয়। দোহনের শুরুতেই প্রতিটি বাট থেকে এক থেকে দুই ফোঁটা দুধ স্ট্রিপ কাপে নেয়া হয়। এতে করে দুধে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তা দোহনকারী বুঝতে পারে এবং পাশাপাশি বাঁটে কোনো ময়লা থাকলে তা বের হয়ে আসে।

দুধ দোহন

দুধ দোহন হল দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুধ দোহন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুগ্ধগ্রন্থি হতে দুধ নিঃসরণ করা হয়, যা হাত দ্বারা অথবা মেশিনের সাহায্যে করা যায়।

দুধ দোহন পদ্ধতি (Milking procedure)

দুধ দোহনের দুটো পদ্ধতি রয়েছে

১. হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand milking)
২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine milking)

হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand milking)

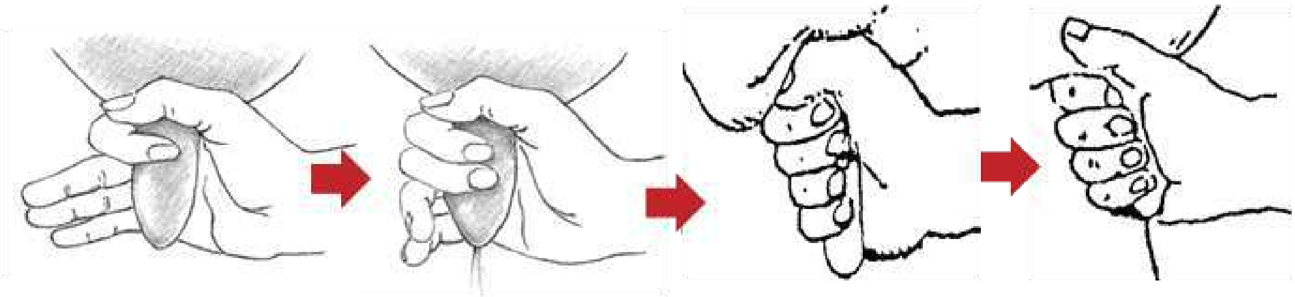

মূলনীতি ঃ হাতের সাহায্যে দুধের বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করলে ওলানের ভিতরের দুধের উপর চাপ পড়ে। যখন চাপ অপসারণ করা হয় তখন ওলানের দুধ বাঁটে চলে আসে। আবার যখন বাঁটে চাপ দেয়া হয় তখন একই সাথে দুধ নিচের পাত্রে জমা হয় এবং ওলানের ভিতরও চাপ পড়ে। এভাবে দুধ দোহন প্রক্রিয়া চলতেথাকে। হাত দ্বারা দুধ দোহন তিনভাবে হতে পারে-

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন
(খ) নোড দ্বারা দোহন
(গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর ওলানের গঠন ভাল এবং এবং বাঁটগুলি পরিমিত আকারের ধরা হয় যাতে ছোট আঙ্গুলের অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। এভাবে বাঁট ধরে বার বার মুঠো খোলা এবং বন্ধের মাধ্যমে দুধদোহন করতে হয়।

(খ) নোড দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট মোটা ও মাংসল, সে সমস্ত গাভী দোহনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্ধভাগ এবং প্রথম আঙ্গুল দ্বারা বাঁটকে এমনভাবে ধরা হয় যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে বাঁটে চাপ প্রয়োগ করা যায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বার বার চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দুধদোহন করতে হয়।

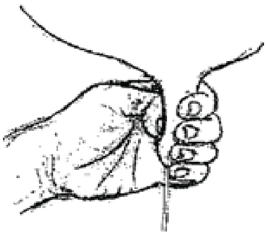

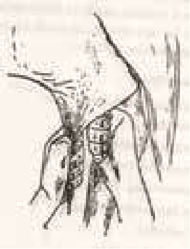

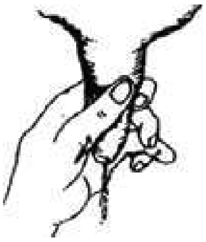

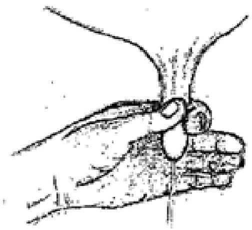

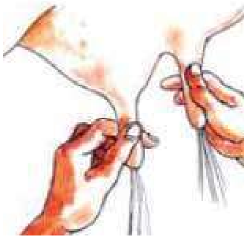

(গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট ছোট, সে সমস্ত গাভী এ পদ্ধতিতে দোহনের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং প্রথম আঙ্গুল এর অগ্রভাগ দিয়ে বাঁট ধরা হয়। দু আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগসহ উপরে-নিচে করে দুধ দোহন করতে হয়।

২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine milking)

সাধারণত বড় বড় খামারে যেখানে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেখানে একসংগে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দুধ দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যন্ত্রেও সাহায্যে খুব সহজে এবং অল্প পরিশ্রমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

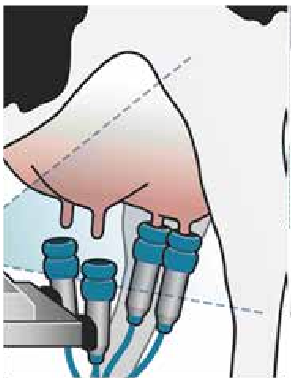

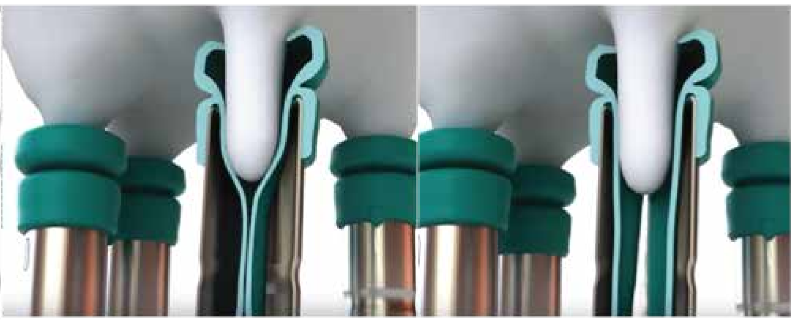

যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন পদ্ধতি ঃ

দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিট কাপ লাগিয়ে দিয়ে দোহন যন্ত্রটি চালু করতে হবে (চিত্র)। ভ্যাকুয়াম পাম্প কর্তৃক সৃষ্ট ভ্যাকুয়াম পালসেটরের মাধ্যমে টিট কাপ শেল ও টিট কাপ লাইনারের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে ওলান থেকে দুধ এসে বাঁটে জমা হয় (চিত্র)। আবার টিট কাপ সেল ও লাইনারের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে স্ফীতির সৃষ্টি করলে বাঁটের উপর চাপ পড়ে এবং বাঁটে রক্ষিত দুধ মিল্ক পাইপ দিয়ে দুধ সংগ্রহ পাত্রে এসে জমা হয় (চিত্র)।

সেশন-৫২

দুধ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে গাভীর পরিচর্যা

সেশন শেষে যা জানা যাবে -

- দুধ উৎপাদন শুরুর পর্যায়ে পরিচর্যা
- দুধ উৎপাদন মধ্যবর্তী পর্যায়ে পরিচর্যা
- দুধ উৎপাদন শেষ পর্যায়ে পরিচর্যা

দুধ উৎপাদন কালের শুরুর পর্যায়ের খাদ্য ঃ দুগ্ধদান কালের ১ম সপ্তাহ হতে পরবর্তী ৭০ দিন বা ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে দুধ উৎপাদনের শুরুর পর্যায়। এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময় গাভীর দুধ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে।

দুধ উৎপাদন কালের শুরুর পর্যায় এর বৈশিষ্ট্য ঃ

- এই পর্যায়ে দুধ উপাদান দ্রুত বাড়তে থাকে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় শুষ্ক পদার্থ গ্রহণের হার সবসময়ই কম থাকে।
- এর ফলে চাহিদার তুলনায় আমিষ এবং শক্তি গ্রহনের পরিমাণ ও কমে যায়।
- প্রয়োজনীয় শক্তির অভাবে গাভীর শরীরের ওজন কমে যাওয়ায় প্রবনতা দেখা দেয়।
- আমিষ ও শক্তি গ্রহনের পরিমাণ যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়, তবে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন নাও পাওয়া যেতে পারে।

পুষ্টির চাহিদা ঃ

- দুধ উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে শতকরা ১৭.৫-১৯.৫ ভাগ আমিষের প্রয়োজন হয়।
- দুধ উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গাভীর খাদ্যে শুষ্ক অংশের ভিত্তিতে শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক ঘাস থাকতে হবে।

দুধ উৎপাদন কালের শুরুর পর্যায়ে গাভীর জন্য সুপারিশকৃত খাদ্য প্রদান পদ্ধতি ঃ

- গুণগত মান সম্পন্ন ঘাস প্রদান করতে হবে। যেমন ঃ পাতা যুক্ত কচি ঘাস, কচি শুঁটি ঘাস এবং উন্নত ধরনের হে অথবা সাইলেজ।
- শুষ্ক পদার্থের চাহিদার কমপক্ষে শতকরা ৪৫ ভাগ সরবারহকৃত ঘাস থেকে মিটাতে হবে।
- দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ১০-২০ দিন পর্যন্ত পর্যন্ত প্রতিদিন ০.৫ কেজি হারে দানাদার খাদ্য বাড়াতে হবে।
- দুধ উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গাভীর জন্য উপযুক্ত দানাদার খাদ্য অথবা সূত্র অনুযায়ী খাদ্য তৈরি করে দিতে হবে।
- সর্বদা পর্যাপ্ত পরিস্কার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ধকল কমাতে হবে। যেমনঃ গরম হতে উদ্ভূত ধকল।

সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনের গুরুত্ব ঃ

- দুধের সর্বোচ্চ উৎপাদন কম হলে মোট দুধ উৎপাদন ও কম হবে।
- সর্বোচ্চ উৎপাদন ১ কেজি বৃদ্ধি পেলে মোট দুধ উৎপাদন প্রায় ২২০ কেজি বেড়ে যায়।

দুধ উৎপাদন কালের মধ্যেবর্তী পর্যায়ের খাদ্য ঃ বাচ্চা প্রসবের পরবর্তী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যবর্তী দুগ্ধদান কালীন সময়টি হচ্ছে দুধ উৎপাদনের মধ্যবর্তী পর্যায়। দুধ উৎপাদনের এই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এ গাভীর শুষ্ক অংশ গ্রহনের পরিমাণ বেড়ে যায়, গাভীর শারিরিক অবস্থা পুনরুদ্ধার হয় এবং পরবর্তী পাল গ্রহণ ও গর্ভধারনের জন্য গাভীকে প্রস্তুত হতে হয়।

দুধ উৎপাদন কালের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

- দুধ উৎপাদনের সর্বোচ্চ পর্যায় শেষ হয়ে দুধ উৎপাদন কমতে শুরু করে।
- শুষ্ক পদার্থ গ্রহণের পরিমান বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে।
- শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে,পাশাপাশি শরীরের অবস্থা পূনরুদ্ধার হয়।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ঃ

- এ পর্যায়ে গাভীর গৃহিত শুষ্ক পদার্থের শতকরা ১৫-১৭ ভাগ অশোধিত প্রয়োজন হয়।
- মোট সরবারহকৃত খাদ্যে ঘাসের পরিমাণ বাড়িয়ে শুষ্ক পদার্থ গ্রহনের শতকরা ৫০ ভাগ ঘাস দ্বার পূরণ করতে হয়।

প্রস্তাবিত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- উন্নতমানের ঘাস জাতীয় খাদ্য প্রদান।
- দিনে বেশ কয়েকবার গাভীকে দানাদার ও ঘাস জাতীয় খাবার সরবারহ ।
- নিশ্চিত হতে হবে যে, গাভীর খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রুড আমিষ এবং ঘাস জাতীয় খাবার আছে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিস্কার পানীয় জল সরবারহ ।
- খাবারে পর্যাপ্ত খনিজ লবন সরবারহ।
- ধকল/চাপ কমিয়ে আনা।

দুধ উৎপাদন কালের শেষ পর্যায়ের খাদ্য ঃ বাচ্চা প্রসবের পরবর্তী ৬ থেকে ১০ মাস দুধ উৎপাদনের শেষ পর্যায়। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ সময় গাভী গর্ভধারণ করে,শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং গাভীর দেহে চর্বি জমে।

দুধ উৎপাদন কালের শেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

- দুধ উৎপাদন কমে আসে।
- গাভীর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- দুধ উৎপাদন কমে আসায় শুষ্ক অংশ এবং পুষ্টির চাহিদা সহজেই পূরণ হয় ।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ঃ

- অশোধিত আমিষের চাহিদা ঃ খাদ্যের শুষ্ক পদার্থের শতকরা ১৪-১৫ ভাগ।
- মোট খাদ্যে ঘাসের পরিমাণ ঃ খাদ্যের শুষ্ক পদার্থের শতকরা ৫৫ ভাগ ।

সুপারিশকৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ভাল মানের ঘাস জাতীয় খাদ্য প্রদান এবং কাঁচা ঘাসের মাধ্যমে কমপক্ষে শতকরা ৫৫ ভাগ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ নিশ্চিন্তকরণ।
- অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, বেশী দানাদার খাবার দিলে দুধ উৎপাদন বাড়ে না বরং গাভীর শরীরে চর্বি জমে,লালন-পালন খরচ বৃদ্ধি পায়, ফলশ্রুতিতে লাভ কমে আসে।
- পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার খাবার পানি সরবারহ।
- পর্যাপ্ত খনিজ লবণ সরবারহ।
- গাভীর ধকল কমিয়ে আনা।

গাভীর শুষ্ক পর্যায়ের খাদ্য ঃ প্রসব পরবর্তী ১০-১২ মাস সময়কাল অথবা পরবর্তী বাচ্চা প্রদানের পূর্বের ৮ সপ্তাহ সময়কালকে শুষ্ক পর্যায় বলে। এ সময় গাভীর দুধ দেয় না। তবে পরবর্তী দুগ্ধদান কালীন সময়ে দুধ প্রদানে প্রস্তুতির জন্য গাভীর পর্যাপ্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়।

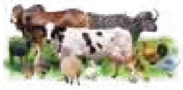

শুষ্ক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

- গাভী দুধ প্রদান করে না।
- এ সময় শুষ্ক গাভীর দৈনিক ওজন অবিরাম ভাবে বাড়তে থাকে।
- শুষ্ক গাভীর খাদ্য গ্রহণ কমতে থাকে।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ঃ

- অশোধিত আমিষের মাত্রা ঃ খাদ্যের শুষ্ক অংশের শতকরা ১২ ভাগ।
- মোট খাদ্যে ঘাসের পরিমাণ ঃ খাদ্যের শুষ্ক অংশের শতকরা ৬০ ভাগ।
- ক্যালসিয়াম ঃ ৬০-৮০ গ্রাম/দিন
- ফসফরাস ঃ ৩০-৪০ গ্রাম/দিন

সুপারিশকৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- শুষ্ক গাভীকে দুগ্ধবতি গাভী থেকে পৃথক করতে হবে।
- গাভী যাতে অতিরিক্ত মেদবহুল না হয়, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- খাদ্যের শুষ্ক অংশের শতকরা ৬০ ভাগ ঘাস জাতীয় খাবার দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সরবারহ করতে হবে।
- খাদ্যে ভিটামিন এ, ডি ও ই সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর পরিবর্তন পর্যায়ে খাদ্য প্রদান ঃ এ পর্যায়ে গাভী পরবর্তী প্রসব এবং দুধ উৎপাদন সময়কাল জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

পরিবর্তন পর্যায়ে বৈশিষ্ট্য ঃ

- গাভী দুধ প্রদান করে না।
- গাভীর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- এ সময় গাভীর খাদ্য গ্রহণ কমতে থাকে।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা/চাহিদা ঃ

- অশোধিত আমিষের মাত্রা ঃ খাদ্যের শুষ্ক অংশের শতকরা ১৪.৫-১৫.০ ভাগ।
- মোট খাদ্য ঘাসের পরিমান ঃ খাদ্যের শুষ্ক অংশের শতকরা ৫৫ ভাগ।
- ক্যালসিয়াম ঃ ৬০-৮০ গ্রাম/দিন
- ফসফরাস ঃ ৩০-৪০ গ্রাম/দিন

সুপারিশকৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- প্রতিদিন ২.৫-৩.০ কেজি পরিমান দানাদার খাদ্য দিতে হবে যাতে রুমেনস্থ জীবানুগুলো নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।

সেশন-৫৩

আদর্শ দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কাজ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- দুগ্ধ খামারে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের সময়সূচি
- দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কাজ

একটি দুগ্ধ খামারে সারা বছর ধরে রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ইপ্সিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব। খামারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ কাজে অংশগ্রহন করা অতীব জরুরী। খামার ব্যবস্থাপক দৈনিক রুটিন মাফিক কাজের তালিকা প্রণয়ন করে দায়িত্ব বন্টন করেবেন এবং কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে কিনা তার তদারকী করবেন। সকল কাজ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় খামারের কর্মচারীরা সম্পাদন করবেন। একটি খামারে নিম্নলিখিত মূলকার্যাদি প্রতিদিন রুটিন মাফিক করা প্রয়োজন।

সময়	**কার্যাবলি**
ভোর ৩.০০-৩.৩০	দুধের ঘর পরিষ্কার এবং দুগ্ধবর্তী গাভী গোসল করানো।
ভোর ৩.৩০-৪.৩০	প্রতিদিন মোট প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের মিশ্রণের অর্ধেক পরিমাণ গাভীকে সরবরাহ করা।
ভোর ৪.৩০-৫.৩০	উৎপাদিত দুধের রেকর্ড রাখা। তরল দুধ ভোক্তাদের মাঝে পিক-আপ ভ্যানের মাধ্যমে বিতরণ এবং পূর্বের খালি দুধের পাত্র সংগ্রহ করা।
সকাল ৫.৩০-৬.৩০	গাভী শুষ্ক গাভীর ঘরে স্থানান্তর করা। উল্লেখ যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারী শ্রমিক এবং গোয়ালা সকাল ৭.০০ ঘটিকা কাজ শেষ করবে। খামারের শ্রমিক এবং এটেডেন্ট সকাল ৭.০০ টায় কাজ শুরু করবে। খামারের শ্রমিকরা ঘাস চাষের জমিতে সকাল ৭.০০ হতে বিকাল ৩.৩০ টা পর্যন্ত কাজ করবে।
সকাল ৭.০০-১১.০০	ব্যায়াম, গাভী গরম হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ এবং সূর্য কিরণ হতে ভিটামিন গ্রহণের লক্ষ্যে গাভীগুলোকে মাঠে চরাতে হবে। সুষ্ঠব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য কার্যাদি যেমন-বাছুরের মার্কিং, শিং ছেদন, প্রতিষেধক টীকা প্রদান, সাইলেজ এবং হে তৈরিকরণ ইত্যাদি এ সময় করতে হবে।
সকাল ১১.০০-১২.০০	গাভীগুলো মাঠ থেকে এনে ঘরে আবদ্ধ করতে হবে। দুগ্ধবতী গাভী ছাড়া সব পশুকে দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। সাথে আঁশ-জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
দুপুর ১২.০০-১.৫০	খামারের শ্রমিকদের জন্য দুপুরের খাবার বিশ্রামের দরকার
দুপুর ১.৩০-২.৩০	এটেনডেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রতিটি পশুকে পর্যবেক্ষণ করবে।

- স্টক আইডেন্টিফিকেশণ
- রুটিন টীকা প্রদান

- দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরিকরণ
- সাইলেজ এবং হে তৈরিকরণ
- উৎপাদিত গোবর সংরক্ষণকরণ
- খামারের যন্ত্রপাতি সংক্ষণকরণ
- বাছুরের শিং ছেদন
- পশু কেনা বেচায় সহায়তাকরণ

বিকাল ২.৩০-৩.৩০	পুনরায় দুগ্ধবর্তী গাভীকে গোসল করানো, দুধের ঘর ধোয়া ও পরিষ্কার করণ।
বিকাল ৩.০০-৪.০০	বাকি অর্ধেক দানাদার খাদ্য দুগ্ধবর্তী গাভীকে সরবরাহ করা এবং দুধ দোহনের কাজ করা
বিকাল ৪.০০-৫.০০	খামারের সব পশুকে আঁশ যুক্ত কাধ্য সরবরাহ করা। পিক আপ ভ্যানের মাধ্যমে উৎপাদিত তরল দুধ ভোক্তাদের নিকটবিতরণ, খীর দুধের পাত্র সংগ্রহ ও এর পরিষ্কার করণ
বিকাল ৫.০০-৫.৩০	খামারে আলো সরবরাহকরণ
বিকাল ৫.৩০ হতে সন্ধ্যা ৬.০০	খামারের সব শ্রমিক এবং গোয়ালতাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। দুগ্ধবর্তী গাভী ছাড়া অন্যান্য পশু নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ করা এবং আঁশ যুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা।

সন্ধ্যা ৬.০০ হতে নৈশ প্রহরিদের দায়িত্ব শুরু হবে। খামার ব্যবস্থাপককে খামার ত্যাগ করার পূর্বে নৈশ প্রহরীদের সম্ভাব্য বাচ্চা প্রসবকারী গাভী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া ক্যাশবাক্সে কি পরিমাণ অর্থ রয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে। খামার ব্যবস্থাপকের রাতে খামারে আসার পরিকল্পনা থাকেল অবশ্যই নৈশ প্রহরীদের অবহিত করে তাদের সম্মতিক্রমে খামারে প্রবেশ করতে হবে।

সেশন ৫৪

দশটি গাভীর খামার প্রকল্পে আয়-ব্যয়ের নমুনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য
- প্রয়োজনীয় মূলধন
- বাৎসরিক আবর্তক খরচ
- বার্ষিক আয়
- বার্ষিক নীট মুনাফা
- খামারের নথি সংরক্ষণ

প্রকল্প প্রণয়ন

১. প্রকল্পের নাম ঃ ট্রাস্ট দুগ্ধ খামার

২. উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা ঃ ডা: মোঃ জহিরুল ইসলাম, বি.কে. বাড়ী, গাজীপুর

৩. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

ক। আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
খ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উদ্যোক্তা তৈরি।
গ। দুধ, মাংস, ডিম এবং বাছুর উৎপাদন।
ঘ। পারিবারিকভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব জ্বালানি ব্যবহার।
ঙ। বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব খামারের চাহিদা পূরণ।

৪. প্রকল্পের মালিকানা ঃ ট্রাস্ট।

৫. অবকাঠামোগত অবস্থান ঃ ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ উঁচু জায়গা ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়।

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ঃ পাঁচ বছর।

৭. প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ ঃ নিজ

৮. দশটি গাভীর খামার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি-পশুর ধরণ, সংখ্যা, এদের দৈহিক ওজন এবং দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন।

প্রাণির ধরণ (গাভীর/বাছুর)	প্রাণির সংখ্যা	গড় দৈহিক ওজন (কেজি)	দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন (লিটার)
দুধালো গাভী	১০	৩০০	১৫×১০=১৫০ লিটার।
বাছুর	১০	৪৫	---

ক. প্রয়োজনীয় গৃহায়ন ঃ প্রতিটি দুধালো গাভীর জন্য ৫০ বর্গফুট হিসেবে ১০ টি গাভীর জন্য (১০×৫০ = ৫০০) ৫০০ বর্গফুট ঘরের প্রয়োজন। খাবার পাত্র, পানির পাত্র এবং ইটের মেঝে, তারজালি, গ্রিল-এর বেড়া সহ দু-চালা টিনের ঘর নির্মাণে প্রতি বর্গফুট ২০০ টাকা হিসাবে ৫০০ বর্গফুট ঘর তৈরি বাবদ ১,০০,০০০ টাকা প্রয়োজন। বাছুরের জন্য ৩০ বর্গফুট মোট ৩০০ বর্গফুট । খরচ= ২০০×৩০০ = ৬০,০০০ টাকা

খ. খামার ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামাদি সহ বিবিধ মোট খরচ ৫০,০০০ টাকা।

গ. বাছুরসহ ১০ টি সংকর জাতের গাভী যার প্রতিটি মূল্য ১,৯০,০০০ টাকা যার মোট খরচ ১৯,০০,০০০ টাকা।

মোট মূলধন = (১,০০,০০০+৬০,০০০+৫০,০০০+১৯,০০,০০০) টাকা
=২১,১০,০০০ টাকা

৯. বাৎসরিক আবর্তক খরচ ঃ

ক. খাদ্য খরচ ঃ গরুর ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য ওজনের শতকরা ৫ ভাগ সরস আঁশ জাতীয় (কাঁচা ঘাস), শতকরা ১ ভাগ শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (খড়) ও শতকরা ১ ভাগ দানাদার জাতীয় খাদ্য দরকার হয়। উপরোক্ত, দৈনিক ১৫ লিটার দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভীর অতিরিক্ত ১ কেজি দানাদার খাদ্যের দরকার। সেই মোতাবেক দশটি গাভীর খামারী বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খরচ উল্লেখ করা হল-

খাদ্যের ধরণ	বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা(কেজি)			প্রতি কেজির মূল্য (টাকা)	বার্ষিক খরচ (টাকা)
	দুধালো গাভী	বাছুর	মোট		
সরস আঁশ জাতীয় খাদ্য	৫৪,৭৫০	৯,১২৫	৬৩,৮৭৫	১.০০	৬৩,৮৭৫
শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য	১০,৯৫০	১,৮২৫	১২,৭৭৫	২.৫০	৩১,৯৩৮
দানাদার খাদ্য	১০,৯৫০	১,৮২৫	১২,৭৭৫	২০.০০	২,৫৫,৫০০

সর্বমোট = (৬৩,৮৭৫+৩১,৯৩৮+২,৫৫,৫০০) = ৩,৫১,৩১৩ টাকা

খ. খামার ব্যবস্থাপনায় বিবিধ সরবরাহসহ স্বাস্থ্যবিধি ও প্রজনন কাজে বার্ষিক সর্বমোট খরচ=৫০,০০০ টাকা

গ. ঘাসচাষ বাবদ খরচ ঃ ১ বিঘা জমিতে জারা-১ ঘাস এবং ১ বিঘা জমিতে ভূট্টা চাষ বাবদ মোট দুই বিঘা জমিতে বার্ষিক খরচ (জমি তৈরি+ বীজ/কাটিং+সার+ লেবার+পানি) = ২,০০,০০০ টাকা।

বার্ষিক ঘাস উৎপাদন নূন্যতম ১০০ টন।

বার্ষিক মোট আবর্তক খরচ = (৩,৫১,৩১৩ + ৫০,০০০) = ৪,০১,৩১৩ টাকা।

১০ টি গাভীর মোট খরচ = মোট মূলধন + বার্ষিক মোট আবর্তক খরচ

= (২১,১০,০০০ + ৪,০১,৩১৩+২,০০,০০০) = ২৭,১১,৩১৩ টাকা

১০. বাৎসরিক আয় ঃ

ক. দুধ বিক্রি ঃ প্রতিটি গাভীতে দৈনিক গড়ে ১৫ লিটার দুধ উৎপাদন করলে ৩০০ দিনে ১০ টি হতে (৩০০দ্ধ১০দ্ধ১৫) = ৪৫০০০০ লিটার, প্রতি লিটার ৬০ টাকা হিসেবে মোট বাৎসরিক আয় (৪৫০০০০×৬০) = ২৭,০০,০০০ টাকা।

খ. গোবর বিক্রি ঃ প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজন ৬ কেজি গোবর উৎপন্ন করলে খামারের (৩৬৫×৬×৩×১০) = ৬৫,৭০০ কেজি দৈনিক ওজন বাৎসরিক প্রায় ৬৫.০০ টন গোবর উৎপন্ন করবে। গোবর ১,০০০ টাকা টন হিসেবে বাৎসরিক মোট আয় ৬৫,০০০ টাকা।

গ. ১০ টি সংকর জাতের বাছুর ১ বছর পর প্রতিটির মূল্য নূন্যতম ৫০,০০০ টাকা হিসেবে (১০×৫০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা।

ঘ. বায়োগ্যাস থেকে আয়ঃ ৪টি সিঙ্গেল বার্নার চুলা হতে (৪×১০০০×১২) = ৪৮,০০০ টাকা।

দুগ্ধ খামার হতে বার্ষিক আয় = দুধ বিক্রি + গোবর বিক্রি + বাছুর বিক্রি+ বায়োগ্যাসের মূল্য

= (২৭,০০,০০০ + ৬৫,০০০ + ৫,০০,০০০+৪৮,০০০) = ৩৩, ১৩,০০০ টাকা।

বাৎসরিক মোট মুনাফা = বার্ষিক মোট আয় - দশটি গাভীর মোট খরচ

= (৩৩,১৩,০০০ - ২৭,১১,৩১৩) = ৬,০১,৬৮৭ টাকা।

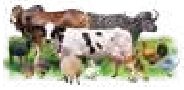

গবাদিপশুর খামারে নথি সংরক্ষণ ঃ

সংক্ষিপ্ত, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিমার্জিত ও সুন্দরভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করাকে নথি সংরক্ষণ বলা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায় নথি সংরক্ষণ করা হয় এবং দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য উৎপাদক খামারও ব্যতিক্রমধর্মী নয়। নথি সংরক্ষণ একটি হালকা বা টুকিটাকি বিষয় হতে পারে। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যবস্থাপনায় কোথায় অসুবিধা বা গলদ, কোন খাতে অপব্যয় হচ্ছে, কোন পদ্ধতি ব্যয় সাপেক্ষ প্রভৃতি জানা সম্ভব হয় না, যদি সঠিক নথি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকে। নিম্নলিখিত নথিগুলো খামারের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন-

১. প্রাণিসম্পদ নথি ঃ ডেইরি খামারে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা, জাতের বিবরণ, বয়স এবং এদের পুরো ইতিহাস জানার জন্য নথি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ নথি পুরোপুরি ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে খামার পরিচালনা করা ব্যবস্থাপকের পক্ষে সহজতর ও ভবিষ্যত প্রাক্কলন তৈরিতেও সহায়ক।

২. প্রজনন নথি ঃ গবাদিপশুর খামারের জন্য প্রজনন নথি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ একটি গাভীর সারা জীবনের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে এর বাচ্চা দানের সংখ্যার উপর, আর বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা নির্ভর করে উপযুক্ত লালন পালন ও সঠিক প্রজনন তথ্যের উপর। এছাড়া প্রজনন নথিতে কোন জাতের ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়া হয়েছে, পাল দেওয়া ব্যক্তির নাম ও তারিখ উল্লেখ থাকে।

৩. বাচ্চা নথি ঃ বাচ্চার জন্ম তারিখ, শারিরীক অবস্থা, লিঙ্গ, জন্ম ওজন, গাভী ও ষাঁড়ের কানের নম্বর এবং চিহ্নিত করণ নম্বর সবকিছুই এ নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪. দুগ্ধ নথি ঃ গাভীর দৈনন্দিন দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সঠিকভাবে জানার জন্য দুগ্ধ নথি সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ খামারের আয় ব্যয়, উন্নতি-অবনতি প্রধানত নির্ভর করে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনের উপর, গড় দুধ উৎপাদনের উপর নয়।

৫. দুধের বিতরণ নথি ঃ খামারে উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য গ্রাহকদের নিকট বিশ্বস্ততার সহিত পৌঁছে দেয়া ও দ্রব্যের আয়-ব্যয়ের সঠিক ইঙ্গিত এ নথি হতে পাওয়া যায়।

৬. অর্থনৈতিক নথি ঃ একটি গাভীর জন্য মাসিক খাদ্য খরচ কত এবং দুধ হতে কত পাওয়া যাবে তা এ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে।

৭. খাদ্য নথি ঃ বছরের বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহীত খাদ্য সামগ্রীর সঠিক পরিমাণ ও মূল্য এবং দৈনিক পশু যে খাদ্য খায় তার প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিমাণ খাদ্য নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়া দানা খাদ্যের মিশ্রণ ও আঁশযুক্ত খাদ্য গো-খাদ্যের পরিমাণ যা খাওয়ানো হয় তাও নথিতে রাখা হয়।

৮. স্বাস্থ্য নথি ঃ রোগে বা অন্য কোন কারণে খামারের পশু মারা গেলে বা পশু বিক্রয় করলে এই নথিতে লিপিবদ্ধ রাখা হয়।

৯. শ্রমিক হাজিরা নথি ঃ খামারের শ্রমিকদের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও ছুটির পূর্ণ বিবরণ এই নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১০. জৈব সার সংরক্ষণ নথি ঃ খামারে জমাকৃত মল মূত্রের পরিমাণ, মল মূত্রের বিক্রয়কৃত আয় এ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে।

১১. অন্যান্য নথি ঃ আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নথি, গবাদিপশু জবেহ নথি, আনুষাঙ্গিক মজুদ বহি, কৃষি যন্ত্রপাতি নথি, বীজ মজুদ নথি, ওভারসিয়ার ডায়রি, চিঠিপত্র আদান প্রদান নথি ইত্যাদি।

সেশন-৫৫

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ সম্পর্কে ধারণা
- ➢ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্য
- ➢ প্রাণির দৈহিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতি
- ➢ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের সুবিধা।
- ➢ হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরুর জাত বাছাই ও বৈশিষ্ট্যাবলী
- ➢ হৃষ্টপুষ্টকরণে খাদ্য তালিকা
- ➢ নির্বাচিত পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৃমিমুক্তকরণ, বিভিন্ন রোগের বিরূদ্ধে প্রতিষেধক টিকা প্রদান

গরু হৃষ্টপুষ্ট করণ কি?

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বলতে কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্যহীন গরু বা বাড়ন্ত গরুকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় উন্নত সুষম খাবার সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান গরু তৈরী করে বাজারজাত করাকে বুঝায়।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্য ঃ

- দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ।
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য চামড়া শিল্পের সমৃদ্ধি।
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা ও বেকার সমস্যার সমাধান করা।
- জৈব সার সহজলভ্য করা।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোবর থেকে গ্যাস আহরণ করে ব্যবহার করা।
- কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক জনগণকে এ কাজে উৎসাহিত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।

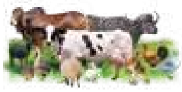

প্রাণির দৈহিক ওজন রেকর্ডকরণ ঃ

এই প্রকল্পে প্রাণির ওজন নিয়মিত রেকর্ড করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্প চালুর শুরুতে ক্রয়কৃত সবগুলো প্রাণির ওজন পৃথক পৃথক ভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং ১৫ দিন পর পর প্রতিটি প্রাণির ওজন খাবার সরবরাহের সংগে বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা যায়। তাতে পালনের অগ্রগতি বুঝা যায়। প্রাণির প্রকৃত ওজন নির্ণয় করার জন্য ব্যাল্যান্স ব্যবহার করাই উত্তম। তবে সহজ ১টি ফর্মুলাতে প্রাণির ওজন বের করা যায়। প্রাণির সঠিক ওজনের কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যায়। ক্লথ টেপের সাহায্যে প্রাণির দৈর্ঘ্য ও বুকের মাপ নেওয়া হয়।

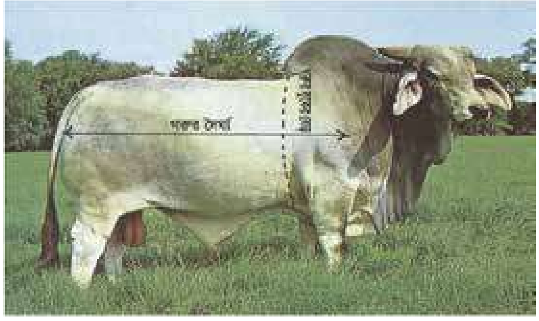

গরুর ওজন নির্ণয়ের জন্য দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় মাপার পদ্ধতি

$$\text{প্রাণির দৈহিক ওজন (কেজি)} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)Xবুকের বেড় (ইঞ্চি)Xবুকের বেড় (ইঞ্চি)}}{\text{৬৬০}}$$

প্রাণি নির্বাচন ঃ

উপযুক্ত জাত ও ধরণ অনুসারে প্রাণি নির্বাচন এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ক) প্রাণির বয়স ঃ হৃষ্টপুষ্টকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং কর্মসূচির জন্য সাধারণত ২-৩ বছরের সংকর জাতের ষাঁড় গরু নির্বাচন করা উচিত কারণ এ বয়সে গরুর বৃদ্ধির হার অন্যান্য বয়সের তুলনায় বেশি হওয়ায় হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে এ ধরণের বয়সের প্রাণি নির্বাচন করতে হয়।

হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য জাত বাছাই ঃ

প্রাণি নির্বাচনে গরুর জাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিফ ফ্যাটেনিং এর জন্য আমাদের দেশে মাংসল কোন পৃথক গরুর জাত নেই তাই সংকর জাতের গরু নির্বাচন করা হয়। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য উন্নত দেশে মাংসল জাত ব্যবহার হয়। উন্নত দেশে বিভিন্ন ধরণের মাংসের জন্য পৃথক জাতগুলো হলো- ব্রাহমা, অ্যাবার্ডিন, অ্যাঙ্গাস, বীফ মাষ্টার ও হেরিফোর্ড, ডেভন, লিমুজিন ইত্যাদি। সম্প্রতি দেশে ব্রাহমা জাতের ষাঁড়ের বীজ আমদানি করে আমাদের দেশি গরুর সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম এমন গরু উৎপাদন করা হচ্ছে।

শাহীওয়াল গরু

যেহেতু আমাদের দেশে মাংসের জন্য পৃথক কোন জাত নাই সুতরাং দেশে প্রাপ্ত গরুর বাছুর বা সংকর জাতের গরু বিশেষভাবে মুল্যায়ন (প্রতিটি গরুর উৎপাদনশীলতা) করে যাচাই-বাছাই করা উচিত। গরু হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য দেশি জাতের ষাঁড়, শাহীওয়াল সংকর ও ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের ষাঁড় ক্রয় করা বাঞ্ছনীয়। গবাদিপশু ক্রয় করার সময় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে সতর্কতার সাথে প্রাণি নির্বাচন করতে হবে।

ফ্রিজিয়ান সংকর গরু

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

- ভাল বংশের প্রাণি (প্রাণিটির বংশ পরিচয় ভাল করে জেনে নিতে হবে)
- মাথা ও গলা খাটো এবং চওড়া হতে হবে ● কপাল প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক
- গায়ের চামড়া ঢিলে হবে ● কাঁধ খুব পুরু ও মসৃণ ● পিঠ চ্যাপ্টা, অনেকটা সমতল
- কোমরের দুই পার্শ্ব প্রশস্থ ও পুরু

গরু ক্রয়ের উৎস ঃ গরু ক্রয়ের উৎস আগে থেকে ঠিক করতে হবে। যেমন- কোন খামার থেকে সংকর জাতের শুধু ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্থানীয় কোন বাজার থেকেও দেশি বা সংকর জাতের ষাঁড় গরু ক্রয় করা যেতে পারে। গরু ক্রয়ের পর পরিবহণ একটি সমস্যা হতে পারে। দুই-তিন কিলোমিটার পথ হলে গরুকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে দূরের পথ হলে অবশ্যই পরিবহণ ব্যবহার করতে হবে এবং সে খরচ পোষাতে হলে গরুর সংখ্যা বেশি হতে হবে। গরুকে বেশি হাঁটিয়ে নিলে যে পরিশ্রম হবে তা কাটিয়ে উঠতে সময় নিবে এবং খরচও বেশি হবে।

নির্বাচিত পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৃমিনাশকরণ

- গরু রোগে আক্রান্ত কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- গোবর পরীক্ষা করে গরুকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কৃমিমুক্ত করতে হবে। কারণ আমাদের দেশের প্রায় ১০০% প্রাণি কৃমিতে আক্রান্ত হয় এ জন্য প্রাণি ক্রয় করার পর অবশ্যই কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
- ৪ মাস পর পর পুনরায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- বুক প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে হবে। শরীরে হাড়ের আকার মোটা হতে হবে।
- সামনে পা দুইটি খাটো ও শক্ত সামর্থ হতে হবে।
- শিং খাটো ও মোটা হওয়া বাঞ্চনীয়। লেজ খাটো হতে হবে।
- এঁড়ে/বলদ গরু হওয়া বাঞ্চনীয়।
- স্বাভাবিক ভাবে প্রাণিটি শারিরীক রোগ- ক্রুটি মুক্ত হতে হবে।

প্রতিষেধক টিকা প্রদান ঃ

গরুকে কোন টিকা দেয়া না থাকলে ক্রয় করার ৭ দিন পর থেকে বিভিন্ন ধরণের টিকা ১৫ দিন পর পর দিতে হবে। যে সব টিকা প্রাণিকে প্রয়োগ করতে হয় যেমন- তড়কা, ক্ষুরা, বাদলা, গলাফুলা ইত্যাদি। প্রকল্পের গরুকে কমপক্ষে ২টি টিকা অবশ্যই দেয়া উচিত। একটি হল তড়কা রোগ ও অপরটি হলো ক্ষুরা রোগের টিকা।

উল্লেখিত দুইটি টিকা প্রয়োগ করলে হৃষ্টপুষ্টকরণের গরু সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তবে সুযোগ থাকলে বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকাও প্রয়োগ করতে হবে।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরনের জন্য সুষম খাদ্যের তালিকা ঃ

খাদ্য উপাদান	**পরিমাণ**
গমের ভূষি	১৭%
চাউলের কুড়া (তুষ ছাড়া)	১৫%
তিলের/সরিষার খৈল	২৫%
গম/ভুট্টা ভাংগা	১০%
কলাই বা ছোলা ভাংগা	২০%
ডিসিপি	০.০২%
লবণ	০.০২৫%
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.০০৫ %
মোট	১০০%

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গবাদিপশুকে প্রতিদিন নিম্নবর্ণিত হারে খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

পশুর ওজন	খাদ্যের নাম ও সরবরাহের পরিমান		
	ইউএমএস বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়	**দানাদার খাদ্য সুষম**	**সবুজ ঘাস**
১০০ কেজির কম	২ কেজি	২.৫-৩ কেজি	৪-৫ কেজি
১০০-১৫০ কেজি	৩ কেজি	৩.০-৩.৫ কেজি	৭-৮ কেজি
১৫০-২০০ কেজি এবং তদুর্দ্ধ	৪ কেজি	৪.০-৪.৫ কেজি	৮-১২ কেজি

সেশন-৫৬

ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ পরিকল্পনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গরু বাজারজাতকরণ
- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ

গরু বাজারজাতকরণ ঃ

অধিক লাভে গরু বিক্রয় হৃষ্টপুষ্টকরণের একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে নচেৎ প্রাণির প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না। ফলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে না। তাই যে অঞ্চলে হাট বাজারে বেশী দাম পাওয়া যায় সেই সব হাটে গরু গুলোকে বিক্রয় করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের ঈদুল আজহার মৌসুমে বিক্রয় করলে এসব গরুর দাম বেশী পাওয়া যায়। এছাড়া মাংসের জন্য এসব গরুর চাহিদা আমাদের দেশে সব অঞ্চলে আছে তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এড়েঁ বা বলদ গরুর চাহিদা ব্যাপক। তাই ঢাকা বা চট্টগ্রামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ঐ অঞ্চলের গরুর ব্যবসায়ী বা কসাইদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পে তাদেরকে ডেকে এনে বিক্রয় করলে অধিক মুনাফা পাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব (৫টি গরু)ঃ

১।	স্থায়ী বিনিয়োগ	একক মূল্য /পরিমাণ		আনুমানিক ব্যয় (টাকা)
	জমির উন্নয়ন (২৫´ ×১১´) বর্গফুট	@১৬/ প্রতি বর্গফুট		৫,০০০/-
	গরুর ঘর ৩০০ বর্গফুট	@২০০/ প্রতি বর্গফুট		৬০,০০০/-
	যন্ত্রপাতি	প্রয়োজনমত		৫,০০০/-
	অন্যান্য খরচ			৫,০০০/-
	মোট	---		৭৫,০০০/-
২।	উৎপাদন খরচ (প্রতি ব্যাচে)			
	গরু ৫টি	@ ৫০০০০/=প্রতিটি		২,৫০,০০০ /-
	খাদ্য খরচ- ১২০ দিনের জন্য	প্রতিগরুর ১০০/= হারে		৬০,০০০/-
	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা	@ ৪০০/=প্রতি গরু		২,০০০/-
	অন্যান্য ব্যয় অপচয় (যন্ত্রপাতি ও ঘরের)	@ ১০%		৩০০০/-
	প্রতি ব্যাচে উৎপাদন ব্যয়	---		৩১৫০০০/-
৩।	বার্ষিক উৎপাদন ব্যয় ৩টি ব্যাচে	৩১৫০০০×৩		৯,৪৫,০০০/-
৪।	সম্ভাব্য আয়			
	গরু বিক্রয় (১৫ টি) -	@ ৮০,০০০/-		১২,০০০০/-
	গোবর (১০০০০ কেজি)	@ ১.৫/- প্রতি কেজি		১৫,০০০/-
৫।	বার্ষিক আয়	---		১২,১৫,০০০/-
৬।	নীট মুনাফা (১২, ১৫০০০/- - ৯৪৫০০০/-)			২,৭০,০০০/-

সেশন-৫৭

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (UMS) তৈরী পদ্ধতি ও সংরক্ষণ (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ইউএমএস তৈরীর উপাদান ও উপকরণ ব্যবহার
- ইউএমএস তৈরী এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি

এই সেশনে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ইউএমএস তৈরীর উপকরণ সংগ্রহ করে ইউএমএস তৈরীর পদ্ধতি হাতে কলমে শিখাবেন।

ইউএমএস তৈরীর উপাদান ঃ ১) শুকনো খড় ২) চিটাগুড় (মোলাসেস) ৩) ইউরিয়া ৪) পরিষ্কার পানি

ইউএমএস তৈরীর উপকরণ ঃ ১) বালতি ২) মোটাপলিথিন পেপার ৩) ব্যালান্স ৪) ঝরনা ৫) কাস্তে ৬) মগ

উপাদানের পরিমাণ ঃ

ইউএমএস তৈরীতে উপাদান গুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে। ১০০ ভাগ ইউএমএস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেসএবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। সহজ ভাষায় যতটুকু খড় মিশ্রিত করা হবে তার অর্ধেক পরিমাণ পানি, পানির অর্ধেক পরিমাণ মোলাসেস/চিটাগুড় এবং প্রতি কেজি খড়ের জন্য ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নিতে হবে।

১০ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি, ২.৫ কেজি মোলাসেস এবং ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া লাগবে।

ইউএমএস তৈরীর পদ্ধতি ঃ

প্রথমে শুকনো খড়গুলি ৪ ইঞ্চি করে ১০ কেজি পরিমাণ কেটে নিতে হবে। টুকরো খড়, চিটাগুড় (মোলাসেস) ও ইউরিয়া পরিমাণমত মেপে নিতে হবে। ২.৫কেজি মোলাসেস ও ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া বালতিতে ৫ কেজি পরিস্কার পানিতে মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে। এরপর পরিষ্কার স্থানে বা পাকা মেঝেতে একটি পলিথিন পেপার বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিনের উপর অর্দ্ধেক পরিমাণ টুকরো খড়গুলি সমভাবে বিছিয়ে নিতে হবে। খড় বিছানোর পর অর্দ্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি ঝরনায় নিয়ে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়গুলিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড়ে দ্রবণটি ভালোভাবে মিশেযায়। এরপর বাকিখড় গুলি এর উপর সমভাবে সাজাতে হবে এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ ঝরনায় নিয়ে একইভাবে খড়ের উপর ভালভাবে ছিটাতে হবে। খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলে ইউ এমএস তৈরী হয়ে যাবে এবং গবাদিপশুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে। ইউএমএস তৈরীর পর দ্রবণ মিশ্রিত খড় হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে ফেলে দিলে হাতের তালুতে মিশ্রণ শুকনোভাবে লেগে থাকলে বুঝতে হবে ইউএমএস সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে। আর যদি মিশ্রণটি ভিজাভাবে তালুতে লেগে থাকে এবং গড়িয়ে পরে তখন বুঝতে হবে ইউএমএস সঠিকভাবে তৈরী হয়নি।

সংরক্ষণ ঃ

ইউএমএস তৈরী করে সাথে সাথে খাওয়ানো যায় বা পলিথিনে মুড়ে ৩দিন পর্যন্ত শুষ্ক স্থানে রেখে প্রতিদিন খাওয়ানো যায়।

সাবধানতা ঃ পরিমাণের অতিরিক্ত ইউরিয়া মেশানোযাবেনা। পরিমাণের বেশী খাওয়ানো যাবেনা। ৩ দিনের বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না।

ইউএমএস খাওয়ানোর সুবিধা ঃ

- ইউএমএস তৈরী পদ্ধতি সহজঃ একজন শ্রমিক অনায়াসে দৈনিক ৫০০-৬০০ কেজি খড় এইভাবে তৈরী করতে পারেন।
- সকল বয়সের গরু ও মহিষ যথেষ্ট পরিমাণ এ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে এ খাদ্য সাফল্য জনকভাবে ব্যবহার করা যায়।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারে।

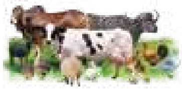

সেশন-৫৮

মহিষ পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ মহিষ পালনের সুবিধা
- ➢ মহিষের জাত পরিচিতি
- ➢ মহিষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মহিষ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাণি হিসেবে পরিচিত। গরুর সাথে মহিষের তুলনা করে দেখা যায় মহিষ পালন অতি লাভজনক। মহিষের দুধে ফ্যাট পারসেনটিজ (%) বেশি থাকে। কৃষি কাজ এবং গাড়ি টানার জন্য মহিষ বেশি ব্যবহৃত হয়।

মহিষ পালনের সুবিধা ঃ

- ☐ মহিষ সব পরিবেশে বসবাস করতে পারে। সমতল ভূমি, জলাভূমি, মরুভূমি সব স্থানেই মহিষ পালন করা যায়।
- ☐ মহিষ নিম্নমানের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। গরুর তুলনায় মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
- ☐ মহিষ সারা বছর খোলা আকাশের নিচে থাকতে পারে।
- ☐ মহিষে দুধে গরুর দুধের তুলনায় ফ্যাট, প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম বেশি থাকে।
- ☐ দুধে টোটাল সলিড এর পরিমাণ বেশি থাকার কারণে দই, পনির, ঘি, মাখন তৈরিতে লাভ বেশি হয়।
- ☐ মহিষের মাংসে ফ্যাটের পরিমাণ কম এবং সুস্বাদু ।

মহিষের জাত পরিচিতি ঃ

মহিষের জাত পরিচিতি নিচে আলোচনা করা হলো-

ক) জলা ভূমির মহিষ খ) নদীর মহিষ গ) উন্নতজাতের মহিষ।

জলাভূমির মহিষ ঃ

জলাভূমির মহিষের গায়ের রং গাঢ় ধূসর বা কালো রঙের হয়ে থাকে। কোন কোন দেশে সাদা রঙের জলাভূমির মহিষ দেখা যায়।

- ✓ শিং বেশ চওড়া ও লম্বা হয়।
- ✓ পেট বড়, কপাল চ্যাপ্টা ও চোখ স্পষ্ট এবং মুখমন্ডল ছোট ও প্রশস্ত হয়।
- ✓ সাধারণত ভূমি কর্ষণ, গাড়ি টানার কাজে এরা ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এদের কোন নির্দিষ্ট জাত নেই।
- ✓ এদের ওজন ৪০০-৫০০ কেজি হয়।

জলাভূমির মহিষ

নদীর মহিষ ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✓ এদের গায়ের রং সাধারণত কালো বর্ণের হয়।
- ✓ দেহের আকার অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতির হয়।
- ✓ প্রধানত দুধ উৎপাদনের জন্য এরা ব্যবহৃত হয়।

নদীর মহিষের উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছে ঃ

১. নীলি-রাভী ঃ

- ✓ পাকিস্তানের শাহীওয়াল জেলায় এজাতের উৎপত্তি।
- ✓ এদের গায়ের রং কালো, তবে কপালে এবং মুখে সাদা দাগ থাকে।
- ✓ দুগ্ধ উৎপাদন ২০০০-২২০০ লিটার পর্যন্ত হয়।

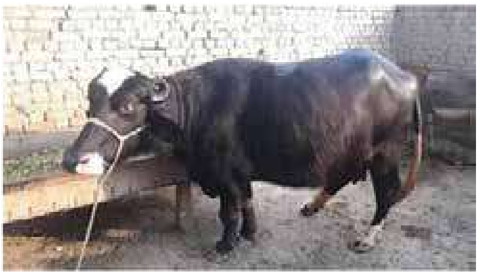

নীলি-রাভী জাতের মহিষ

২. মুররাহঃ

- ✓ ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লীতে এদের উৎপত্তিস্থল।
- ✓ অধিক দুধ উৎপাদনকারী জাত হিসেবে এরা পরিচিত।
- ✓ দুধে চর্বির পরিমাণ ৭% ।
- ✓ গড় দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ লিটার।

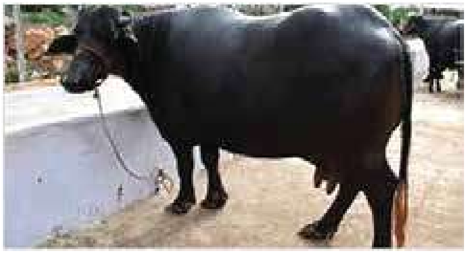
মুররাহ জাতের মহিষ

মহিষের বাসস্থান ঃ গরুর তুলনায় কম খরচে মহিষের বাসস্থান নির্মান করা যায়। মহিষ সাধারণত ছায়ায় এবং পানিতে থাকতে পছন্দ করে।পারিবারিকভাবে অল্পসংখ্যক মহিষ পালনের ক্ষেত্রে ছায়াযুক্ত স্থানে ছাউনি করে মহিষ রাখা যায়। মহিষের সংখ্যা বেশী হলে পাকা ঘর করে মহিষ পালন করতে হবে। ঘরগুলি স্বাস্থ্যসম্মত, খোলামেলা, আলো বাতাস চলাচল এবং ড্রেনেজের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। নিম্নে ৩ ধরনের বাসস্থানের নমুনা দেখানো হলো।

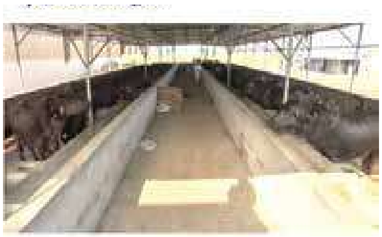
১. ইন্টেনসিভ পদ্ধতি

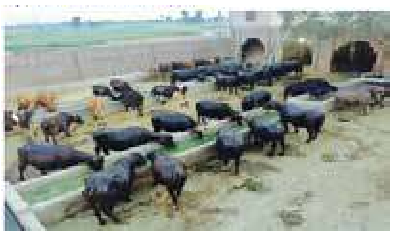
২. সেমি- ইন্টেনসিভ পদ্ধতি

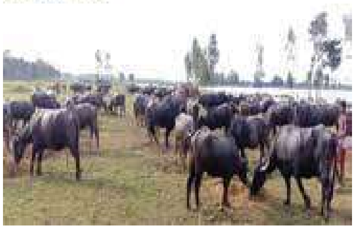
৩. বাথান পদ্ধতি

মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

মহিষের দানাদার খাবারের মিশ্রণঃ

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ
১	ভূট্টা ভাঙ্গা	৫০ কেজি
২	গমের ভূসি	১০ কেজি
৩	সরিষা/তিলের খৈল	২৭ কেজি
৪	সয়ামিল	১০ কেজি
৫	ডিসিপি	২ কেজি
৬	লবণ	১ কেজি

মহিষের খাদ্য সরবরাহ

পশুর বিবরণ		খাদ্যের নাম		
		প্রক্রিয়াজাত খড়	সুষম দানাদার খাদ্য	সবুজ ঘাস
ষাঁড় বা বলদ মহিষের খাদ্য- ২০০ কেজি এবং তদুর্দ্ধ ওজনের পশুর জন্য		৪-৫ কেজি	৪.০-৪.৫ কেজি	১০-১৫ কেজি
৫লি.বা তদুর্দ্ধদুধালো গাভী মহিষের জন্য-	দুধ দেয়া অবস্থায়	৪-৫কেজি	৩-৫-৪ কেজি	২৫-৩০কেজি
	শুষ্ক অবস্থায়	৫-৬কেজি	১-২ কেজি	২০-২৫কেজি

মহিষের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ মহিষ সাধারণত দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে প্রজননক্ষম হয়ে থাকে। আমাদের দেশে মহিষের প্রজজন মূলত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায়ে হয়ে থাকে। তবে দেশে বর্তমানে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। স্ত্রী মহিষের গরম হওয়ার বা হিটে আসার লক্ষণ গাভী বা বকনা গরুর মত প্রকট নয় বিধায় মহিষের কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রকৃত হিট বা গরম নির্ণয় করে প্রজনন করানো না গেলে গর্ভধারণের হার কম হবে।

মহিষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ মহিষের রোগ বালাই তুলনামুলকভাবে কম। মহিষ সাধারণত বাদলা, গলাফুলা, তড়কা ও ক্ষুরা রোগে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। নদী অববাহিকায় এবং বাথান এলাকায় গলাফুলা রোগের প্রার্দুভাব বেশী দেখা যায়। নিয়মিত বাদলা, গলাফুলা, তড়কা ও ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান করা হলে মহিষকে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

সেশন-৫৯

ছাগল পালনের উপকারিতা ও ছাগলের জাত পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যা
- ছাগলের জাত পরিচিতি
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ও যমুনাপারী ছাগলের বৈশিষ্ট্য

ছাগল পালন ঃ

ছাগল অর্থকরী প্রাণিসম্পদ। ছাগল আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য হ্রাস, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাগল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে এদেশের মোট প্রায় দু' কোটি পঞ্চাশ হাজার ছাগলের অধিকাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের।

দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ছাগল গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ছাগলের দুধ একটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য পানীয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, আমিষ, চর্বি খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান ছাগলের দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গাভীর দুধের চর্বি কণার তুলনায় আকারে ছোট হওয়ায় ছাগলের দুধের পরিপাচ্যতা বেশি। বাড়ন্ত শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর জন্য ছাগলের দধু উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শিশু ও প্রসূতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ যা গাভীর দুধের তুলনায় ছাগলের দুধে বেশি থাকে। সামান্য ক্ষারীয় হওয়ায় গ্যাস্ট্রিক আলসার বা এসিডিটিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য সহজপাচ্য পানীয় হিসাবে ছাগলের দুধ পান করা হয়। হাঁপানী রোগের ঔষধ হিসাবে ছাগলের দুধ বিবেচিত।

ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় প্রাণিজ আমিষ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিশ্বের অনেক দেশে ছাগলের মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন জাতের ছাগলের মাংসের চেয়ে সুস্বাদু। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, আকীকা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছাগল জবাই করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে ।

দুধ ও মাংস উৎপাদন ছাড়াও পশম ও চামড়া উৎপাদনে ছাগল গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া হতে উন্নত মানের চামড়াজাত পণ্য তৈরি হয়। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ার কদর বিশ্বব্যাপী। শীত প্রধান দেশের ছাগলের লম্বা লোম পশমিনা, শাল, সোয়েটার, হ্যাট, কার্পেট, স্যুট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাংগোরা জাতের ছাগলের লোম হতে তৈরি হয় সাদা ও সোনালী মোহেয়ার (Mohair)।

ছাগলের দুধ, মাংস, চামড়া, পশম ও মলমূত্রের বহুমুখী ব্যবহার একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদে পরিণত করেছে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হয়। আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার।

বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যা ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ ঃ

- ➢ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ে ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। গ্রামের বসতবাড়িতে ৮-১০ টি ছাগল পালন করা লাভজনক। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৭৬% এলাকা ছাগল পালনের উপযোগী।
- ➢ ছাগল অপ্রচলিত খাদ্য যেমনঃ কাঁঠাল পাতা, বাঁশ পাতা, আম পাতা, কলা পাতা, হিজল পাতা এমনকি বসতবাড়ির আশেপাশের লতাপাতা ও সামান্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। ফলে ছাগলের খাবার জোগাড় করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়।
- ➢ যেসব খামারীর গাভী পালন করার সামর্থ নেই তারা অনায়াসে ৮-১০ টি ছাগল পালন করতে পারে। স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষী, গ্রামের দুস্থ্য মহিলা বা ছোট ছোট বালক বালিকারাও বাড়ির আশেপাশে, ক্ষেতের ধারে, রাস্তার পাশে ছাগল চড়িয়ে পালন করতে পারে।
- ➢ ছাগলের রোগ বালাই অন্যান্য গবাদিপ্রাণির তুলনায় কম হওয়ায় ছাগল পালন লাভজনক।
- ➢ বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ২-৩ টি করে বাচ্চা দেয় বলে এ জাতের ছাগল পালন লাভজনক।
- ➢ দেশে ও দেশের বাইরে ছাগলের মাংস, দুধ ও চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এগুলো বাজারজাতকরণ সহজসাধ্য।
- ➢ ছাগল খামার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের ঝুঁকি অন্যান্য গবাদি প্রাণির তুলনায় কম।
- ➢ ছাগল ভূমিহীন ক্ষুদ্র মাঝারি চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের অন্যতম উৎস।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সমস্যাসমূহ ঃ

১. ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খামারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ।

২. ছাগলের বিভিন্ন রোগ দমনে প্রস্তুতিমূলক ও কৌশলগত ব্যবস্থার অভাব যেমন- কৃমি নাশক না খাওয়ানো, যথাসময়ে টিকা প্রদান না করা ।

৩. স্ক্যাভেঞ্জিং, সেমি-ইন্টেনসিভ এবং ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

৪. নীতিমালাহীন অবাধ সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের কৌলিক মানের হ্রাস।

ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ না করা।

ছাগলের জাত পরিচিতি ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. মাংস উৎপাদনকারী জাত

২. দুধ উৎপাদনকারী জাত

৩. পশম উৎপাদনকারী জাত

৪. চামড়া উৎপাদনকারী জাত

১. মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ ঃ এ জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত ভাল মানের।

ক্রমিক	ছাগলের জাত	প্রাপ্তিস্থান	দৈহিক ওজন
১	ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২	বোয়ার	দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন	৭০-৯৫ কেজি
৩	দামানি	পাকিস্তান, ভারত	২০-২৫ কেজি
৪	বিটাল	পাকিস্তান, ভারত	৪৫-৬৫ কেজি

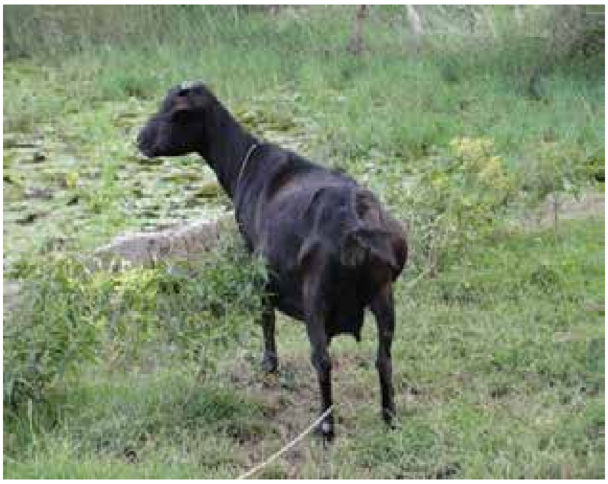

ব্ল্যাক বেঙ্গল কালো জাতের ছাগল

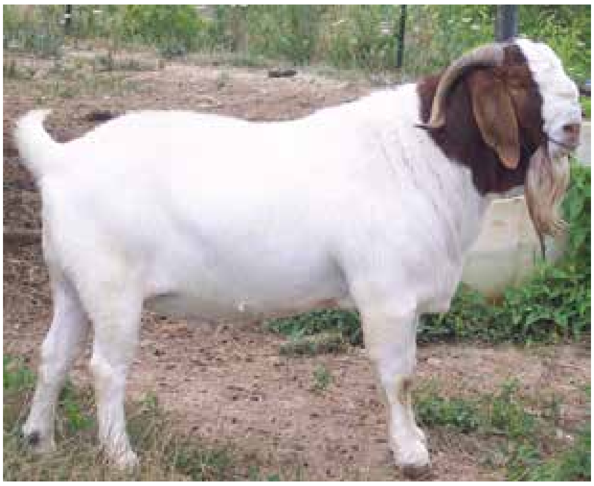

বোয়ার জাতের ছাগল

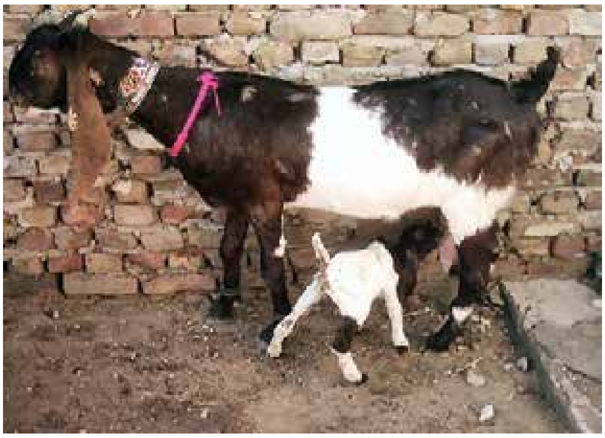

দামানি জাতের ছাগল

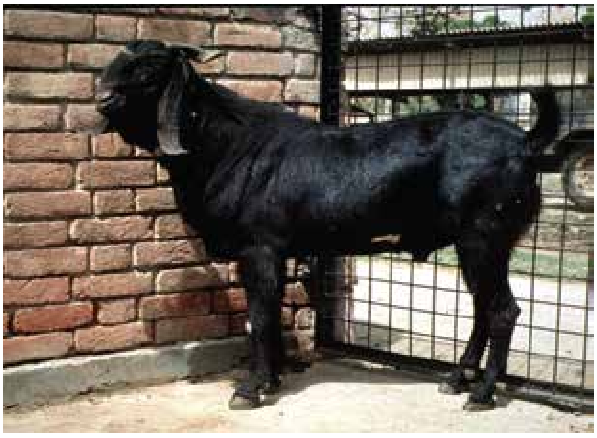

বিটাল জাতের ছাগল

২. দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত ঃ

ল্যাকটেশন পিরিয়ডে এ শ্রেণির ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায়। দুধ উৎপাদনকারী বিভিন্ন ছাগলের জাতের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	ছাগলের জাতের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দৈহিক ওজন (কেজি)	দৈনিক দুধ উৎপাদন (লিটার)	প্রতি ল্যাকটেশনে দুধ উৎপাদন (লিটার)
১	যমুনাপারী	ভারত, বাংলাদেশ	৪৫-৮০	২-৪	৬১৮
২	সানেন	হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৬৫-৯৫	৩-৫	১৫০০
৩	অ্যাংলো নুবিয়ান	ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	৬০-৭০	২-৩	৭৭৪
৪	টোগেনবার্গ	সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৫০-৬৫	১	৫০০
৫	দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০	২-৩	৫২৫
৬	বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০	১-২	১২০-১৫০
৭	ব্রিটিশ আলপাইন	ব্রিটেন, ইউরোপ	৬০-৬৫	১.২	২১০-২৭৫

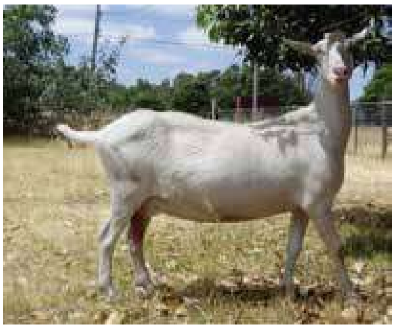

সানেন জাতের ছাগল

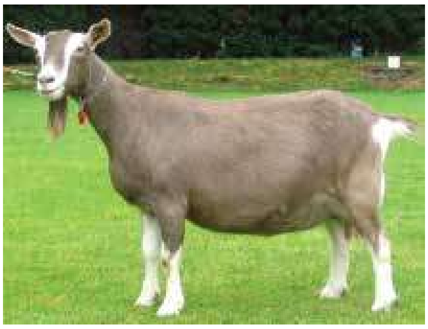

টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

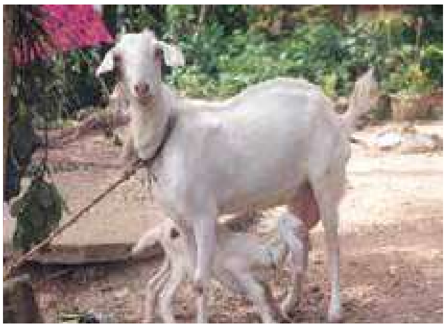

মালাবারি জাতের ছাগল

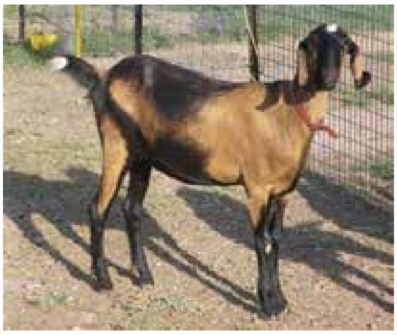

অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

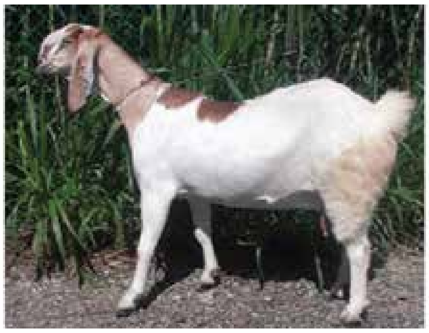

যমুনাপারী জাতের ছাগল

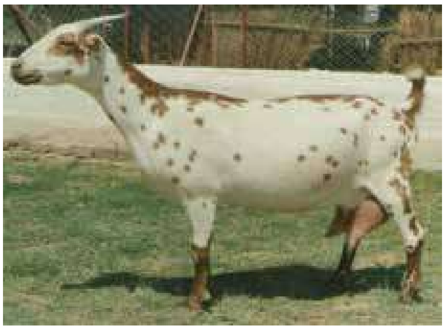

বারবারি জাতের ছাগল

৩. চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত ঃ

এই শ্রেণির ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় ।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	দৈহিক ওজন
১	ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২	মালাবার	ভারত	৩৫-৪০ কেজি
৩	বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০ কেজি
৪	দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০ কেজি

৪. পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত ঃ

এ শ্রেণির ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরি করা হয় ।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	পশমের নাম
১	অ্যাংগোরা	তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র	মোহেয়ার
২	কাশ্মিরী	ভারত	ক্যাশমেয়ার
৩	মেরাডি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	ক্যাশমেয়ার

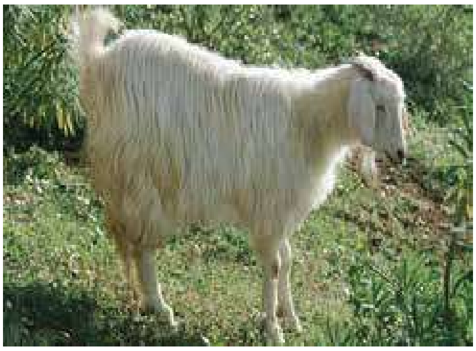

কাশ্মিরী জাতের ছাগল

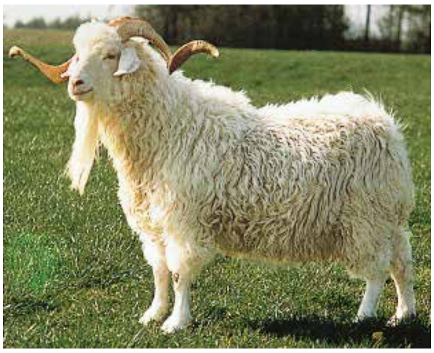

অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দু'টি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো। উচ্চতা ১৬-২৪ ইঞ্চি।
২. এদের দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়।
৩. এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল।
৪. এদের শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো।
৫. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি। পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি।
৬. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়।
৭. এ জাতের ছাগল প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে।
৮. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট।
৯. ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না।
১০. ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়।
১১. ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

যমুনাপারী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে।
২. এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। সাধারণত ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান দেখা যায়।
৩. ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত। বাটগুলো মোটা ও লম্বা ।
৪. শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি।
৫. যমুনা পাড়ি জাতের পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে।
৬. এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।
৭. যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে।
৮. ল্যাকটেশন পিরিয়ডে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয়। প্রতি ল্যাকটেশনে এরা সর্বোচ্চ ৬১৮ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।
৯. এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

সেশন-৬০

ছাগল পালন পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে -

- ছাগলের খামারের স্থান নির্বাচন
- বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি
- পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার, মুক্তভাবে ছাগল পালন
- সেমি-ইনটেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন
- ইনটেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং ইনটিগ্রেটেড/সমন্বিত খামার

ছাগলের খামারের স্থান নির্বাচন ঃ

স্বাস্থ্যসম্মত ও লাভজনক ছাগলের খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। ছাগলের খামার স্থাপনের সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

- যথাসম্ভব উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় ছাগল খামার স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যার পানি খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে না থাকে।
- খোলামেলা এবং প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় খামার স্থাপন করা বাঞ্চনীয়।
- ঘাস চাষের উপযোগী উর্বর মাটি যেমন ঃ দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে খামার স্থাপন করলে ঘাস চাষের সুবিধা হয়।
- লোকালয় হতে সামান্য দূরে কিন্তু বাজার বা শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিৎ। এতে খামারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহন সহজতর হয়।
- বিশুদ্ধ পানির উৎস/সরবরাহ রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা প্রয়োজন।
- বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে।
- খামারে পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা-নর্দমা থাকতে হবে।
- কাছাকাছি চারণ ভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক।
- এ ছাড়া জীবন ধারণের আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল, সামাজিক অসন্তোষ নেই এমন স্থানে খামার স্থাপন করা বাঞ্চনীয়।

বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি ঃ

একটি ছাগল খামার স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। মূলতঃ কোন খামারে ছাগলে সংখ্যা, খামারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, খামার মালিকের পুঁজি, বিচরণ ভূমি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ছাগল পালন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার, মুক্তভাবে ছাগল পালন, সেমি ইনটেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইনটেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইনটিগ্রেটেড/সমন্বিত খামার প্রভৃতি উলেখযোগ্য। নিম্নে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ২-৫ টি
- ছাগলের জন্য আলাদা কোন বাসগৃহের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গোয়াল ঘরে বা খামারীর শোয়ার ঘরে বা বসতঘরের পাশের বারান্দায় ছাগলকে রাখা হয়।
- বসত ঘরের আশে পাশের পতিত জমি ও ক্ষেতের আইলের ঘাস হতে ছাগলের খাদ্যের সংস্থান হয়। তবে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, ছোলার ভূষি, ভাতের মাড়, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সুবিধা ঃ

অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র খামারী, প্রান্তিক চাষী এবং উচ্চ বিত্ত কৃষক সকলেই এ ধরণের খামার করতে পারেন। এ ধরণের খামার স্থাপনে অল্প জায়গা এবং ব্যবস্থাপনায় অল্প শ্রম প্রয়োজন হয়। বিনিয়োগ অল্প বলে এ ধরণের খামারে ঝুঁকির পরিমাণ কম। এক সাথে অল্প সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে এদের ব্যবস্থাপনা সহজসাধ্য। এদের রোগ ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং উৎপাদন ভাল হয়। সংখ্যা কম হওয়ায় বাজারজাতকরণও তুলনামূলক ভাবে সহজ।

অসুবিধা ঃ

অল্প সংখ্যক ছাগল পালনের কারণে বাৎসরিক আয় কম হয়। তাই একক পেশা হিসাবে গ্রহণের জন্য এ ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালন করা হয় না বলে অনেক সময় ছাগলের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে কম অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। ফলে উৎপাদন অনেক সময় আশানুরূপ হয় না।

মুক্তভাবে ছাগল পালন ঃ

বৈশিষ্ট্যঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ৮-১০ টি
- বসত ঘরের আশে পাশের অনাবাদি জমি, পতিত জমি যেমন- রেল লাইনের ধার, বাধঁ, পুকুর পাড়, খেলার মাঠ, পাহাড়ী ভূমি, নদীর চর প্রভৃতি জায়গায় মুক্তভাবে সারাদিন ছাগল চরানো হয়।
- শুধু রাতের বেলায় ছাগলকে বাড়িতে নেওয়া হয়। এসময় শুধুমাত্র দানাদার খাবার ছাগলকে সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ

- পতিত/অনাবাদি জমিতে মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের জন্য আলাদাভাবে ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ কম হয়।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রোগ-বালাই তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

অসুবিধা ঃ

- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা-শোনার কাজে নজরদারি করতে হয়। নতুবা ছাগল হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ানোর কারণে অনেক সময় ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে।
- দেশব্যাপী নিবিড় কৃষি কাজের কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের অধিকাংশ স্থানে এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা কঠিন ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের পরিকল্পিত প্রজনন সম্ভব নাও হতে পারে ।

সেমি ইনটেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- এ ধরণের পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল ।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়।
- ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ

- এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।
- খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।

অসুবিধা ঃ

- বিনিয়োগ বেশি করতে হয় বলে স্বল্প পুঁজির খামারীর জন্য এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয় বহুল।
- এক সাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ বেশী হয় ।

ইনটেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

- এই পদ্ধতিতে খামারে শতাধিক হতে সহস্রাধিক ছাগল পালন করা সম্ভব। বিনিয়োগের পরিমাণের উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় এবং কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলের মুক্তভাবে চারণভূমিতে চরে বেড়ানোর কোন সুযোগ থাকে না। তবে খামার গৃহের সাথে খামার গৃহের প্রায় দ্বিগুণ জায়গা নিয়ে খোঁয়াড় তৈরি করা হয় যার চারপাশে বেড়া দেওয়া থাকে। উক্ত খোঁয়ারে ছাগলকে দিনের বেলা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার রাফেজ জাতীয় খাদ্য খোঁয়াড়ে সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ

- পরিকল্পিতভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয় বলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
- অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে তুলনামূলকভাবে জনবল খাতে ব্যয় কম হয়।
- বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে ছাগল পালনকে শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব এবং রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

অসুবিধা ঃ

- গৃহ নির্মাণ ও খোঁয়াড় স্থাপনে প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- এই পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি।
- সময়মত কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করা না গেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কখনো কখনো এই পদ্ধতি লাভজনক হয় না।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আয় ঃ

- বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল। বিনিয়োগ যত বেশি হবে অর্থ্যাৎ যত বেশি সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশি হবে।

ইনটিগ্রেটেড/সমন্বিত খামার ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ

ফলজ বা বনজ বাগানে সমন্বিত উপায়ে আধা-নিবিড় বা পারিবারিকভাবে ছাগল পালন করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পেয়ারা, পেঁপে, আম, কাঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফলজ বাগান অথবা বনজ বাগানের নিচে পারা, সিগনাল, মাসকালাই, কাউপি, ধইঞ্চা প্রভৃতি ঘাস/রাফেজ চাষ করা যেতে পারে। ফলে ঘাস চাষের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে বা এতে ছাগল চরানো যেতে পারে। এ ছাড়া ফল বাগানের অতিরিক্ত পাতা কেটে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সুবিধা ঃ

- সমন্বিত উপায়ে খামার গড়ে তোলা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা চারণভূমি বা ঘাস চাষের ভূমির প্রয়োজন হয় না।
- একই ব্যক্তি একই সাথে বাগানের তদারকি ও ছাগল দেখাশোনা করতে পারেন বলে এই পদ্ধতিতে শ্রমের সাশ্রয় হয়।
- ছাগলের মল-মূত্র জৈব সার হিসেবে খামারে ব্যবহার করা যায়।
- এই পদ্ধতিতে ছাগল চরে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং অল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হয় না বলে রোগ বালাইয়ের প্রকোপ কম হয়।

অসুবিধা ঃ

- নজরদারী না থাকলে ছাগল কর্তৃক বাগানের চারা গাছ, ছোট গাছ, সব্জি ক্ষেত খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

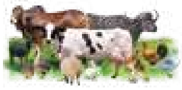

সেশন-৬১

ছাগলের খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ছাগলের খাদ্যাভ্যাস
- বয়স ও ওজন অনুসারে দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা
- ছাগলের ঘর নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
- পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণি-বিন্যাস

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস ঃ

ছাগল রোমন্থক প্রাণী। গরু মহিষের মত ছাগলও সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে। এ ছাড়া ছাগল সংকটকালে নাইট্রোজেন ও পানি অধিকতর ভালভাবে শরীরের কাজে লাগাতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণি খায় না। এরা সাধারণ বা নিম্নমানের খাদ্য খেয়েই প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, তুঁত, গামারী, মেহগিনি, বট, বরই, ভূট্টা, সূর্যমুপ্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্বাঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা-ঝোপ এবং বাড়ির শাক-সবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। ছাগলকে সুস্থ্য ও সবল রাখতে হলে এবং অধিক উৎপাদন পেতে হলে একে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিৎ। অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

খাদ্যের সুস্বাদুতা ঃ

ছাগল অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। আবার ছাগলের সামনে গাছের ডালপাল ও কান্ডসহ পাতা দিলে ছাগল কান্ড বাদে শুধু পাতা খেয়ে থাকে। ছাগল সাধারণত বেছে বেছে খাদ্য মনোনীত করে খেয়ে থাকে। ছাগল মিষ্টি, তিক্ততা এবং টক স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এরা তিক্ত স্বাদ বেশি সহ্য করতে পারে। ছাগল লিগিগুম ফডার বেশী পছন্দ করে। ছাগল শালগম, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাঁচা ঘাস পছন্দ করলেও সাইলেজ পছন্দ করে না।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঃ

বয়স্ক ছাগলের তুলনায় ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ আমিষ ও উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে। ৪-১৫ মাস বয়সী ছাগল (বাড়ন্তকালীন সময়) কে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখা দরকার যে, ছাগল খামারের খাদ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের ৬০-৭০ ভাগ। তাই খামারের লাভ লোকসান খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দানাদার খাদ্যের মূল্য আঁশ জাতীয় খাবারের চেয়ে বেশি। তাই আঁশ জাতীয় খাবার খেয়ে যত বেশি পুষ্টি চাহিদা মেটানো যাবে তত ব্যয় কমানো যাবে। নিম্নে ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ছক আকারে দেখানো হলো।

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ঃ

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০	০.১৫	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০

৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০	৩০০	৪০০

দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ঃ

ছাগীর ওজন (কেজি)	দুধের পরিমান (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

ছাগলের দানাদার সুষম খাদ্য তৈরীর তালিকা ঃ

খাদ্যের উপাদান	**বাচ্চা ছাগলের খাদ্য**	**বড় ছাগলের খাদ্য**
ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
ধান ভাঙ্গা	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	**১০০ ভাগ**	**১০০ ভাগ**

ছাগলের বাসস্থান-

ছাগলের ঘর নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১. ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মাণ করা উত্তম।
২. ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
৩. ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ।
৪. ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা-লম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ

পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরি করতে হয়।

একটি বাণিজ্যিক ছাগল খামারে নিম্নবর্ণিত আলাদা আলাদা ঘর থাকা বাঞ্চনীয় ঃ

১. প্রজনন উপযোগী ও দুগ্ধবতী ছাগলের ঘর, ব্রুডিং পেন
২. বাচ্চা ছাগলের ঘর (দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত)
৩. মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের ঘর (২-৩ মাস বয়স হতে প্রাপ্ত বয়স্ক)
৪. পাঁঠা ছাগলের ঘর (৩ মাস বয়স হতে সার্ভিসকালীন সময়)
৫. গর্ভবতী ছাগলের ঘর
৬. আইসোলেশন শেড (অসুস্থ্য ছাগলের জন্য)
৭. কোয়ারেন্টাইন শেড (নতুন ক্রয়কৃত ছাগলের জন্য-ক্রয়ের পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত)
৮. দানাদার খাদ্য রাখার ঘর
৯. সবুজ ঘাস ও রাফেজ জাতীয় খাদ্য রাখার ঘর
১০. অফিস ঘর

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণি-বিন্যাস ঃ

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দু'ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে-

ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয় ।

খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়।

নির্মাণ উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে–

১. কাঁচা মেঝের ঘর
২. অর্ধ-পাকা মেঝের ঘর
৩. পাকা মেঝের ঘর

ক) পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী, দক্ষিণ দিক খোলা ঘর ছাগল পালনের জন্য উপযোগী। খামারের চার দিক দিয়ে ঘেরা পরিবেশে গাছপালা লাগানো যেতে পারে। ছাগল খামারের স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

গ) ছাগলের ঘর ছন, খড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। তবে ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচাঁ তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।

ঘ) মাচাঁর উচ্চতা ১.০ মিটার (৩.৫ ফুট) এবং মাচাঁ থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৭.৫ ফুট) হবে। গোবর বা চলা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে:মি: ফাঁকা রাখতে হবে। মাচাঁর নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু(২%) রাখতে হবে।

ঙ) মেঝে মাটি হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে। ছাগলের ঘরের দেয়াল, মাচাঁর নিচের অংশ ফাঁকা এবং মাচাঁর উপরের অংশ নেট হতে পারে। বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১.০-১.৫ মিটার (৩.৫০ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

চ) শীতকালে রাতের বেলায় মাচাঁর উপর দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাচাঁর উপর ৪-১১ সে:মি: (৩-৪ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

ছ) বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরনের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিৎ। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা দরকার। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী এবং শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। তবে, তাদের পৃথক খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। শীতকালে রাতের বেলা বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রাখতে হবে। ব্রুডিং পেন একটি খাঁচা বিশেষ যা কাঠের বা বাঁশের তৈরী হতে পারে। এর চারপার্শ্বে চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকে।

জ) ছাগলের ঘরের নমুনা: প্রস্থ দৈর্ঘ্য ১০০ ফুটX২৫ ফুট=২৫০০ বর্গফুট; মাচাঁর উচ্চতা ২.৫০-৩.৫০ ফুট। মাচাঁয় বাঁশ বা কাঠের ফালির মাঝখানে ১-১.৫ সে:মি: বা ০.৫০ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। এরকম একটি ঘরে মোট ২৫০টি ছাগল রাখা যেতে পারে। মাচাঁর উপর ছাগল উঠার জন্য বর্হিমুখী মেঝে থেকে ৫ ফুট লম্বা সিঁড়ি রাখতে হবে।

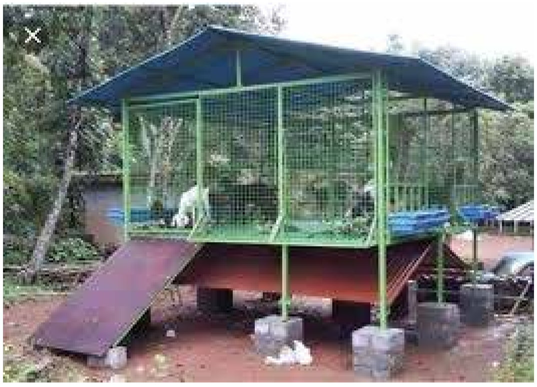
পারিবারিক ছাগলের বাসস্থান মডেল

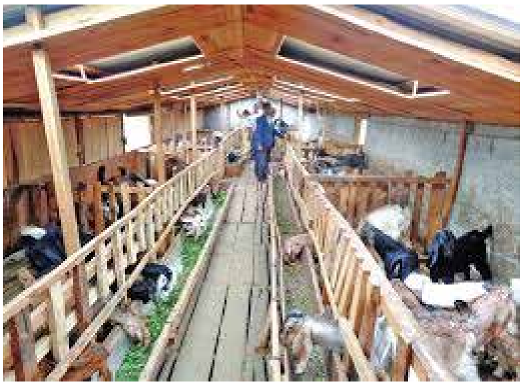
বাণিজ্যিক ছাগলের বাসস্থান মডেল

সেশন-৬২

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য
- প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন
- প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন
- ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয়। বাছাই ক্রিয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

১। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

- দৈহিক বৃদ্ধির হার
- যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন
- জন্মকালীন বাচ্চার ওজন
- দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন
- দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার

২। উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- ছাগল প্রতি মাংস উৎপাদন
- ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ
- চামড়ার গুণাগুণ
- দুধ উৎপাদন
- লোম উৎপাদন
- লোমের গুণগত মান

৩। পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- বয়োঃসন্ধির বয়স
- প্রথম প্রজননে আসার বয়স ও ওজন
- প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন
- প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
- কিডিং ইন্টারভ্যাল
- প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
- পাঁঠার শুক্রাণুর গুনগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন ঃ

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে।
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে।
- পাঁঠা রুক্ষ, আক্রমণাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে।
- পাঁঠার পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- পাঁঠার অন্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হবে। পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
- অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

প্রজনন পাঁঠা

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন ঃ

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে-

- ছাগীর বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে । দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হলে মাংসবহুল ছাগী নির্বাচন করতে হবে ।

গর্ভবতী ছাগী

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায় ।
- সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে । অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয় ।
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায় ।
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয় ।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ঃ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয় ।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গভর্ধারণ নিশ্চিত করা যায় । সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন ।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে ।

সেশন-৬৩

ছাগলের টিকাপ্রদান কর্মসূচি ও ছাগল খামারের তথ্য সংরক্ষণ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- টিকা প্রদানের সাধারণ নিয়মাবলী ও প্রয়োগ পদ্ধতি
- টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণ
- টিকা প্রদানের সতর্কতা গ্রহণ
- ছাগীর প্রজনন, খাদ্য প্রদান, দুধ উৎপাদন, টিকা ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম। রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপুর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা। কোন সুস্থ্য প্রাণীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে টিকা প্রদান বা ভ্যাকসিনেশন বলে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছরহতে আজীবন কাল হতে পারে।

ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

- সুস্থ্য প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে। অসুস্থ্য প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করা নিরাপদ নয় ।
- পরজীবী আক্রান্ত প্রাণিকে ভ্যাকসিন ভাল কাজ করে না। তাই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পূর্বে প্রাণিকে পরজীবি মুক্ত করে নিতে হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ ভ্যাকসিন কোন কাজে আসে না বরং তা ক্ষতিকর।
- ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার বা পাতিত পানি ব্যবহার করতে হবে। পুকুর, নদীনালা, ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করলে ভ্যাকসিনের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- পানিতে গুলানো ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে (গুলানোর সর্বোচ্চ ১ ঘন্টার মধ্যে ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হবে)।
- ভ্যাকসিন নির্দেশনানুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবহনের সময় থার্মোফ্লাক্সে পরিবহন করতে হবে ।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন ধরণের ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশনানুযায়ী শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত যে সকল পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো ঃ

- মাংসপেশীতে ইনজেকশন
- চামড়ার নিচে ইনজেকশন
- শিরায় ইনজেকশন

টিকার কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণ ঃ

- ভ্যাকসিন/টিকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে।
- অসুস্থ্য প্রাণিকে ভ্যাকসিন প্রদান করলে।
- প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে কিংবা রক্ত-শুন্যতায় ভুগছে এমন প্রাণিকে ভ্যাকসিন করলে।
- জীবিত জীবাণু দ্বারা তৈরি ভ্যাকসিনের জীবাণু গুলো মারা গেলে।
- ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার না করে অনিরাপদ পানি ব্যবহার করলে।।
- ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার যন্ত্রপাতি পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত না হলে।
- যে জীবাণুর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন দেওয়া হলো ভ্যাকসিন ঐ জীবাণুর এন্টিজেন দ্বারা তৈরি না হলে।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত মাত্রায় ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা না হলে।

পিপিআর টিকা ও ডায়লুয়েন্ট

বিজ্ঞানভিত্তিক টিকাপ্রদান পদ্ধতি

টিকা প্রদানের সতর্কতা ঃ

- ❖ অসুস্থ্য প্রাণিকে কোন অবস্থাতেই ভ্যাকসিন প্রদান করা যাবে না।
- ❖ প্রয়োগের পূর্বে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা ভালমত পড়ে নিতে হবে। নির্দেশনানুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় নির্দেশিত স্থানে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ দু'টি টিকা প্রয়োগের মধ্যবর্তী বিরতিকাল কমপক্ষে ২ সপ্তাহ হবে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণ ঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমাণ
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	মনো-১মিলি বাই-২ মি.লি. ট্রাই-৩মিলি
গোট পক্স টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
জলাতংক টিকা (রেবিসিন)	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৯ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে) ১ বছর পর বুষ্টারডোজ	১ বছর পর	চামড়ার নিচে/ মাংসপেশীতে	১মিলি
অ্যানথ্রাক্স টিকা		১ বৎসর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
গলাফুলা টিকা	৬মাস	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	২মিলি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে	-	মাংশে	১মিলি

ছাগীর প্রজনন সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

খামারের নাম ঃ -- ঠিকানা

ঃ --

ছাগীর জাত ঃ -- সন ----------------------

ছাগীর জাত ও ছাগীর নাম্বার/নাম	প্রজননের তারিখ	ব্যবহৃত পাঁঠার জাতের নাম	বাচ্চা জন্ম দেওয়ার তাং	বাচ্চার জন্ম কালিন ওজন	বাচ্চার সেক্স	মন্তব্য	স্বাক্ষর

খাদ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

খামারের নাম ঃ -- ঠিকানা

ঃ ---মাস ------------------ সন ----------------

তারিখ	দানাদার খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)	খরের পরিমাণ (কেজি)	কাঁচাঘাসের পরিমাণ (কেজি)	অন্যান্য (কেজি)	মন্তব্য	স্বাক্ষর
১-৩১						
মোট পরিমাণ						
মোট মূল্য						

দুধ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

খামারের নাম ঃ -- ঠিকানা

ঃ --মাস ------------------ সন -----------------

তারিখ	সময়	ছাগীর নাম/নং ( )			ছাগীর নাম/নং ( )		
		দুধের পরিমাণ (লিটার)	দুধের দর	দুধের মোট মূল্য	দুধের পরিমাণ (লিটার)	দুধের দর	দুধের মোট মূল্য
১	সকাল						
	বিকাল						
২	সকাল						
	বিকাল						
২৯	সকাল						
	বিকাল						
৩০	সকাল						
	বিকাল						
মোট দুধ							
মোট মূল্য							

আয় ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

খামারের নাম ঃ -- ঠিকানা

ঃ --মাস ------------------ সন -----------------

তারিখ	আয় সংক্রান্ত			ব্যয় সংক্রান্ত			মন্তব্য	স্বাক্ষর
	আয়ের উৎস	পরিমাণ/ সংখ্যা	টাকা	ব্যয়ের খাত	পরিমাণ/ সংখ্যা	টাকা		
১ - ৩১								
আয় ব্যয়	মাস শেষে আয়ের মোট টাকা			মাস শেষে ব্যয়ের মোট টাকা				
লাভ								
লাকসান								

ভ্যাকসিন/টিকা সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার

ছাগলের নাম/নং	ভ্যাকসিন/ টিকার নাম	১ম বার প্রয়োগের তারিখ	২য় বার প্রয়োগের তারিখ	৩য় বার প্রয়োগের তারিখ	৪র্থ বার প্রয়োগের তারিখ	৫ম বার প্রয়োগের তারিখ	মন্তব্য	স্বাক্ষর
	তড়কা							
	নিউমোনিয়া							
	গলা ফুলা							
	ক্ষুরা রোগ							
	জলাতাঙ্ক							
	পি পি আর							

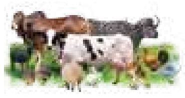

সেশন-৬৪

গো-খাদ্য হিসাবে এ্যালজির উৎপাদন ও ব্যবহার

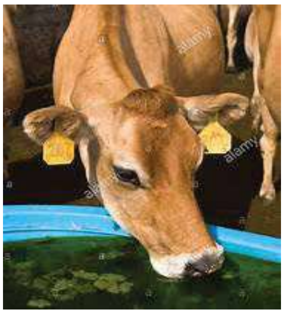

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ এ্যালজির পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা
- ➢ এ্যালজি উৎপাদন পদ্ধতি
- ➢ গবাদিপশুকে এ্যালজি খাওয়ার নিয়ম ও উপকারিতা

এ্যালজি এক ধরনের এককোষী উদ্ভিদ যা পুষ্টিকর গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে। আমাদের দেশে সাধারনত: দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজি ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস চাষ করা হয়ে থাকে।

এ্যালজির পুষ্টিমান ঃ

বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন থাকে, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। রোমন্থনকারী প্রাণীতে (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) এ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতিঃ

এ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ এ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবওয়েলের পরিস্কার পানি, মাসকলাই বা অন্যান্য ডালের ভূষি এবং ইউরিয়া।

- প্রথমে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর তৈরী করতে হবে। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরী হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও এ্যালজি চাষ করা যায়।
- ১০০ গ্রাম মাসকলাই (বা অন্য ডালের) ভূষিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিস্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ এ্যালজির বীজ, যা এ্যালজির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২- ৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকেলে কমপক্ষে তিনবার এ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মত পরিস্কার পানি যোগ করতে হয়। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুর প্রতি ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।
- এভাবে উৎপাদনের ১২ - ১৫ দিনের মধ্যে এ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় এ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। এ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- একটি পুকুরের এ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মত পানি, সার, এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে এ্যালজি বীজ দিতে হয় না।
- যখন এ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামী রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচার-টি কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

গরুকে এ্যালজি খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ

এ্যালজির পানি সব বয়সের গরুকে খাওয়ানো যায়। এ্যালজি খাওয়ানোর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত দুই এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের গরু ১২ কেজি পরিমান এ্যালজির পানি পান করে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। এ্যালজি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। শুকনো এ্যালজি ১% হারে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারিতা ঃ

রোমন্থনকারী প্রাণি যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে ঘাস বা খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল মানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মত প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত খাবার খায় তা হলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় তথা গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তি সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন- খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে এ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ্যালজি খাওয়ালে আমিষ জাতীয় দানাদার খাদ্য কম লাগে এতে গবাদিপশু পালনে খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

সেশন-৬৫

ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ভেড়ার জাত পরিচিতি
- ভেড়ার ঘর নির্মাণ
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভেড়ার খাদ্যাভাস
- ভেড়ার মাংসের গুনগতমান
- শেয়ারিং এর যন্ত্রপাতি পরিচিতি

ভেড়ার জাত ঃ

পৃথিবীতে প্রায় ৯০০ জাতের ভেড়া আছে। উৎপাদনে ভিত্তিতে ভেড়া তিন ধরণের হয়।

১. মাংস উৎপাদন কারী ভেড়া, ২. উল উৎপাদনকারী ভেড়া, ৩. দুধ উৎপাদনকারী ভেড়া।

শারীরিক গঠনের উপর ভেড়া তিন ধরণের।

১. দীর্ঘ ও সরু লেজ যুক্ত ভেড়া, ২. ছোট সরু লেজ যুক্ত ভেড়া, ৩. এবং চর্বিযুক্ত লেজ বিশিষ্ট ভেড়া।

ডরসেট জাতের ভেড়া ঃ

এ জাতের ভেড়ার উৎপত্তি দক্ষিণ ইংল্যান্ডে। বয়স্ক ভেড়ার ওজন ১০৫ থেকে ১২৫ কেজি। ভেড়ীর ওজন ৭০ থেকে ৯০ কেজি। মাংস উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় এ জাত হতে বছরের ২.৫- ৩.৫ কেজি পর্যন্ত উল পাওয়া যায়।

মেরিনোঃ

মেরিনো জাতে ভেড়া স্পেনে উদ্ভব হয়। এই ভেড়া জার্মানি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবার ১-৬ টি বাচ্চা দেয়। এজাতের ভেড়া আমাদের দেশে উষ্ণ ও আদ্র আবহওয়ায় খাপখাওয়াতে পারে।

মাটন মেরিনো ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকার উল ও মাংস উৎপাদনকারী এজাতের ভেড়া ১১০ কেজি এবং ভেড়ী ৭০-৯০ কেজি হয়। এদের মুখমন্ডল সাদা এবং পা উল বিহীন। বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুতে উপযোগী হতে পারে।

বাংলাদেশী ভেড়া ঃ কৃষি ও পরিবেশগত অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশে তিন ধরণের ভেড়া দেখা যায়।

১. বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া, ২. যমুনা অববাহিকা এলাকার ভেড়া, ৩. উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া।

১. বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া ঃ

রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ এবং নাটোর অঞ্চলে এসকল ভেড়া দেখা যায়। মুখ মন্ডল ও পায়ের রং কালচে খয়রি। কান ছোট ও লেজ সরু। এই ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়। ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে ২-৩টি করে বাচ্চা দেয়। বয়স্ক ভেড়ার ওজন ২০-৩০ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১৫-২৫ কেজি।

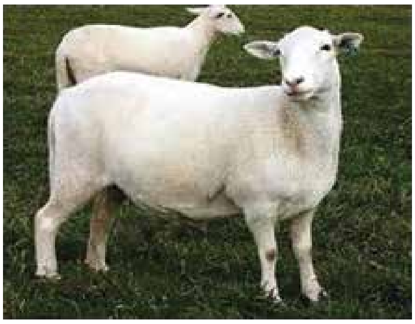

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া

২. যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া ঃ

টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং বগুড়া অঞ্চলে যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া দেখা যায়। এদের গায়ের রং সাদা হালকা থেকে গাঢ় বাদামি বা খয়েরি বা সাদা-কালো হতে পারে। এসকল ভেড়ার প্যাচানো কালো শিং থাকে এবং ভেড়ী শিং বিহীন। এদের উল বছরে দুইবার কাটা যায় এবং গড়ে তা ০.৫ কেজি পরিমাণ। এরা আদ্র স্যাঁতসেতে পরিবেশে থাকতে বেশি অভ্যস্ত।

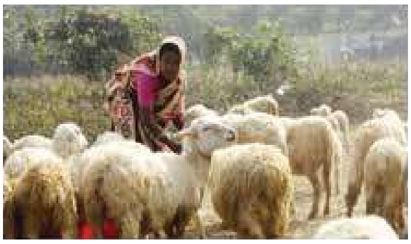

যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া

৩. উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া ঃ

এ ভেড়া পটুয়াখালী, নোয়াখালী, হাতিয়া, ভোলা , চট্টগ্রাম ও লক্ষীপুরের উপকূলীয় চড়াঞ্চলে দেখা যায়। এরা স্যাঁতসেতে চারণভূমিতে থাকতে অভ্যস্ত। এদের মুখমন্ডল, পা এবং পেট উলমুক্ত। এদের সাদাটে বাদামি রংয়ের শিং পিছন দিকে বাঁকানো থাকে।

উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া

৪. গাড়ল ঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন এলাকায় এবং উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায় লম্বা লেজযুক্ত ভেড়াগুলো গাড়ল নামে পরিচিত। এই ভেড়াগুলি ভারতের ছোটনাথপুরী জাতের ভেড়ার সাথে দেশীয় ভেড়ার সংকরায়ণের মাধ্যমে সৃষ্ট। এরা বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার ২-৩টি বাচ্চা হয়। পুরুষ গাড়লের ওজন ৬০-৭০ কেজি এবং স্ত্রী গাড়লের ওজন ৩০-৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

গাড়ল ভেড়া

কেন ভেড়া পালন করবেন ?

- ভেড়া ও ছোট প্রাণী। ফলে এদের খাদ্য, আবাসন, বিনিয়োগ এবং ঝুকিও কম।
- ভেড়ার মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে।
- গরু ছাগলের সাথে একত্রে পালন করা যায়।
- সাধারণতঃ একটি ভেড়ী বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ৩টি করে বাচ্চা দেয়।
- ভোড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলানামূলকভাবে বেশি।
- ভেড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হতে পারে।
- গাভী পালন করার সামর্থ নেই এমন খামারীরা ৪-৫ টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- ভেড়ার মাংস তুলনমূলকভাবে নরম, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই।
- একজন লোক অনায়াশে ৫০-১০০টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- ভেড়া নিজেদের বিভিন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে।

ভেড়ার ঘর তৈরী ঃ

- ঘরটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে শুষ্ক থাকে এবং ঘরে প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হওয়া যাবে না।
- ঘর এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- ঘর হতে হবে মজবুত ও আরামদায়ক। বিশ্রাম ও ব্যয়াম করার জন্য ঘরে প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- শীতের সময় ঠান্ডার হাত থেকে বেড়াকে রক্ষা করা যায়, ঘরটিতে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘরটি এমন হতে হবে, যাতে ঘরটি সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং পানি নিস্কাশনের সহজ ব্যবস্থা থাকে।
- ঘরটি এমন হতে হবে, যাতে ভেড়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- ভেড়ার ঘরের একটি মডেল প্রস্তত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ
- ঘরটি মাটি থেকে ১.৫ ফুট উপরে হবে।
- মেঝের আয়তন বা ফ্লোর স্পেশ (৬ ফুট x ৫ ফুট) = ৩০ বর্গফুট।
- চালার আয়তন প্রায় (৬.২৫ ফুটx৫.৫০ ফুট) = ৩৫ বর্গফুট।
- সম্মুখের দেয়াল সমূহ লম্বা ৬ ফুট চওড়া ফুট।
- দু দিকের ২টি দেয়াল সমূহ লম্বা ৫ ফুট চওড়া ৪.৫০ ফুট।
- পিছনের দেওয়াল লম্বা ৬ ফুট চওড়া ৪ ফুট।
- ভেড়ার ঘরে যাতায়াতের জন্য দরজার সাথে একটি বাঁশের সিঁড়ি থাকবে।

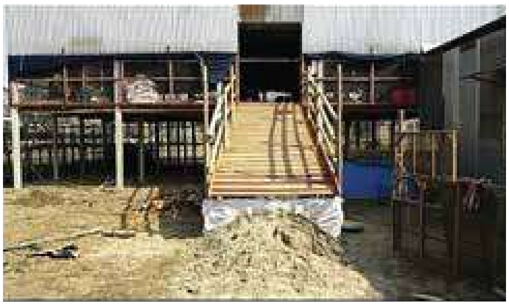

- ঘর তৈরীর উপকরণ ঃ বাঁশের খুঁটি ৯টি, টিন ৩টি, কাঠ ৫ সিএফটি, জালি ৪৮ বর্গফুট বাঁশের বেড়া ৪৮ বর্গফুট।
- উক্ত উপকরণ দিয়ে একটি ঘর তৈরী করতে প্রায় ৬,০০০/- টাকার মত খরচ হবে এবং ৬ থেকে ৭টি ভেড়া পালন করা যাবে।
- এই প্রক্রিয়ায় ভেড়ার ঘর তৈরি করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র খামারীরা ভেড়া পালন করছে।

ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ভেড়ার খাদ্যের পরিমান ও গুণগতমান নির্ভর করে চারণ ভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও গুণগতমানের উপর। বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুসরণ করতে হয়।

ভেড়ার খাদ্যাভাস ঃ

- ভেড়া গরুর মত মাটিতে চরে খেতে পছন্দ করে।
- ভেড়া ছাগলের মত লতাপাতা সাইলেজ, হে, খড়, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেয়ে থাকে।
- ভেড়া সহজে নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়।
- খাদ্যাভাবের সময় এরা খড়, নাড়া ইত্যাদি খায়।
- ভেড়া পাকস্থলীর আয়তন, পাকস্থলীতে পানির পরিমাণ এবং খাদ্য-পচ্যতার সময় বাড়িয়ে দিয়ে খাদের পাচ্যতাকে প্রায় ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে।
- বাংলাদেশে অধিকাংশ এলাকায় গবাদি পশুর ঘনত্ব বেশি কিন্তু চারণ ভূমি নেই। এসব স্থানে গবাদিপশু সাধারণত বেধে পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যেসব বাড়ীর আশেপাশে কিছু জায়গায় আছে সে সব জায়গায় ঘাস/পাতা উৎপাদন করা যায়। এতে একদিকে যেমন ভোড়া/ছাগল/গরুর জন্য ঘাস পাওয়া যায়, তেমনি বাড়ী ঘর ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি জ্বালানী হিসেবে ডাল/পাতা/ঘাস ব্যবহার করা যায়।

এক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বহুবর্ষজীবী ঘাস যেমন- হাই ব্রীড নেপিয়ার, পারা, গিনি, স্পেনডিভা এবং ভূট্টা লিগিউম জাতীয় গুল্ম যেমন-ধইঞ্চা, অড়হর, বৃক্ষ যেমন-ইপিল, বাবলা ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

ভেড়ার দানাদার খাদ্য তালিকা নমুনা (%)

ক্রমিক নং	খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা ভেড়া	বাড়ন্ত ভেড়া	বয়স্ক ভেড়া
১	চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩০ %	১৫ %	১০ %
২	বিভিন্ন ধরণের ডাল ভাঙ্গা	৫ %	-	-
৩	চালের কুড়া	২৮ %	৪৫ %	৫০ %
৪	ডালের ভূষি (যে কোনো)	৭ %	১৫ %	১৫ %
৫	খৈল (তিল/সরিষা/নারিকেল)	২৫ %	২০ %	২০ %
৬	প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫%	১ %	১ %
৭	ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫ %	২.৫ %	২%
৮	লবণ	১%	১.৫ %	২ %

ভেড়ার মাংসের গুনগতমান ঃ

- ভেড়ার মাংস তুলানামূলকভাবে নরম, সুস্বাদু, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই। ভেড়ার মাংসে জিংক এবং আয়রনের পরিমান বেশী যা বাচ্চাদের শারীরিক গঠন বৃদ্ধি, টিস্যু পুনর্গঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া ভেড়ার মাংসে কারনিটাইন নামক আমিষ ফেটি এসিড থেকে শক্তি উৎপাদনের সাহায্য করে। কপার ম্যংগানিজ এবং সেলেনিয়াম নামক ট্রেস এলিমেন্ট ভেড়ার মাংসের ভিতর বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভেড়ার উল উৎপাদন ঃ

- আমাদের দেশের উৎপাদিত ভেড়ার পশমের রং খয়েরি, কালচে খয়রি, ধূসর বর্ণের হয়। পশম গুচ্ছের দৈর্ঘ্য ৪০-৫০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। এধরণের পশম দিয়ে কার্পেট, কম্বল, মাদুর প্রস্তুত করা হয়।

ভেড়ার পশম কাটা বা শেয়ারিং ঃ ভেড়ার পশম কেটে সংগ্রহ করাকে শেয়ারিং বলা হয়।

শেয়ারিং পদ্ধতিঃ

১. পশম ছাটার পূর্বে ভেড়াকে ভালকরে গোসল করিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শরীর যাতে ভিজা না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২. শেয়ারিং এর পূর্বে ভেড়াকে শুকনো ও পরিস্কার ঘরে রাখা উচিত।
৩. শেয়ারিং এর পূর্বে ভেড়াগুলোকে ১-২ ঘন্টা উন্মুক্ত খোলা জায়গায় রাখতে হবে।
৪. শেয়ারিং এর পূর্বে ভেড়াকে পাকা মেঝে অথবা কাঠের পাঠাতনে রাখতে হবে যাতে এর শরীর পরিস্কার থাকে।
৫. ভেড়াকে দাড়ানো অবস্থায় নিজের আয়ত্তে এনে শেয়ার করা যায় অথবা ভেড়ার চার পা বেধে শোয়ানো অবস্থায় শেয়ারিং করা যায়।

মেশিনের সাহায্যে ভেড়ার পশম শেয়ারিং

ইলেক্ট্রিক শেয়ারিং মেশিন

হস্তচালিত শেয়ারিং কাঁচি

সাধারণত দুই ধরনের যন্ত্র দিয়ে ভেড়ার পশম ছাটানো হয়। হস্ত চালিত ব্লেড শেয়ারার বা কিপার এবং ইলেকট্রিক্যাল বা বৈদুতিক মেশিন। ভেড়ার পশম কাটার জন্য ৮৫% ক্ষেত্রেই হস্তচালিত ব্লেড শেয়ারার দিয়ে পশম ছাটা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত হস্ত চালিত শেয়ারার দিয়ে পশম কাটা হলেও অধিকাংশ উন্নত দেশে পশম কাটার জনপ্রিয় মেশিন ইলেকট্রিক্যাল শেয়ারার দিয়ে ভেড়া শেয়ারিং বা পশম কাটা হয়।

ভেড়ার টিকাপ্রদান সিডিউল ঃ

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ	২য় ডোজ			
ক্ষুরারোগ			১ম ডোজ পলিভ্যালেন্টে			
পিপিআর				১ম ডোজ		
এন্টারোটক্সিমিয়া						১ম ডোজ
শিপপক্স					১ম ডোজ	

সেশন-৬৬

গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ও রোগবালাই পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- সুস্থ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য
- গবাদিপশুর রোগের কারণ
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগবালাই পরিচিতি
- ভাইরাস জনিত রোগবালাই পরিচিতি

স্বাস্থ্য ঃ

স্বাস্থ্য হলো প্রাণীর এমন একটি অবস্থা যেখানে দেহের কাঠামোগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং প্রাণীর বয়স, লিঙ্গ, কাজ এবং উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে তার সর্বোত্তম কার্যকারিতা।

WHO (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) অনুযায়ী স্বাস্থ্য হলো সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা এবং কেবলমাত্র নিছক রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতি নয়।

সুস্থ প্রাণির বৈশিষ্ট্য ঃ

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকা। নাক, মুখ, চোখ, কান পরিষ্কার থাকবে। নাকের উপরে মাজলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে থাকবে। লেজ ও কুজ সবসময় নড়াচড়া করবে। শরীরের তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির কম্পন স্বাভাবিক থাকবে। খাওয়া দাওয়ার রুচি থাকবে। পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে। মলমূত্র স্বাভাবিক থাকবে। রুমিনেন্ট খাওয়ার পর জাবর কাটবে। হাটা-চলাফেরা ও ওঠা-বসা স্বাভাবিক থাকবে। চামড়া, লেজ, শিং, কান বা শরীরের অন্য কোন অংশে কোন প্রকার খুঁত থাকবে না। গায়ের চামড়া ঢিলা হবে, মসৃণ ও তেলতেলে থাকবে। শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিক হারে মোটা হবে। মাথা চওড়া, ঘাড় চওড়া ও খাটো হবে। কপাল প্রশস্ত হবে। বুক প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে হবে। শিং খাটো, মোটা ও কোন ক্ষুত থাকবে না।

প্রাণির রোগ ঃ

প্রাণির শারীরিক সুস্থ অবস্থার কোন একটি ব্যতিক্রম ঘটাই প্রাণির রোগ। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় রাখার পরও প্রাণিটি তার স্বাভাবিক কার্য সম্পদন করতে ব্যর্থ হলে সে অবস্থায় প্রাণিটিকে রোগাক্রান্ত বলা যেতে পরে। এছাড়াও প্রাণির শরীর এর ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর সমন্বয়ে যে নিয়মিত কার্যকলাপ চলে তার আংশিক বা সম্পুর্ণ অপারগ অবস্থাকেও প্রাণির রোগ বলা যেতে পারে।

প্রাণির রোগের কারণ ঃ

বায়োলজিক্যাল এজেন্ট, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, মাইকোপ্লাজমা, পরজিবী, ফিজিক্যাল এজেন্ট, রাসায়নিক পদার্থ, বিপাকীয় ও অপুষ্টি জনিত কারণ, রোগ প্রতিরোধে গোলযোগ, বংশগত ও জন্মগত রোগ ।

ব্যাকটেরিয়া জনিত গবাদিপশুর রোগ ঃ

তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ওলান ফুলা প্রভৃতি গবাদিপশুর প্রধান ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগবালাই।

গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত রোগ ঃ

ক্ষুরা রোগ, র‍্যাবিস, ইফিমেরাল ফিভার, লাম্পি স্কিন, পিপিআর, একথাইমা, গোট পক্স, প্রভৃতি গবাদিপশুর প্রধান ভাইরাসজনিত রোগবালাই।

রোগের প্রকারভেদ ঃ

- অসংক্রামক রোগ ঃ পুষ্টির অভাব বা বিষক্রিয়া জনিত রোগ যেমন দুধজ্বর, কেটোসিস, হাইপোম্যাগনেসেমিয়া, প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া, হোয়াইট মাস্‌ল ডিজিজ, পেট ফাঁপা, হাড়ভাঙ্গা; মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ, কীটনাশক, বিষাক্ত গাছ-গাছড়া ভক্ষণ, ইত্যাদি।
- সংক্রামক রোগ ঃ তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ধনুষ্টংকার, ওলান ফুলা, যক্ষা, আই.বি.আর., ক্ষুরা রোগ, ভাইরাল ডাইরিয়া, পি.পি.আর. ইত্যাদি। এসব রোগ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে।
- পরজীবি জনিত ঃ আঠালি, উকুন, ছারপোকা, মাছি ইত্যাদি।
- পরজীবি জনিত রোগের জীবাণু সমূহ ঃ কলিজা কৃমি, চিড় কৃমি, হুক ওয়ার্ম, ফিতা কৃমি, চোখ কৃমি, স্টমাক ওয়ার্ম, সিস্টোসোমা, কাউর ঘা ইত্যাদি।
- রক্তে এককোষি প্রাণী ঃ বেবিসিয়া, এনাপ্লাজমা, থাইলেরিয়া ইত্যাদি।
- চামড়ার বাহিরের পরজীবি ঃ আঠালি, উঁকুন, ছারপোকা, ম্যাগট বা মাছির ডিম ইত্যাদি।

সেশন-৬৭

গবাদিপশুর ক্ষুরা, লাম্পি স্কিন ও পিপিআর রোগ পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ক্ষুরা, লাম্পি স্কিন ও পিপিআর রোগ সম্পর্কে ধারণা
- ক্ষুরা, লাম্পি স্কিন ও পিপিআর রোগের কারণ
- ক্ষুরা, লাম্পি স্কিন ও পিপিআর রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার

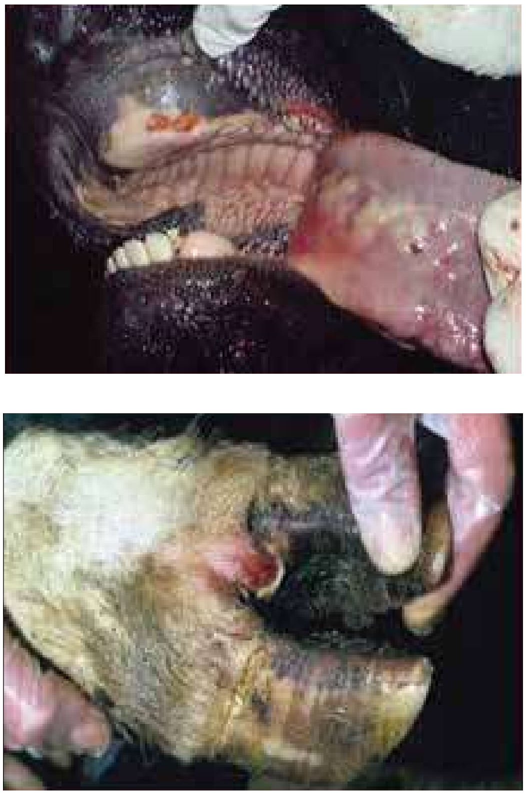

ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত পশু

ক্ষুরা রোগ ঃ

প্রচলিত নাম ঃ ক্ষুরা পাকা, তাপরোগ, খুরুয়া, এঁসো, জ্বরা প্রভৃতি। ক্ষুরা রোগ দ্বি-বিভক্ত ক্ষুরা বিশিষ্ট গবাদিপশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত গবাদিপশুর মুখে এবং গায়ে ঘা হয় এবং দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

রোগের কারণ ঃ এফথোভাইরাস গোত্রের ভাইরাস ক্ষুরা রোগের জন্য দায়ী। জীবাণুটির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এর ৭টি ভিন্ন ধরনের টাইপ রয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন স্ট্রেইন তৈরী করে। তাই টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য।

রোগের লক্ষণ ঃ

ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত গবাদিপশুর দেহে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত। প্রাণি খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায় এবং শরীর অবশ হয়ে পড়ে। এসময় মুখ মন্ডলের অভ্যন্তরে প্রদাহ হয় । যার ফলে মুখের ভিতরে জিহ্বা, ঠোঁট, মাড়ি, তালু, স্তনের বাট এবং পায়ের ক্ষুরায় ঘা, ফোস্কা প্রভৃতি দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যু হার খুবই বেশী।

প্রতিকার ঃ

রোগ প্রতিরোধ অত্যন্ত জটিল। আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে শুকনো স্থানে রাখতে হবে। রুগ্ন পশুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষুরা রোগে মৃত পশুকে ৬ ফুট মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য নিকটস্থানীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল থেকে ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হবে।

লাম্পি স্কিন রোগ ঃ

লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি চর্মরোগ যা শুধু গরু ও মহিষে হয়। গবাদিপশুতে আফ্রিকার জাম্বিয়াতে এ রাগটি ১৯২৯ সালে প্রথম দেখা যায়। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে এ রোগটি প্রথম শনাক্ত হয়। যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে।

লাম্পি স্কিন রোগের লক্ষণ ঃ

- ✓ প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত প্রাণীর জ্বর ১০৪-১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। ফলে ব্যথা, খাবার গ্রহণে অরুচি দেখা দেয়। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে বিভিন্ন জায়গায় গোলাকার গুটি বা ফোস্কা দেখা দেয়।
- ✓ পায়ে এবং শরীরের নিম্নাংশ ফুলে পানি জমা হয় এবং প্রাণি খুঁড়িয়ে হাটে।
- ✓ শেষ পর্যায়ে কয়েকটি গুটি বা ফোস্কা ফেটে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়।

রোগটি যেভাবে ছড়ায় ঃ

- ✓ মশা, মাছি, আঠালী এবং মাইটের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত এক প্রাণি হতে অন্য প্রাণিতে ছড়ায়।
- ✓ আক্রান্ত প্রাণী এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহনের মাধ্যমে রোগটি ছড়াতে পারে।
- ✓ আক্রান্ত প্রাণীর লালা ও দুধ এবং আক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শের মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।
- ✓ আক্রান্ত প্রাণি পরিচর্যাকারী, চিকিৎসক বা ভেকসিন প্রদানকারীর মাধ্যমেও রোগটি অন্য সুস্থ প্রাণিতে ছড়াতে পারে।

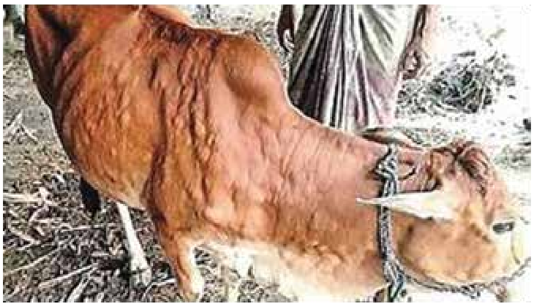

লাম্পি স্কিন ডিজিজে আক্রান্ত পশু

রোগের ক্ষতিঃ

আক্রান্ত গাভীর দুধের উৎপাদন কমে যায়, গর্ভপাত হয়, ওজন অনেকাংশে কমে যায় এমনকি বন্ধাত্ব হতে পারে। চামড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং মৃত্যুর হার ১০-১৫%। সঠিক পরিচর্যা ও যত্ন নিলে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই।

লাম্পি স্কিন ডিজিজ প্রতিরোধ বিষয়ে পরামর্শঃ

- ✓ খামার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
- ✓ খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কীট-পতঙ্গ, মশা, মাছি নিয়ন্ত্রণ করা।
- ✓ খামারে আক্রান্ত প্রাণির জন্য মশারীর ব্যবস্থা করা।
- ✓ আক্রান্ত প্রাণি দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে পৃথকভাবে চিকিৎসা করা।
- ✓ আক্রান্ত অঞ্চলে প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুস্থ্য না হওয়া পর্যন্ত চারণ ভূমিতে না নেওয়া।
- ✓ আক্রান্ত প্রাণির ক্ষতস্থান টিংচার আয়োডিন, পভিসেপ অথবা ০.১% পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্বারা সকাল বিকাল ধৌত করা।

ছাগল-ভেড়ার পিপিআর রোগ ঃ

পিপিআর ছাগল-ভেড়ার একটি মারাত্মক ভাইরাস জনিত রোগ। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং প্রাদুর্ভাব এলাকায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ছাগল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে ভেড়ার চেয়ে ছাগল এ রোগে বেশী সংবেদনশীল। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সব বয়সের ছাগল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে, এক বছর পর্যন্ত বয়সের ছাগল এ রোগে বেশি মারা যায়।

উচ্চ তাপমাত্রা, পাতলা পায়খানা (ডায়রিয়া) পানিশূন্যতা, শ্বাসকষ্ট (সর্দি) মুখে ঘা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পোষ্টমর্টেম পর্যবেক্ষণে ক্ষুদ্রান্তে জেব্রা স্ট্রাইপিং দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

পিপিআর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এর কোন চিকিৎসা নাই। নিয়ম মাফিক সুস্থ ছাগল ভেড়াকে পিপিআর টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

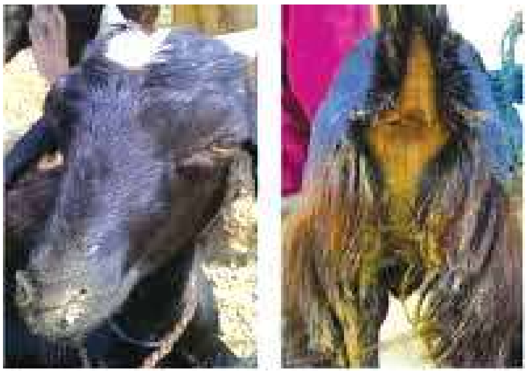

ভাইরাসজনিত রোগঃ পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

টিকা প্রদানঃ

প্রতি পশুকে ১ এম এল করে গলার চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়। ৪ মাস বয়সের পশুকে এ টিকা দেওয়া হয় তবে ২ মাস বয়সের পশুকেও এ টিকা দেওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে ৬ মাস বয়সে পুনরায় (বুষ্টার) টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

এই টিকার কার্যকাল ১ বছর।

সেশন-৬৮
গবাদিপশুর জলাতঙ্ক রোগ পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- জলাতঙ্ক রোগের বিস্তৃতি ও কারণ
- বিভিন্ন প্রাণিতে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমণ ও বিকাশ
- জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত প্রাণির লক্ষণ ও মৃত্যুর কারণ
- জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা

জলাতঙ্ক কী :

জলাতঙ্ক (Rabies) একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী (Warm Blooded) প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, গরু, মাংসাশি বন্যপ্রাণি, বাদুড় প্রধানত বেশি আক্রান্ত হয়। পাগলা কুকুরের কামড়ে সৃষ্ট এ রোগে প্রাণির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। প্রাণি উন্মাদ ও আক্রমণাত্বক হয় এবং পরবর্তীতে উর্ধমুখী অবশতা বা প্যারালাইসিস (Paralysis) দেখা দেয়। এ রোগে অন্ননালির উপরে অবস্থিত গহ্বর অর্থাৎ গলবিল বা ফ্যারিংসের (Pharynx) পেশির শিথিলতার কারণে পানি গ্রহণ করতে পারে না। এমতাবস্থায়, আক্রান্ত প্রাণি পানি দেখলে ভয় পায় বলে এ রোগের নাম দেয়া হয়েছে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia)।

রোগের বিস্তৃতি ঃ

জলাতঙ্ক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে।

রোগের কারণ ঃ

রেবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে।

জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত প্রাণি

সংক্রমণ ঃ

আক্রান্ত অথবা ভাইরাস বহনকারী প্রাণি অন্য কোনো প্রাণিকে কামড় দিলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সে ক্ষতস্থানে সদ্য নির্গত লালার মাধ্যমে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের দেশে প্রধানত পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ বিস্তারলাভ করে। বাদুড় এ রোগের জীবাণু বহন করে এবং কোনো প্রাণিকে কামড়ালে সে প্রাণি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাদুড়ে এ ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ না করে এ জাতীয় কলাতে বংশবিস্তার করতে পারে। এ অবস্থায় বাদুড় কোনো লক্ষণ প্রকাশ না করেই শরীরে ভাইরাস বহন করে এবং অন্য কোনো প্রাণিকে কামড় দিলে সহজেই এ রোগ সংক্রমিত হয়। বন্যপ্রাণির মধ্যে নেকড়ে, হায়েনা, বানর, বেজি, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির মাধ্যমেও এ রোগের বিস্তার ঘটে। শ্বাসনালি ও পৌষ্টিক নালির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে। গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে জলাতঙ্ক রোগের প্রকোপ বেশি। কারণ, এ সময় কুকুরসহ বন্যপ্রাণিরা প্রজননের উদ্দেশ্যে তৎপর থাকে বিধায় এদের আচরণ অত্যন্ত ক্ষীপ্ত ও হিংস্র হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

লক্ষণ অনুযায়ী জলাতঙ্ক প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা শিথিল রূপ ও উত্তেজিত রূপ।

শিথিল রূপ (Paralytic Form) ঃ

- এ প্রকৃতির জলাতঙ্কে গলা এবং চাবানোর জন্য ব্যবহৃত পেশি অবশ হয়ে যায়। মুখ থেকে প্রচুর লালা নির্গত হয় ও গলাধকরণ ক্ষমতা লোপ পায়। কুকুরের নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং কদাচিৎ দংশন করে। পরবর্তীতে সারা শরীর অবশ হয়ে যায় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

- গরু হাঁটার সময় পিছনের পায়ের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যায়, লেজ নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং ডান অথবা বামে স্থানচ্যুত হয়। পিছনের পায়ের অনুভূতি কমে যায় এবং দুর্বলতার কারণে হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে যায়। জলাতঙ্কের লক্ষণ একবার দেখা দিলে অবধারিত পরিনতি মৃত্যু।
- লুটিয়ে পড়তে পারে। মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয় এবং মটিতে লুটিয়ে পড়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এবং লক্ষণ দেখা দেয়ার ৬ থেকে ৭ দিনের মধ্যে গরু মারা যায়।

উত্তেজিত রূপ (Furious Form) ঃ

এ ধরনের জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী কান্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়। এসব প্রাণির চক্ষুতারা প্রসারিত হয় এবং সকল প্রকার ভয়ভীতি লোপ পায়। এ অবস্থায় কোনো অবসতার লক্ষণ দেখা যায় না। আক্রান্ত কুকুর লক্ষণ প্রকাশের পর সাধারণত ১০ দিনের বেশি বাঁচে না। তবে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তাঘাটে মানুষ, গরু, অন্যান্য প্রাণি এমনকী চলন্ত বস্তুকে দংশন করে। এ পর্যায়ে আক্রান্ত প্রাণি বিষ্ঠা, খড়, লাঠি, পাথর ইত্যাদি অ-খাদ্য বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করে। এ রোগের আরও বিকাশ লাভের সাথে সাথে পেশির সমন্বয় হীনতা এবং খিঁচুনি পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়ে এবং প্রাণি মারা যায়।

মৃত্যুর কারণ ঃ

দংশনের পর ভাইরাস স্নায়ু তন্ত্রের মাধ্যমে যতই উর্ধমুখে উঠতে থাকে ততই স্নায়ু কোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ফলশ্রুতিতে শরীরে অবশতা পরিলক্ষিত হয়। এ জীবাণুর আক্রমণ মস্তিষ্কে পৌঁছলে উন্মাদনা, উত্তেজনা, ক্ষিপ্রতা ও খিঁচুনি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে শ্বসন কাজের জন্য নির্ধারিত স্নায়ু কোষ সমূহ ধ্বংস হলে শ্বসন কার্য বন্ধ হয়ে প্রাণি মারা যায়।

রোগের পরিণতি ঃ

জলাতঙ্ক একটি মারত্মক জীবনহরণকারী রোগ। এ রোগের লক্ষণ একবার দেখা দিলে অবধারিত পরিনতি মৃত্যু। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতঙ্কের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জলাতঙ্ক ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, দংশনের পরপরই ক্ষতস্থান ২০% কোমল সাবান পানি উত্তম রূপে ধৌত করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর টিকার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। তবে, জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুর কোনো প্রাণিকে দংশন করলে অনতিবিলম্বে এ রোগের প্রতিষেধক ব্যবহার করে জীবন রক্ষা করা যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ

রাস্তা-ঘাটের যাবতীয় বেওয়ারিশ কুকুর বিড়ালকে ভ্যাকসিন করতে হবে। সকল পোষা কুকুর বিড়ালকে যথারীতি প্রতিষেধক দিতে হবে। ইউরোপে বন্যপ্রাণীর মধ্যে শিয়াল ৮৫% রোগ সংক্রমিত করে। আমাদের দেশেও এ রোগ বিস্তারে কুকুরের পরেই শিয়ালের স্থান। কাজেই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিয়াল থেকে গবাদি প্রাণিকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে জলাতঙ্ক রোগের জন্য দু-প্রকার টিকা বা ভ্যাকসিন রয়েছে। লেপ (LEP = Low Embryo Passage) টিকা কুকুরে ও হেপ (HEP = High EmbryoPassage), টিকা গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা হয়। এসব টিকা প্রয়োগ করলে প্রাণি এক বৎসর পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

সেশন-৬৯

গবাদিপশুর বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগ পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগ সম্পর্কে ধারণা
- বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগের সংক্রমণ ও লক্ষণ
- বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগ প্রতিরোধ

বাদলা রোগ ঃ

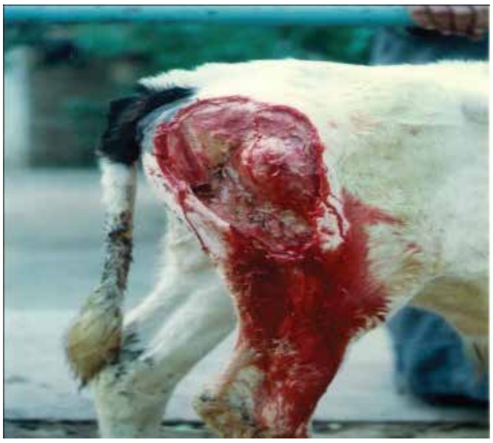

বাদলা রোগ বাড়ন্ত বয়সের রোমন্থক প্রাণির একটি তীব্র প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রামক রোগ। এটি মাটিবাহিত রোগ, তবে ছোঁয়াচে নয়। এ রোগে প্রধানত প্রাণির পা আক্রান্ত হয় ও আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। তাই একে ইংরেজিতে ব্ল্যাক লেগ বলে। এছাড়াও এ রোগকে ব্ল্যাক কোয়ার্টার নামে অভিহিত করা হয়। এ রোগটি সাধারণত বর্ষাকালে হয় বলে বাংলাদেশে এটিকে বাদলা রোগ বলে। প্রধানত বাড়ন্ত বয়সের গরু ও ভেড়াই এতে বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত প্রাণির সঞ্চালক পেশিতে পচনশীল বা গ্যাংগ্রিনাস প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এ স্থান হতে জীবাণুর বিষ রক্তে মিশে মারত্মক ধরনের টক্সিমিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অধিকাংশ প্রাণি মারা যায়। ক্ষতস্থানে গ্যাস সৃষ্টি হয়, যা টিপলে পচ্ পচ্, ভজ্ ভজ্, কর্ কর্ বা পুর পুর শব্দ অনুভূত হয়। সাধারণত ২ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত প্রাণিতে অতি তীব্র এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ হতে পারে। অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত প্রাণি হঠাৎ করে পড়ে মারা যায়। তবে, অনেক সময় প্রাণি ১-২ ঘন্টা বাঁচতে পারে। প্রাণি কিছু খাবে না। দেহে ৪০°-৪১.৭° সে. (১০৪°-১০৭° ফা.) জ্বর থাকবে।
- লোম খাড়া হবে। অবসাদ গ্রস্থ দেখা যাবে। পেটে গ্যাস জমবে। মুখবন্ধনি বা মাজল শুষ্ক থাকবে। চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে। পিঠ কুঁজো হবে। হাঁটতে চাবে না এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

তীব্র প্রকৃতির রোগে-

১. অতি তীব্র প্রকৃতির রোগের লক্ষণ ছাড়াও মাংসপেশি আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণি হাঁটতে পারবে না, খুঁড়িয়ে হাঁটবে। এটি এ রোগের কার্ডিনাল বা রোগ সনাক্তকারী চিহ্ন। আক্রান্ত মাংসপেশি স্ফীত, গরম ও ব্যাথাপূর্ণ হবে।

২. আক্রান্ত এ ফোলা মাংসপেশি টিপলে পচ্ পচ্, ভজ্ ভজ্ বা পুরপুর শব্দ অনুভূত হবে।

৩. শেষ অবস্থায় এ ফোলা মাংসপেশি ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয় এবং প্রাণি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে উঠতে পারে না।

৪. লক্ষণ প্রকাশের ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রাণির মৃত্যু ঘটে।

৫. মৃত্যুর পূর্বে দেহের তাপ হ্রাস পায়।

গলাফোলা রোগঃ

পৃথিবীতে গরু ও মহিষের যতগুলো মারত্মক সংক্রামক রোগ রয়েছে গলাফোলা তাদের মধ্যে অন্যতম। রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বলে পানি বা ইডিমার জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তদুষ্টি ও দেহের সকল সিরাম ও মিউকাস পর্দার নিচে অবস্থিত কৈশিক নালিসমূহ থেকে রক্তপাত হয় বলে একে হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া বলে। এ রোগে গলা ও গলকম্বল ফুলে যায় বলে স্থানীয় ভাষায় একে গলাফোলা, ঘটু, গলাবেরা বা গলাফাঁস নামে ডাকা হয়। এছাড়াও এ রোগকে বারবোনবলা হয়। বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং শীতকালীন বৃষ্টির সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণত মড়ক আকারে দেখা দেয়। তবে, অন্যান্য সময়ও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

গলাফোলা রোগ অতিতীব্র ও তীব্র দুই প্রকৃতির হতে পারে।

অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ

এ প্রকৃতির রোগে তড়কা রোগের মতো প্রাণি হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারে। কোনো কোনো প্রাণি ৬-১২ ঘন্টা পর মারা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জ্বর, ক্ষুধামন্দা, নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়া, নিস্তেজ হওয়া, পাতলা পায়খানা করা প্রভৃতি দেখা যায়। অবশেষে প্রাণি মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ

তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত প্রাণিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন- দেহে ৪০.৬°-৪১.৭° সে. (১০৫°-১০৭° ফা.) জ্বর ওঠে। প্রাণি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থাকে। নাক দিয়ে পানি ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়ে। ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। এভাবে ২৪ ঘন্টা পার হলেই গলার নিচে ফুলতে থাকে। এ ফোলা ক্রমশ বুক এবং পেট পর্যন্ত যেতে পারে। কখনও কখনও চোয়াল ও কানের অংশও ফুলতে পারে। অনেক সময় প্রাণির জিহ্বা ফুলে যায় এবং তা লাল হয়। এ সময় এরা মুখ হা করে রাখে বা জিহ্বা বের হয়ে পড়ে। এসব ফোলা জায়গা শক্ত ও গরম থাকে, টিপলে প্রাণি ব্যাথা পায়, সুচ দিয়ে ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হয়। গলার এ স্ফীত অংশ স্বরযন্ত্র ও গলবিলের উপর চাপ দেয় বলে প্রাণির শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই মুখ হা করে শ্বাস নেয়। শ্বাস ত্যাগের সময় গলার ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হয়, যা বেশ দূর থেকে শোনা যায়।

আক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা বিলম্বে হলে কোনো ওষুধে সুফল পাওয়া যায় না। তাই রোগ লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

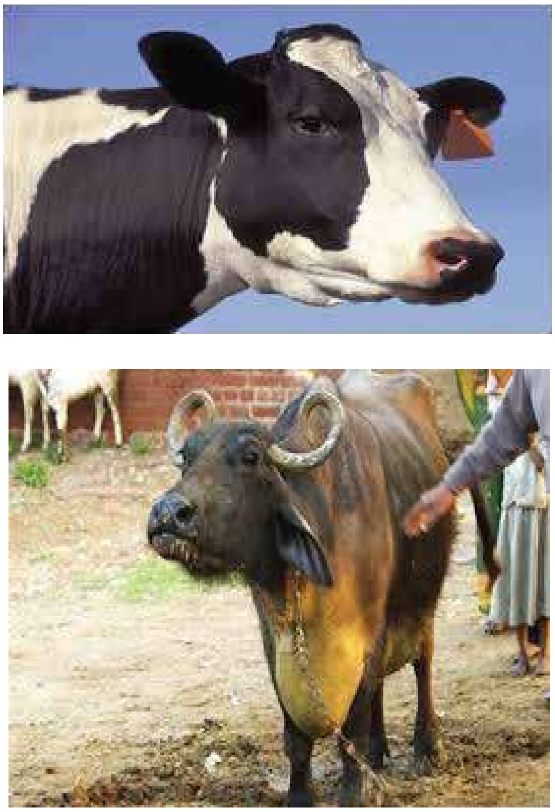

গলাফোলা রোগ

তড়কা রোগ ঃ

তড়কা রোগ প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ। সেপ্টিসেমিয়া ও হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মানুষসহ যে কোনো ধরনের প্রাণি আক্রান্ত হতে পারে। ইংরেজিতে এ রোগকে অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) বলে। আক্রান্ত প্রাণি হঠাৎ মারা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে থাকে। নাক, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো বর্ণের (আলকাতরার মতো) রক্ত বের হতে থাকে। মৃত দেহে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মর্টিস (Rigor Mortis) হয় না।

রোগ সংক্রমণ ঃ

বিভিন্ন ভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যথা- প্রধানত দুষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও স্পোর সংক্রমিত হতে পারে। ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়। কীটপতঙ্গের মাধ্যমে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ জীবাণু সংক্রমিত হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ

আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা, সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে তড়কা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বছরে একবার নির্ধারিত মাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

- ✓ এ রোগে মৃত পশুর কোনো ময়না তদন্ত বা কাটাছেঁড়া করা যাবে না। কারণ, জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই স্পোরে পরিণত হয়। তাই মৃত পশুর দেহের সকল স্বাভাবিক ছিদ্রপথ তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে মরদেহ পচনের সাথে সাথে জীবাণুরও মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এ রোগে মৃত পশুকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাপ্ত কলিচুন সহকারে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটির উপরে কাঁটাজাতীয় কোনো গাছের ডাল পুতে দিতে হবে যেন সেখানে লোকজন বা পশু চলাচল না করে।
- ✓ স্পোর সৃষ্টির পূর্বেই মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে গরম ১০% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (৬০° সে.) দিয়ে ধৌত করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। ভেটেরিনারি ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগঃ তড়কা রোগে মৃত গরু

বাদলা, গলাফুলা ও তড়কা রোগ প্রতিরোধ ঃ

এসব রোগ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কারণ, এ রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণির দেহে থাকে। তবে, নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে এসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা-

- ✓ অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে পৃথক করে চিকিৎসা করাতে হবে।
- ✓ অসুস্থ প্রাণিকে স্থানান্তর বা বাহিরে নেওয়া যাবে না।
- ✓ অসুস্থ প্রাণির সংস্পর্শে যেগুলো ছিল তাদেরকে অ্যান্টিসিরাম বা দীর্ঘস্থায়ী টেট্রাসাইক্লিন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। অন্যান্য প্রাণিকে প্রতিশেধক টিকা দিতে হবে।
- ✓ মড়কের সময় প্রাণির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ✓ প্রাণিকে একস্থান থেকে অন্যস্থান বা একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরের সময় পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাণির পরিচর্যায় বিশেষ ব্যবস্থা গহণ করতে হয়।
- ✓ শুষ্ক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাণি পালন করতে হবে।
- ✓ মৃত প্রাণিকে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে বা পোড়াতে হবে। মাঠে ফেলে দেয়া চলবে না বা মুচি দিয়ে চামড়া ছাড়ানো উচিত হবে না।
- ✓ বছরে কমপক্ষে একবার গরু মহিষকে বাদলা ও গলাফোলা রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ রোগ প্রতিরোধে গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে।

সেশন-৭০

গবাদিপশুর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ সুস্থ প্রাণির বৈশিষ্ট্য
- ➢ রোগজীবানু কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে
- ➢ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

সুস্থ প্রাণির সাধারন বৈশিষ্ট্য ঃ

১. চটপটে, সক্রিয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সবন্ধে সচেতন। নিয়মিত পদক্ষেপে চলবে।

২. দৈহিক কাঠামো সুন্দর, চামড়া মসৃণ, চকচকে, ঢিলা থাকবে।

৩. পা শরীরের তুলনায় খুব বেশী ছোট বা বড় হবে না, পেট মোটা হবে না।

৪. পিঠ লম্বা ও সরল রেখায় থাকবে, চোখ থাকবে উজ্জল এবং চোখের কোনায় কোন প্রকার ক্ষরণ বা পিচুটি থাকবে না, কান থাকবে খাড়া।

৫. মাছি তাড়াতে সবসময় লেজ নাড়াবে, শ্বাস-প্রশ্বাস হবে মন্থর ও নিয়মিত, বিশ্রামের সময় নিয়মিত ‘জাবর’ কাটবে।

রোগ বিস্তারের কারণ ঃ

অসুস্থ্য গবাদি পশুর পায়খানা প্রসাব, লালা, চোখের/নাকের পানি, কাঁশি এবং এসব হতে নি:সৃত তরল পদার্থ দ্বারা রোগজীবানু বের হয়ে যে কোন খাদ্য, যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক জিনিসপত্র দূষিত করতে পারে। বাতাসে বাহিত হতে পারে এমনকি মাটি, পানি দূষিত করে ছড়াতে পারে। দূষিত বস্তুতে রোগ-জীবাণু অনেক দিন বিশেষ করে তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগের জীবাণু ২০ বৎসর পর্যন্ত মাটিতে সক্রিয় থাকতে পারে। ক্ষুরা রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে কয়েক মাইল দূরেও সক্রিয অবস্থায় যেতে পারে।

রোগ-জীবাণু যেভাবে শরীরে প্রবেশ করে ঃ

- ✓ দূষিত বায়ু, পানি ও খাদ্য গ্রহন করলে, খাদ্যের পাত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি অপরিস্কার অবস্থায় ব্যবহার করলে জীবাণু খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- ✓ পোকা-মাকড় যথা ঃ মশা-মাছি, আঠালী ও উকুনের আক্রমণের ফলে রক্ত শোষনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।
- ✓ সুস্থ গবাদি পশু অসুস্থ গবাদি পশুর সংস্পর্শে আসলে ও প্রজননের মাধ্যমে।
- ✓ বাছুরের দেহে মায়ের দুধের মাধ্যমে বা গর্ভাবস্থায় প্লাসেন্টাল রক্তনালীর মাধ্যমে।
- ✓ ইনজেকশন/ভ্যাকসিনের সময় একই সূঁচ অসুস্থ ও সুস্থ উভয় প্রাণিতে ব্যবহার করলে।

রোগ বিস্তারের সহায়ক কারণসমূহ ঃ

- ✓ বাতাসে আর্দ্রতা (৮০% ভাগ পানি), তাপমাত্রা (২৬ ডিগ্রী সেঃ) ও পারিপার্শ্বিক নোংরা অবস্থা।
- ✓ পুষ্টির অভাবে অর্থাৎ গবাদিপশু পরিমিত খাদ্য না পেলে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ✓ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শীত জনিত কারণে শরীর দুর্বল হলে।
- ✓ কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় শরীরের শক্তি কমে গেলে।
- ✓ গর্ভবতী অবস্থায় সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি না পেলে গাভী ও তার পেটের বাচ্চা সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে।
- ✓ শরীরে রোগ জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে উক্ত রোগের লাইভ/ইনএকটিভেটেড ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হলে।
- ✓ গবাদিপশুর আবাসস্থলে বা চারণ ভুমিতে বন্য/অন্যান্য জীবজন্তু পাখি, পোকমাকড়, মশা, মাছি কেঁচো ইত্যাদি অবাধে চলাফেরা করলে বা বেশী পরিমাণে/সংখ্যায় থাকলে রোগ জীবাণু সহজেই বিস্তার লাভ করে।
- ✓ মৃত গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি মাঠে, নদী, ডোবায় বা রাস্তার ধারে ফেলে রাখলে।
- ✓ পরিবহনের সময় সঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে, পরিবহন নোংরা থাকলে এবং একই বাহনে সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণি বহন করলে।
- ✓ হাট বাজারে বা বন্যার সময় গাদাগাদি করে বা অপরিস্কার অবস্থায় সুস্থ্য ও অসুস্থ্য গবাদিপশু একসাথে জড় করলে।

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

১. নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন পশুর কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।

২. বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় জুতা পরিবর্তন এবং জীবাণুনাশ পদার্থ গুলানো পানিতে পা ডুবিয়ে নিতে হবে।

৩. যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মত দিতে হবে। নিজের খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী খামার বা পশু সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।

৫. কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার পশু পাখী বা পশু পাখী জাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি ইঁদুর ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।

৭. খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে, ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে প্রাণি চিকিৎসকের মতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে পশুর মরদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

সংক্রামক রোগঃ

সংক্রামক রোগ বলতে সেই সব রোগ বুঝায়, যেসব রোগ একজন থেকে আর একজনের শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে। এই ছড়িয়ে পড়তে শুধু মানুষ থেকে মানুষ নয়, পশুপাখি থেকে মানুষে, পশুপাখি থেকে পশুপাখির মাঝে, কিংবা মানুষ থেকে পশুপাখির মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গবাদিপশুর রোগ দমনের মূলনীতি ঃ

১. প্রতিরোধঃ ফার্মে রোগ হতে না দেয়া। যেমন- টীকা প্রদান

২. রোগ দমণ/ হ্রাসকরণঃ কোন ফার্মে রোগের বিস্তারকে কমিয়ে নিয়ে আসা।

৩. রোগ অপসারণঃ রোগের ব্যাপকতাকে এমন পর্যায়ে কমিয়ে নিয়ে আসা যেখানে লাখে ১ টি পশু রোগে আক্রান্ত হয়।

৪. নির্মূল/উচ্ছেদ : রোগের ব্যাপকতাকে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে আসা/ চিরতরে নির্মূল করা।

রোগের ধারকের নিয়ন্ত্রণ :

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ

খ) স্থানীয় স্বাস্থ্য- প্রশাসন ও কর্মীর মাধ্যমে কোন রোগকে নোটিশ করা

গ) ইপিডিমিওলজিক্যাল পর্যবেক্ষন-

- ✓ সংক্রমণের উৎস নির্ণয়করণ
- ✓ সংক্রমণের উপাদান নির্ণয়করণ, যেমন- পরিবেশ, জনসংখ্যা

ঘ) পৃথকিকরণঃ রোগ বিস্তারের সময়ে রোগ আক্রান্তপশুকে পৃথক করে রাখা।

ঙ) চিকিৎসাঃ চিকিৎসার মাধ্যমে জীবানুকে ধ্বংস করা।

চ) সঙ্গ নিরোধঃ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভাব্য রোগ আক্রান্ত (অনুমেয়) পশু-পাখিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথক করে রাখা ।

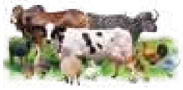

সেশন-৭১

গবাদিপশুর টিকাবীজের পরিচিতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গবাদিপশুর টিকা পরিচিতি
- টিকা প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ

টিকাবীজ, সিরিঞ্জ, নিডিল, ভ্যাকসিন গান, কুল বক্স, ডায়লুয়েন্ড, এন্টিসেপটিক, কটন,

প্রাণিঃ

গরু/ছাগল

প্রশিক্ষক গবাদিপশুর টিকাবীজ সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণার্থীদের টিকা পরিচিতি, টিকা প্রস্তুত পদ্ধতি এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিজ হাতে শেখাবেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উৎপাদিত গবাদিপশুর টিকা বীজ

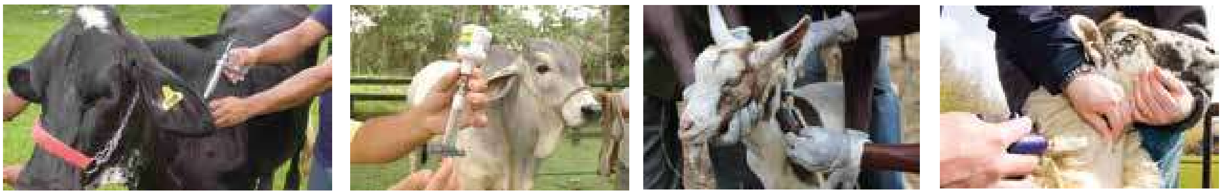

গবাদিপশুর বিভিন্ন টিকা বীজ প্রয়োগ পদ্ধতি

সেশন-৭২

উন্নত ও বাণিজ্যিক মুরগির জাত পরিচিতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- উন্নত ও সংকর মুরগি জাত পরিচিতি
- ডিম পাড়া স্ট্রেইন সমূহের পরিচিতি
- মাংস উৎপাদনকারী স্ট্রেইন সমূহের পরিচিতি

উন্নত জাতের মুরগি ঃ

উন্নত জাতের মুরগির উৎপাদনশীলতা বেশি। দেশী বা স্থানীয় জাতের মুরগির মাংস ও ডিমের উৎপাদনশীলতা কম। বাংলদেশের উন্নত জাতের মুরগির মধ্যে হোয়াইট লেগ হর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড (আর.আই.আর), ফাইওমি জাতের মুরগি বেশি পালন করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় এসব জাতের মুরগি বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়ে থাকে।

রোড আইল্যান্ড রেড (আরআইআর) ঃ

আরআইআর জাতের মুরগির উৎপত্তিস্থল আমেরিকায়। এ জাতের মোরগ ২-৩ কেজি এবং মুরগী ১.৫-২ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়। দেহের পালক লাল কিন্তু লেজের দিকের পালক, গলা এবং ডানার পালক কিছুটা কালো। এদের ডিম উৎপাদনের হার মোটামুটি ভাল। ডিমের রং বাদামী। বর্তমানে উন্নত দেশে বাদামী রঙের ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাত সৃষ্টির জন্য এ মুরগী ব্যবহার করা হয়। এরা আমাদের দেশে বছরে ১৫০-২০০ ডিম দিয়ে থাকে।

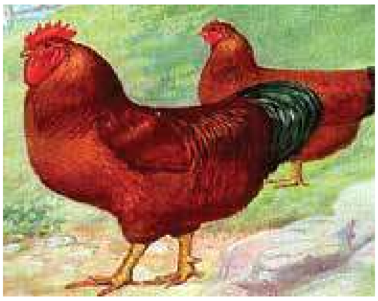

আর আই আর

হোয়াইট লেগহর্ণ ঃ

হোয়াইট লেগহর্ণ জাতের মুরগির উৎপত্তিস্থল ইতালিতে। ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পৃথিবীর সব দেশেই খুব জনপ্রিয়। ধবধবে সাদা পালক দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। কানের লতি ও ঝুটি উভয়ই লাল। এ জাতের মোরগ ১.৫-২ কেজি এবং মুরগী ১-১.৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়। ডিমের আকার বেশ বড়। বছরে প্রায় ৩০০টি ডিম দেয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন পোল্ট্রি খামারে ব্যাপক পালন করা হচ্ছে। কৃষক পর্যায়েও পালন করা সম্ভব।

হোয়াইট লেগহর্ন

ফাইওমিঃ

এ জাতের মুরগির উৎপত্তিস্থল মিশরে। এরা আকারে প্রায় দেশী মুরগীর মত। মোরগ ওজনে ১.৫-২ কেজি এবং মুরগী ১-১.১৫ কেজি পর্যন্ত হয়। এদের গলার দিকে ধূসর কিন্তু সমস্ত শরীরে সাদা কালো রংয়ের মিশ্রণ। এরা খুব চঞ্চল ও চালাক। দেশী মুরগির মত এদের ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। এদের কানের লতি সাদা। মাথার ঝুঁটি আকরে ছোট, বেজোড় এবং লাল। ফাইওমি মুরগি বছরে ২০০-২৫০টি ডিম দেয়

ফাইওমি

হাইব্রিড জাতের মুরগি ঃ

লেয়ার বা ডিম পাড়া মুরগির স্ট্রেইনসমূহ ঃ লোহম্যান হোয়াইট, ইসা ব্রাউন, ব্যাবকক, বিভি -৩০০, ব্যাবলোনা হারকো ব্যাবলোনা টেট্রা, হাবার্ড ব্রাউন, বাভান্স নেরা, ইসা ব্রাউন, ষ্টারক্রস ব্রাউন, হাইসেক্স ব্রাউন, সেভার ব্রাউন, ইসারোজ, গোল্ড লাইন ইত্যাদি।

ব্রয়লার বা মাংস উৎপাদনকারী স্ট্রেইনসমূহ ঃ

সেভারষ্টার ব্রো, সেভার মাষ্টার, ভেনকব, ইসা ভেডেট, ইসা আই ৭৫৭, ইসা এসপিকে, লোহম্যান মিট, রস- ১০০, হাইব্রো, হাবার্ড ক্লাসিক।

ইসা ব্রাউন(লেয়ার)

ব্যাবকক (লেয়ার)

সেভারষ্টার ব্রো (ব্রয়লার)

সোনালী মুরগি ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় মুরগি খামারে ১৯৯৬-২০০০ সন পর্যন্ত নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে আরআইআর জাতের মোরগ এবং ফাইওমি জাতের মুরগীর সংকরায়ণ ঘটিয়ে সোনালি জাতের মুরগি উদ্ভাবন করেছে।

সোনালী মুরগির বৈশিষ্ট্য ঃ

মোরগের গায়ের রং সোনালির মধ্যে কালো, পাখায় সাদা ফোটা ফোটা থাকে। মুরগির গায়ের রং লালচে কালো । আকারে মাঝারি। ডিমের খোসা ক্রিম বর্ণের। সোনালী মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম দিয়ে থাকে। সোনালী মুরগি দেশী মুরগির মত ছেড়ে পালন করা যায়। এ জাতের মুরগির ডিম ও মাংসের স্বাদ দেশী মুরগির মত বলে এ জাতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

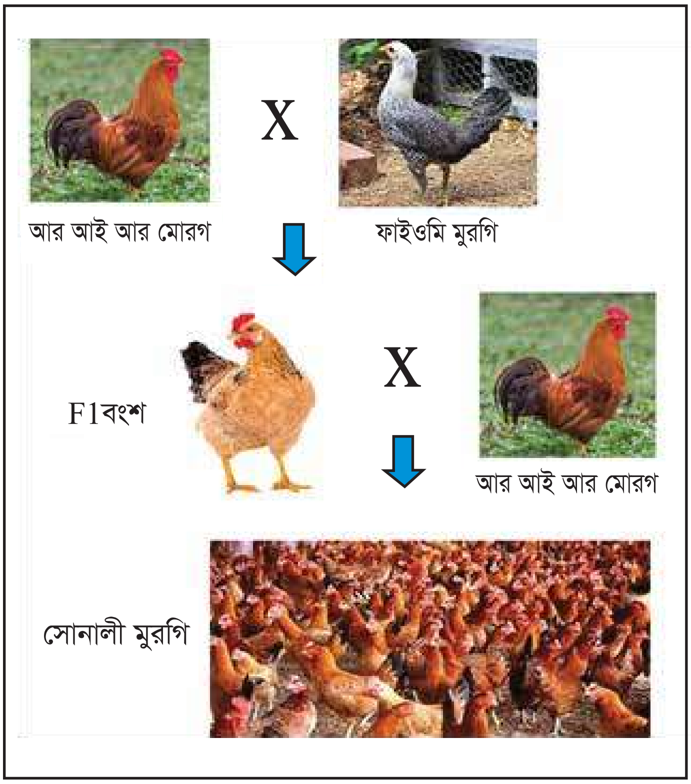

সেশন-৭৩

লেয়ার মুরগি ও ব্রয়লার মুরগি পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ লেয়ার মুরগি জাত পরিচিতি
- ➢ বাসস্থান, খাদ্য ও পালন ব্যবস্থাপনা
- ➢ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের দারিদ্র বিমোচনে তথা আত্ম-কর্মসংস্থান ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি লাগসই যুগোপযোগী লেয়ার মুরগি পালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে একজন ক্ষুদ্র খামারী ২০০টি লেয়ার মুরগী পালন করে তার পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাসহ দৈনন্দিন সাংসারিক খরচাদি ও সন্তান সন্ততির শিক্ষাসহ যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বৎসরে প্রায় ৮০০০-৯০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে। এই মডেল আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাসস্থানঃ

ঘর নির্মাণঃ ২০০ টি মুরগী পালনের জন্য প্রতিটি মুরগীর জন্য প্রায় ১.৫২ বর্গফুট জায়গা ধরে ঘড় তৈরী করতে হবে। ঘরের মেঝে থেকে সাড়ে ৩ ফুট জায়গা তার, জালি অথবা বাঁশের জালি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে কুকুর বিড়াল এবং অন্য কোন বন্য প্রাণী খাঁচার নীচে প্রবেশ করতে না পারে। ঘড়টি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা হবে এবং উল্টর-দক্ষিন খোলা হবে। ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। টিন ব্যবহার করলে টিনের নীচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে।

খামারের স্থান নির্বাচনঃ

উঁচু এবং ভাল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, আশপাশ পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত, অন্য খামার থেকে নিরাপদ দুরত্বে বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ যোগাযোগের ও লিটার সরিয়ে ফেলার ভাল ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্তকরণঃ

১ম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিস্কার, ৩য় ও ৪র্থ দিন সকালে জীবানুনাশক (আয়োসান, ভিরকন এস) দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং সর্বশেষ পরিস্কার পানি দ্বারা ধুঁয়ে ফেলতে হবে। ঘরে মুরগীর বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমাক্তকরণ করতে হবে।

বাচ্চা ক্রয়ঃ

একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা স্থানীয় কোন নামকরা হ্যাচারী থেকে ক্রয় করতে হবে। লেয়ার স্টেইনগুলোর মধ্যে রয়েছে হাই-লাইন ব্রাউন, বিভি ৩০০, স্টারক্রস-৫৭৯, হাইলাইন, ইসা ব্রাউন, ব্রাউন নিক, হাই সেক্স ব্রাউন, ষ্টারক্রস-২৮৮, হাইসেক্স হোয়াইট ইত্যাদি।

বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনাঃ

বাচ্চা ঘরে উঠানের কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডিং এর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাসের চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বিএলআরআই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়। সাধারণত ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চিক গার্ড হোভার থেকে ২.০-২.৫ ফুট দূরে স্থাপন করা হয়। চিক গার্ডের জন্য হার্ডবোর্ড, বাঁশের চাঁটাই ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। সাধারণত ব্রুডারের ভিতর বাচ্চার অবস্থান তিনটি বাচ্চা ব্রুডারের

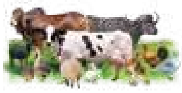

ভেতর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকবে অতিরিক্ত গরম অবস্থায় বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর চিক গার্ডের গায়ের দিকে সরে থাকবে। অতিরিক্ত ঠান্ডা অবস্থায় বাচ্চাগুলো হোভারের খুব কাছাকাছি চলে এসে গাদাগাদি করে থাকবে।

লেয়ার বাচ্চার প্রয়োজনীয় ব্রুডিং তাপমাত্রা

সপ্তাহ	তাপমাত্রা (ফাঃ)
১ম	৯৫°
২য়	৯০°
৩য়	৮৫°

সপ্তাহ	তাপমাত্রা (ফাঃ)
৪র্থ	৮০°
৫ম	৭৫°
৬ষ্ঠ	৭০°

বাড়ন্ত বাচ্চা পালনঃ

ব্রুডিং শেষে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময় কালকে বাড়ন্ত অবস্থা বলা হয়। বাড়ন্ত অবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত ডিম উৎপাদন। বাড়ন্ত কালীন সময়ে ঝাঁকের সমরূপতা (ঝাঁকের সব মুরগীগুলোর দৈহিক ওজন কাছাকাছি থাকা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্চার মধ্যে সমরূপতা আনায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সমরূপতা রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের স্থান অর্থাৎ খাদ্য পাত্রের সংখ্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ডিবেকিংঃ

ঠোকরাঠুকরির প্রবণতা দূর করার জন্য এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য দুইবার ডিবেকিং করা উচিত। প্রথমে ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। উপরে ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির রং কিছুটা সাদাটে এবং সূচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেটি কেটে বাদ দেয়া হয়।

প্রি-লেয়ার পালনঃ

সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগীকে প্রি লেয়ার বলা হয়। ২০ সপ্তাহ বয়সে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত আলো সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড সরবরাহ করতে হবে। পুলেট কালীন সময়ের শুরুতে মুরগীর ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

ডিম পাড়া মুরগী পালনঃ

ডিম পাড়াকালীন সময়ে আলো প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে ১৬ ঘন্টা আলোক প্রদান, আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরবরাহ করতে হবে। এ সময় মুরগীর ডিম পাড়ার জন্য ডিম পাড়ার বক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

গুনগত মান সম্পন্ন খাদ্য ক্রয়, সুষম রেশন তৈরী, খাদ্য উপাদান সমূহ সঠিকভাবে মিশ্রিতকরণ এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ।

বাচ্চার প্রথম খাদ্যঃ

বাচ্চা খামারে পৌঁছানের পরপরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন ‘সি’ মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম) গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন-ডি, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন-সি) চিক গার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতঃপর চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে।

প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি স্পর্শ করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচচা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৩ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরীকৃত খাদ্য যোগান দেয়া যেতে পারে। তারপর লেয়ার ষ্টারটার সরবরাহ করা হয়। প্রথমে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

লেয়ার মুরগির রেশন

উপাদান	পরিমান (কেজি)			
	ষ্টারটার রেশন ০-৮ সপ্তাহ	গ্রোয়ার রেশন (৯-১৬ সপ্তাহ)	পুলেট রেশন (১৭-২২ সপ্তাহ)	লেয়ার রেশন (২৩-অধিক)
গম	৩৫	২২	২৩	১৬
ভুট্টা	১৬.৯	৩০	৩৬	৪০
সয়াবিন	২৭.০	২৮	১৭	১২
চালের কুড়া	১৪.৮	১৫	১৯.৩	১৪.৩
ঝিনুক চূর্ণ	১.৫	১.৫	২.৫	১.৫
ডিসিপি	১.৫	২.৫	১.৫	১.৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
সয়াবিন তেল	২.৫০	-	-	-
ক্যালসিয়াম কার্বনেট		-	-	৪.০
খাবার লবন	০.২৫	০.২৫	০.২৫	-
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

লেয়ার মুরগীর ভ্যাকসিন কর্মসূচী

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
৩	এন ডি	জীবন্তঃ১ চোখে ১ ফোঁটা
৭	গামবোরো	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
১৪	গামবোরো	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
২১	এন ডি	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
৩০	ফাউল পক্স	পাখার চামড়ার সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৬০	এন.ডি.	চামড়ার নীচে অথবা মাংস পেশীতে ০.২৫ মি.লি./মুরগী
৭০	ফাউল পক্স	পাখার চামড়ার সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
১২০	এন.ডি. +ইডিএস	চামড়ার নীচে অথবা মাংস পেশীতে ০.৫ মি.লি./মুরগী

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ প্রতিদিনই দুইবার ডিম সংগ্রহ করে ডিমের ট্রেতে রাখতে হবে। যে সমস্ত স্থানে আলো-বাতাস ভালভাবে চলাচল করে সে সমস্ত স্থানে ডিম ৭ দিনের জন্য সংরক্ষণ করা ভাল।

বাজারজাতকরণ ঃ

ভাল বাজার মূল্য এবং সহজে বাজারজাত করার জন্য খামারীগণ সংগঠনের মাধ্যমে প্রতি ৭ দিন পর পর গ্রামীণ ফরিয়াদের নিকট অথবা সরাসরি আড়তদারগণের নিকট ডিম এবং ছাটাইকৃত মুরগীও বিক্রি করে থাকে। বাজারজাত করণের ভাল সুযোগ সুবিধা না থাকলে অনেক সময় খামারীগণ কম মূল্যে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হন। এছাড়া মুরগীর বিষ্ঠা মাছের খামারী ও অন্যান্য খামারীদের নিকট বিক্রি করে থাকে।

ব্রয়লার মুরগি পালন-

দেশের প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, এছাড়াও বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রয়লার পালনের উপর একটি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। একজন খামারী নিজস্ব শ্রম দিয়ে প্রতি বছর কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ব্রয়লার করতে পারবেন। যা দ্বারা ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যয় অনায়াসে মিটানো সম্ভব এবং পারিবারিক পুষ্টির অভাব পূরণের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ব্রয়লার মুরগির ঘর নির্মাণঃ

ব্রয়লারের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হয়। ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্রয়লার ঘর নির্মাণে প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য ১বর্গফুট হিসাবে জায়গা ধরে ঘর নির্মাণ করতে হবে। ঘরের মেঝে ৩ ফুট উঁচুতে মাচা থাকবে। মাটি থেকে মাচা পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা তার জালি অথবা বাঁশের জালি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে কুকুর, বিড়াল এবং অন্য কোন বন্য প্রাণি মাঁচার নীচে প্রবেশ করতে না পারে। ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হবে। ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। টিন ব্যবহার করলে টিনের নীচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে।

ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্তকরণঃ

মুরগীর ঘর তৈরীর সকল কার্য্য শেষ হলে, ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্তকরণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ঝাড়ু দিয়ে মাচা ও মাচার নীচে, পাশের বেড়া ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। তারপর পারিস্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং সর্বশেষে জীবানুনাশক (পভিসেপ, সুপাসেপ্ট, ক্লোরোক্স, আয়োসান, ভিরকনএস) এর দ্রবন দ্বারা ঘরের মাচা, পাশের বেড়া ও খামারের আশেপাশে জীবানুমুক্ত করা হবে। ঘরে মুরগীর বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমুক্ত করণ করতে হবে।

বাচ্চা ক্রয় ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনাঃ

বাচ্চা ঘরে উঠানোর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডিং এর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা স্থানীয় কোন নামকরা হ্যাচারী থেকে ক্রয় করা যায়। ব্রয়লার হাইব্রিড গুলোর মধ্যে রয়েছে আকবর, একর, হাবার্ড ক্লাসিক, ভ্যানকর, হাইব্রো-পিএন ইত্যাদি। শীতকালে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল,আর,আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।

ব্রয়লার বাচ্চার প্রয়োজনীয় ব্রুডিং তাপমাত্রাঃ

লেয়ার বাচ্চার ব্রডিং তাপমাত্রার অনুরূপ।

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- ব্রয়লার বাচ্চা খামারের পৌঁছানের পরপরই প্রথম গ্লুকোজ ওয়াটার সলিউশন ভিটামিন এবং ভিটামিন ‘সি’ মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারের ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন ডি, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন সি) চিক গার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতঃপর চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে।
- প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৩ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বাচ্চার জন্য তৈরীকৃত খাদ্য তারপর ব্রয়লার স্টারটার এবং ব্রয়লার ফিনিসার খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

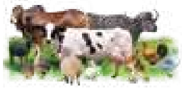

দৈহিক ওজন অনুসারে ব্রয়লারের খাদ্য গ্রহণ

বয়স সপ্তাহ	দৈহিক ওজন গ্রাম/প্রতি ব্রয়লার	খাদ্য গ্রহণ গ্রাম/ব্রয়লার/ সপ্তাহ
১	১০০-১১০	৯০-১১০
২	২৪০-২৬০	১৭০-২০০
৩	৪২০-৪৫০	৩১০-৩৪০
৪	৬৫০-৭৫০	৪০০-৪২০
৫	৯০০-১০০০	৫০০-৫৫০
৬	১২০০-১৬০০	৬৫০-৭২৫
৭	১৬০০-২০০০	৭৫০-৯০০

ব্রয়লার রেশন এবং পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)		পুষ্টির প্রয়োজনীতা		
	ষ্টারটার ০-৪ সপ্তাহ	ফিনিসার ৫-৬ সপ্তাহ	পুষ্টি উপাদান	ষ্টারটার	ফিনিসার ৫-৬ সপ্তাহ
গম	২৫.০০	২৫.০০	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরী/কেজি)	২৯০০	৩০০০
ভুট্টা	২৮.০০	৩৩.০০	ক্রুড (প্রোটিন (%)	২৩	২০
চালের কুড়া	১৩.৫০	২২.৫০	ক্যালসেয়াম (%)	১.১১	০.৮৭
সয়াবিন মিল	১০.০০	৪.০০	প্রাপ্ত ফসফরাস (%)	০.৬৪	০.৪৭
তিলের খৈল	১৩.০০	৬.০০	লাইসিন (%)	১.০০	০.৮৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৫.০০	৫.০০	মিথিওনিন(%)	০.৪৪	০.৩৪
মিট এন্ড বোন মিল	৫.০০	৪.০০	-	-	-
লবন	০.২৫০	০.২৫০	-	-	-
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫০	০.২৫০	-	-	-

আলোক ব্যবস্থাপনাঃ

আলোক ব্যবস্থা ব্রয়লার বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুনির্দিষ্ট আলোক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ব্রয়লারের খাদ্য রূপান্তরের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। ১ম সপ্তাহে ২৪ ঘন্টা এবং ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত ২৩ ঘন্টা আলো এবং ১ ঘন্টা অন্ধকার রাখা প্রয়োজন। প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া যেতে পারে।

ব্রয়লার মুরগির টীকাদান কর্মসূচী

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	প্রয়োগের পথ	ডোজ	রোগের নাম
৭	এনডি	চোখে	১ ফোঁটা	রানীক্ষেত
১৪	গামবোরো	চোখে	১ ফোঁটা	গামবোরো
২১	এনডি	চোখে	১ ফোঁটা	রানীক্ষেত
২৮	গামবোরো	চোখে	১ ফোঁটা	গামবোরো

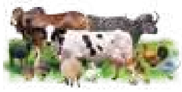

ব্রয়লার খামারের বায়োসিকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তাঃ

- খামারকে রোগমুক্ত রাখতে এবং কাংখিত উৎপাদন পেতে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- খামারের প্রবেশ পথে জীবানুনাশক পাত্র বা স্পেয়ার রাখতে হবে।
- খামারের ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে পোষাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মৃত ব্রয়লার গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে।
- ঘরে যাতে পাখি, ইঁদুর, কুকুর বা বন্য বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দর্শণার্থীদের খামার পরিদর্শনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- প্রতি ব্যাচে সম্পূর্ণ করার পর কম পক্ষে ১৫ দিন পর বাচ্চা উঠানো যাবে।

	©The Chicken Chick
ঝুলন্ত খাদ্যের পাত্র	নিপল ড্রিংকার
	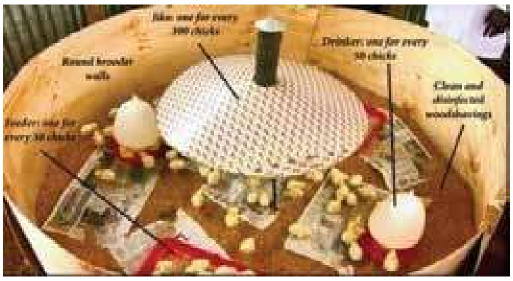 Round brooder walls Drinker: one for every 50 chicks Clean and disinfected woodshavings Feeder: one for every 50 chicks
মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং	ব্রুডিং উপকরন

সেশন-৭৪
দেশী (অরগানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- উন্নত প্রযুক্তিতে দেশী মুরগি পালন পদ্ধতি
- দেশী মুরগির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

দেশী জাতের মুরগি ঃ

সচারাচর গ্রামে গঞ্জে গৃহস্থের বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় যে সমস্ত মুরগী চরে বেড়ায় তারা দেশী জাতের মুরগি। এরা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কুড়িয়ে খায়। ছাড়া অবস্থায় পালন করতে হয় বলে এদের পালন খরচ নেই। এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এরা ওজনে বেশী হাল্কা। তবে এদের দেহ সুগঠিত এবং মাংস পেশী মজবুত হয়। এসব কারণে দেশী মুরগীর মাংস সুস্বাধু। ডিমের কুসুমের রং হলুদ। দেশী মুরগীর মাংস ও ডিম অনেকেই পছন্দ করে এবং বাজারে বেশ চাহিদা আছে। এদের শরীরে পালকের রঙের কোন স্থায়িত্ব নেই। এরা ডিমে তা দিয়ে এবং বাচ্চা পালন করতে খুব পারদর্শী। এরা আকারে ছোট হয় এবং খুব চঞ্চল ও চালাক। সহজে বন্য প্রাণী এদেরকে ধরতে পারে না। এরা বছরে ৭০-৭৫টি ডিম দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার দেশী মুরগি পালন করে থাকে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশী মুরগির চেয়ে কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ও অতি নগন্য এবং অতিরিক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অধিকন্তু এদের মাংস ও ডিমের মূল্য বিদেশী মুরগির তুলনায় প্রায় দ্বিগুন এবং চাহিদা খুবই বেশী। দেশী মুরগির মৃত্যু হার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ নয়। বাচ্চা বয়সে দেশী মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষেণা ইনস্টিটিউট দেশী মুরগি-উৎপাদনে উন্নত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্যবহৃত করে খামারীরা দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্যঃ

- সম্পুরক খাদ্য, রাণীক্ষেত ও বসন্তের প্রতিষেধক প্রদান করে এবং বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রেখে দেশী মুরগি বিশেষ করে ছোট বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা;
- বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা;
- দেশী মুরগির দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতিঃ

- প্রযুক্তিটি গ্রামীণ পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারই ব্যবহার করতে পারবেন।
- প্রত্যেক খামারীগণ তাদের মুরগির খোয়াড় ছাড়াও মুরগিগুলোকে সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য বাঁশ তার জালি অথবা বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি ক্রিপ ফিডার তৈরী করবেন। এতে দুটো অংশ থাকবে। এক অংশে বাচ্চা ও অপর অংশে বয়স্ক মোরগ-মুরগীর সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ছোট খামারীদের জন্য (ক্রিপ ফিডার) আকার ৪.২ ফুটX৫ ফুট এবং বড় খামারীদের জন্য ৫ ফুটX৩ ফুট হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫ ইঞ্চি থেকে ১.৭৫ ইঞ্চি হবে। যাতে করে বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগি ক্রিপ ফিডারের বাচ্চার জন্য খাদ্য প্রদানের অংশে প্রবেশ করে বাচ্চার সম্পূরক খাদ্য খেতে না পারে।
- প্রতিটি বয়স্ক মুরগীকে চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈনিক ৩৫ গ্রাম সম্পুরক খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারীগণ সারা বছর ১টি মুরগি বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহৃত করবেন। বাকী ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।
- মাঝারী ও বড় খামারীগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগীর মধ্যে ২টি মুরগীকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকী ৪টি মুরগী সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।
- ছোট বাচ্চাগুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ প্রয়োজনীয় সম্পুরক খাদ্য ক্রিপ ফিডারের ভিতর দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পুরক খাদ্যের পরিমান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফোটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভিতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে। কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না।

- দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পুরক খাদ্যের পরিমান হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়স-কালীন সময়ে ছোট বাচ্চাগুলো মুরগীর সাথে বাড়ির আঙিনায় চড়ে খেতে অভ্যস্থ হবে।
- মুরগীগুলোকে নিরোগ রাখার জন্য মুরগীর খোয়ার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া নিম্ন ছক অনুযায়ী রাণীক্ষেত ও বসন্ত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

দেশী মুরগির প্রতিষেধক টিকা প্রদান কর্মসূচী

প্রতিষেধকের নাম	যে বয়সে প্রদান করতে হবে	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
বিসিআরডিভি	৫-৭ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোঁটা
বিসিআরডিভি (বোস্টার)	১৪ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোঁটা
ফাউল পক্স	৩০-৩৫ দিন বয়সে	পাখার চামড়ায় সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
আরডিভি	৬০ দিন বয়সে	মাংসপেশীতে ১ সিসি

দেশী মুরগির সম্পূরক খাদ্য মিশ্রণ ঃ

গম/ভূট্টা ভাংগা	ডাল ভাংগা	চালের কুড়া	সয়াবিন/তিলের খৈল	ঝিনুক/ডিসিপি	লবন	প্রিমিক্স
৬০%	১০%	১২%	১৫%	২.৫%	০.২৫%	০.২৫%

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ ঃ

- মুরগির মৃত্যুর হার কমে যাবে। বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এর হার শতকরা বর্তমান হার ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগের নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশী মুরগী পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।
- সনাতন পদ্ধতিতে ৬-৭টি দেশী মুরগি পালন করে সাধারণত গড়ে একজন খামারী দেশী মুরগী পালন থেকে প্রতি বছর ২০০০/- টাকা আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন খামারী দেশী মুরগি পালন করে গড়ে ৬,৫০০/- টাকা আয় করতে পারেন।

পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। দেশের নূন্যতম ৫কোটি পরিবার যদি বছরে ৫টি করে দেশী মুরগীর উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে প্রতি বছর ২৫ কোটি অতিরিক্ত মুরগি আমাদের দেশের পুষ্টি ঘাটতির আংশিক সমাধান দিতে পারে।

সেশন-৭৫

হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা

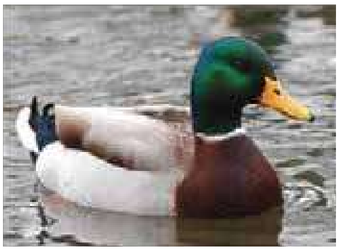

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাঁসের জাত পরিচিতি
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও খামার নির্মাণ
- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবা এছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জনে হাঁস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে এই কারণে একজন খামারী হাঁসকে সামান্য পরিমান খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনক ভাবে হাঁস পালন করতে পারে। মুরগীর চেয়ে হাঁস পালনে উৎপাদন খরচ অনেক কম।

হাঁসের জাত ঃ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে হাঁসের জাত, তাদের শতকরা সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য ঃ

জাত	শতকরা হার	বৈশিষ্ট্য	
দেশী	৪৫	ডিম ও মাংস উৎপাদন করে থাকে, বছরে ৭০-৮০ টি ডিম দেয় এবং আবদ্ধ অবস্থায় উন্নত ব্যবস্থাপনায় এগুলো (দেশী সাদা ও দেশী কালো) বছরে প্রায় ২০০-২০৫ টি ডিমা দেয়।	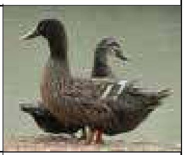
খাকী ক্যাম্পবেল	৩০	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। শারীরিক ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসী ১-১.৫ কেজি । বৎসরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমান ১৭৬ গ্রাম । প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৯ গ্রাম। ডিমের উচ্চতায় হার ৮০ শতাংশ।	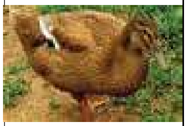
জিংডিং	২০	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। শারীরিক গড় ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২.০০ কেজি এবং হাঁসি ১.৫ কেজি । দৈনিক একটি বয়স্ক হাঁসের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৬০ গ্রাম। বৎসরে ডিম পাড়ে প্রায় ২৭০ টি । গড়ে প্রতিটি ডিমের ওজন ৬৮ গ্রাম। ডিমের উচ্চতায় হার ৮০ শতাংশ।	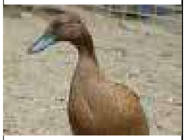
ইন্ডিয়ান রানার	৫	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। এ জাতের তিনটি উপজাত আছে। তারমধ্যে সাদা জাতটি বেশি প্রচলিত। দৈহিক ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসী ১-২ কেজি। গড়ে বৎসরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৬ গ্রাম। ডিমের উচ্চতায় পরিমান ৭৪ শতাংশ।	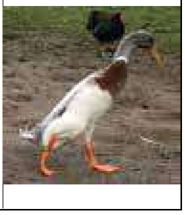

হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ ঃ

দেশের বিভিন্নস্থান থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার যেমন: দৌলতপুর ,নওগাঁ,এবং সোনাগাজী থেকেও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়াও এনজিও এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত খামারীদের নিকট থেকেও হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করা যায়। বাচ্চার ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা ঃ ব্রুডিংকালে বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশী,এ সময় বাচ্চার যত্ন নিশ্চিত করতে হবে।

হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল।

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফাঃ)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
২	৯০	১৮	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে। আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে।
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্বে থেকেই ব্রুডার জালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়। যেন বাচ্চা রাখার সময় লিটারের তাপমাত্রা ২৮ সেঃ-৩১ সেঃ এর মধ্যে থাকে। দেখা গেছে প্রথম কয়েকদিনের ঠান্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় এবং নাভী শুকাতে দেরী হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করলে আশা করা যায় বাচ্চার মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ থেকে কমে ৩-৪ শতাংশ হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক খামারীগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৫০ গ্রাম এবং বয়স্ক গুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যাবার কারণে ঐ সময় খাবার পরিমাণ (৭০-৮০ গ্রাম) বাড়িয়ে দিতে হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের পরিবর্তন আনলে হাঁসের ডিম উৎপাদন বেড়ে যায় ।

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরী

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা ০-৬ সপ্তাহ	বাড়ন্ত হাঁস ৭-১৯ সপ্তাহ	ডিম পাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ তদুর্দ্ধ
গম ভাঙ্গা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খণিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবন	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁস পালন পদ্ধতি ঃ

আবদ্ধ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে পুরোপুরি হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। হাঁসের বাচ্চা (৪-৬) সপ্তাহ পর্যন্ত লালন পালন করা সুবিধাজনক । এই পদ্ধতি ৩ প্রকার ; যথা-(ক) মেঝেতে লালন পালন, (খ) খাঁচায় লালন পালন; এবং (গ) তারের জালের ফ্লোর।

(ক) **ফ্লোরে লালন পালন ঃ** এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার দ্রব্য দিয়ে হাঁস রাখা হয়। সমস্ত মেঝের ৪ ভাগের এক ভাগ খাবার দেবার জন্য অর্থাৎ খাবারের এবং পানির পাত্র রাখা হয়। পানি বের করে দেয়ার জন্য ছোট আকারের নিষ্কাষণ থাকে।

(খ) **খাঁচায় লালন পালন ঃ** এই পদ্ধতিতে খাঁচা গুলো একটির পর একটি স্তরে স্তরে থাকে। ২-৩ সপ্তাহের বাচ্চার জন্য উপযুক্ত । প্রতিটি খাঁচার ২০-২৫ টি বাচ্চা রাখা যায়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ১X১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

(গ) তারের জালের ফ্লোর ঃ এ পদ্ধতিতে ঘরের ফ্লোর হতে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং খাঁচাগুলি ১/২ বর্গইঞ্চি ছিদ্রের হলে ভাল। মাচার চারপাশে ১-২ ফুট বেড়া দিতে হবে যেন বাচ্চা পড়ে না যায়। ফ্লোরের তুলনায় ১/৩-১/২ পরিমান কম জায়গা লাগে।

অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলো রাতে ঘরে আবদ্ধ থাকে। এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ (১০-১২ বর্গফুট) এ ঘুরে বেড়ায়। খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণে দেয়া যেতে পারে। তবে সুবিধাজনক হারে চারণে দেয়া। ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা দেয়া যেতে পারে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৬-৮ ইঞ্চি হয়। যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে।

মুক্ত রেঞ্চ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঘরে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় হাঁস বিভিন্ন জায়গায় যেমন-নদী-নালা,খালবিল,হাওড়,পুকুর,ডোবায় বেড়িয়ে খায়। পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার। এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

হাডিং পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলো (বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক) কোন প্রকার ঘরে রাখা হয়না। যে সমস্ত জায়গায় খাবার আছে সেই সকল এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন খাদ্যগ্রহণ করে রাতের বেলা হাঁসগুলোকে কোন একটি উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয় সকাল পর্যন্ত । একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুদিন খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন লোক একবার ১০০-৫০০ হাঁস চড়াতে পারে।

ল্যানটিং পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে বড় বড় বিল,হাওড়,জলাশয় এবং আশে পাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো যাতে রাতের বেলায় থাকে। প্রতিটি ফ্লকে ১০০-২০০ টি হাঁস থাকে।

বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনা ঃ

স্থান নির্বাচন ঃ খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত। ঘরের আশে পাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা এবং হাঁসের ঘরের স্থান মুরগীর খামারের পাশে ঠিক করা উচিত নয়। হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরনের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরী করতে হবে।

তাপমাত্রা ঃ হাঁসের জন্য খুব বেশী বা কম তাপ ক্ষতিকর। ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রী ফাঃ ৭৫৪ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম ।

আদ্রতা ঃ হাঁসের ঘরের আর্দ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্চনীয়। অনুকূল পরিবেশে এবং আবহাওয়ায় লোম গজানো,শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয় । ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর বেশী হলে ককসিডিয়া ও কৃমি হয়।

আলো ঃ প্রথম ৬ সপ্তাহ রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা হলে খাদ্য বেশী খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। এই অতিরিক্ত আলো কৃত্রিম বাল্বের মাধ্যেমে সরবরাহ করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন) ঃ হাঁসের ঘরে শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরী। ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওলা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ ঃ মেঝে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত হবে এবং কোন প্রকার গর্ত থাকবে না। ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট,৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র ঃ ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চেনেল তৈরী করতে হবে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

হাঁসের দুটো মারাত্মক রোগ হলে ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগ। টীকাদান কর্মসূচী নিয়মিত অনুসরণ করলে সম্পর্ণরূপে এই ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া আজকাল খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সি ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। কাজেই খাদ্য তৈরীর সময় বিশেষ করে ভূট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরী করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাপ্তিস্থান	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাকপ্লেগ টিকা	দেশের সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে । দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ (প্রথম মাত্রায় ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার	বুকের মাংসে/প্রয়োগে বিধিমতে
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টিকা	দেশের সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে ২য় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ পরবর্তী ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে/প্রয়োগ বিধিমতে।

হাঁসের খামার

সেশন-৭৬

কোয়েল পালন ও তার পরিচর্যা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কোয়েল পাখি পালন পদ্ধতি
- লেয়ার কোয়েল, ব্রয়লার কোয়েল, ব্রিডার কোয়েল পালন পদ্ধতি
- বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্য সরবরাহ
- কোয়েল পালনে পরিচর্যা

কোয়েল ঃ

আমাদের দেশে পোষা পাখির মধ্যে কোয়েল একটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল পালন খামার গড়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই কোয়েল পালন যথেষ্ট্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং পোল্টি শিল্পের একটি মজবুত অঙ্গ হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে। যেহেতু এ শিল্প সরাসরি প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সে জন্য কোয়েল পালনের মাধ্যমে এ দেশের বেকার ছেলে-মেয়েরা তাদের কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে। মানুষ বাড়ছে, এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে, দিন দিন দেশে আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে মাংসের বাজারজাতকরণেরও কোন সমস্যা হবে না। তাই বলা যায় কোয়েল পালনের ভবিষৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জল।

উদ্দেশ্য ও অবস্থান অনুযায়ী তিন ধরনের কোয়েল রয়েছে। (১) বন্য কোয়েল; (২) বাণিজ্যিক কোয়েল; (৩) ল্যাবরেটরি কোয়েল ল্যাবরেটরি কোয়েল বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। খামারীদের কাছে বাণিজ্যিক কোয়েল গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক কোয়েল তিন প্রকার যথা ঃ (ক) লেয়ার কোয়েল (খ) ব্রয়লার কোয়েল (গ) ব্রিডার কোয়েল

লেয়ার কোয়েল ঃ

ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোয়েলকে লেয়ার কোয়েল বলা হয়। লেয়ার কোয়েল শুধু খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। লেয়ার কোয়েলের সাথে তাই কোন পুরুষ কোয়েল রাখা হয় না। সাধারণত ৬-৭ সপ্তাহ বয়স থেকে স্ত্রী কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করে এবং প্রতিটি কোয়েল বছরে ২৯০-৩০০টি ডিম পেড়ে থাকে। লেয়ার খামারে সাধারণত ৫৪ সপ্তাহ ব্যাপী মাদী কোয়েল পালন করা হয়। এরপর এগুলোকে ডিম উৎপাদনের জন্য বাতিল করে দেয়া হয় এবং মাংসের জন্য বিক্রয় করা হয়।

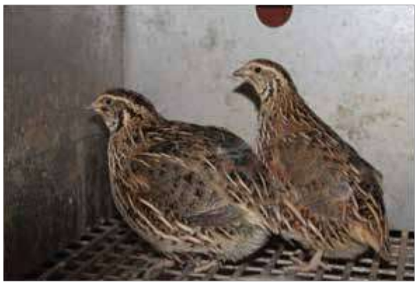

জাপানিজ কোয়েল

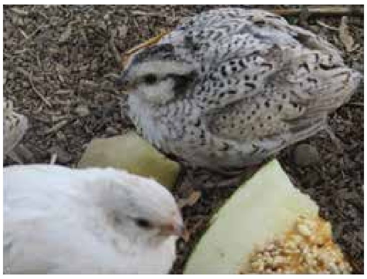

বব হোয়াইট কোয়েল

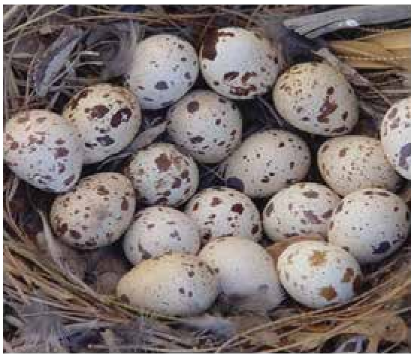

জাপানিজ কোয়েলের ডিম

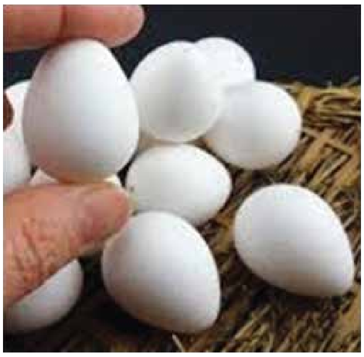

বব হোয়াইট কোয়েলের ডিম

ব্রয়লার কোয়েল ঃ

নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জাপানী কোয়েলকে ‘ব্রয়লার কোয়েল’ বলা হয়। এ উদ্দেশ্যে মর্দা-মাদী নির্বেশেষে জন্মের দিন থেকে পাঁচ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এদেরকে পালন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে একেকটির জীবিত ওজন ১৪০ -১৫০ গ্রাম হয়ে যায়। এগুলো থেকে প্রায় ৭২.৫% খাওয়ার উপযোগী মাংস পাওয়া যায়। মাংস উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যতো ধরনের কোয়েল তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের কোইমবাটোরস্থ্য এ.ভি.এম. হ্যাচারিজ এন্ড ব্রিডিং রিসার্চ সেন্টার (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক উৎপন্ন সাদা কোয়েলই উৎকৃষ্টতম। অবশ্য এটি এখনও আমাদের দেশে আনা হয়নি। তাই আপাতত লেয়ার কোয়েলগুলোই ব্রয়লার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মাংস উৎপাদন হারও যথেষ্ট ভাল।

ব্রিডার কোয়েল ঃ

লেয়ার ও ব্রয়লার কোয়েলের বাচ্চা ফোটানোর লক্ষ্যে ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বাছাই করা প্রজননে সক্ষম মর্দা-মাদী কোয়েলগুলোকে ব্রিডার কোয়েল বলা হয়। সাধারণত ৭-৮ সপ্তাহ বয়সের মাদী এবং ১০সপ্তাহ বয়সের মর্দা কোয়েরকে ব্রিডিং খামারে এনে পালন করা হয়। তবে এদের বয়স ১০ সপ্তাহ হওয়ার পর প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উত্তম। এখানে এদেরকে ৩০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাখা হয়। ডিমের উর্বরতা ভাল রাখার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২টি মাদী কোয়েলের সংগে একটি মর্দা কোয়েল রাখতে হয়।

কোয়েল পালন পদ্ধতি ঃ

মুরগির বাচ্চার মত কোয়েলের বাচ্চাকেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে ব্রুডিং করা দরকার হয়। কোয়েল পালনের পুরো সময়কালকে দু’টো ভাগে ভাগ করা হয়। (১) বাচ্চা পালন পর্ব (২) বয়স্ক কোয়েল পালন পর্ব

বাচ্চা পালন পর্ব ঃ

শুন্য থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাচ্চা পালন পর্বের অন্তর্ভুক্ত তবে ১৪ দিন পর্যন্ত ব্রুডিং করতে হয়। পরিবেশের তাপমাত্রার কারণে ব্রুডিং পর্ব ৩ সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় হতে পারে। একদিন বয়সের বাচ্চার জন্মের পর থেকে কৃত্রিম ভাবে তাপের মাধ্যমে পালন করাকে ব্রুডিং বলা হয়।

কোয়েলের বাচ্চা পালন ঃ

কোয়েলের বাচ্চা ব্যাটারি বা লিটার যে কোন পদ্ধতিতেই পালন করা যায়। তবে যে পদ্ধতিতেই পালন করা হোক না কেন এদের খাঁচা যে ঘরে রাখা হবে বা লিটার পদ্ধতিতে যে ঘরে পালন করা হবে সেটি যথেষ্ট মজবুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঠিক ভাবে কোয়েলের বাচ্চা পালনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

১. সঠিক তাপমাত্রা ঃ বাচ্চা পালন ঘরের তাপমাত্রা ২১-২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস-এ রাখতে হয়। ব্রুডারের বাচ্চাদের তাপ দেওয়ার বিশেষ ধরনের যন্ত্র রাখতে হয়। এরপর প্রতি তিন থেকে চারদিন পরপর ২.৫ -৩.০ ডিগ্রি সেঃ করে কমিয়ে তিন সপ্তাহ পর তা ঘরের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে। শীতকাল ছাড়া বাচ্চা পালনের পরবর্তী দু' সপ্তাহ শুধু মাত্র রাতের বেলায় তাপের ব্যবস্থা করলেই চলে।

২. পর্যাপ্ত আলো ঃ দু'সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ঘরে ২৪ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তা কমিয়ে দৈনিক ১২ ঘন্টায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তবে তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্ক আনতে হলে প্রথম দিন থেকে ৫-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈনিক ২৪ ঘন্টা আলো জ্বেলে রাখতে হবে। ব্রয়লার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়ানোর জন্য ২৫-২৮ দিন থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাজারজাত করার ৭-১০ দিন পূর্ব থেকে দৈনিক ৮ ঘন্টা আলোতে ও ১৬ ঘন্টা অন্ধকারে রাখতে হবে।

৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ বাচ্চা পালন ঘরে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু ঢোকা ও ঘরে সৃষ্ট ক্ষতিকারক গ্যাস বের হয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্রুডিংয়ের প্রথম সপ্তাহে ঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে তা বড়াতে হবে। ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রথম তিন সপ্তাহে ৬০-৬৫% পরবর্তী দু'সপ্তাহে ৫৫-৬০% এ রাখতে হবে।

৪. বাচ্চার ঘনত্ব ঃ তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য ব্রুডারের হোভারের নিচে ৭৫ বর্গ সেঃ মিঃ জায়গা বরাদ্ধ করতে হবে। ব্রুডারের হোভারে চারদিক থেকে চিক গার্ড পর্যন্ত ফাঁকা জায়গাটুকু একই পরিমান জায়গা থাকবে। ৩-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫০-১৭৫ বর্গ সেঃমিঃ জায়গার প্রয়োজন হবে। লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি বাচ্চার জন্য সর্বমোট ২০০-২৫০ বর্গ সেঃমিঃ জায়গা দিতে হবে।

৫. খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ যদি কোন বাচ্চা তার ধারে কাছে খাদ্য ও পানি খুঁজে না পায়, তবে তার শরীর পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে ঠন্ডা হয়ে যাবে ও না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। ব্রুডিং-এ উচ্চ তাপমাত্রায় বাচ্চারা সহজেই পানিশূন্যতায় ভোগে তাই এদের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ঃ বাচ্চাদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ঘর ও ব্রুডারের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাচ্চা পালন ঘরে পালনকারি ছাড়া অন্যদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণি-পাখিও যেন ঘরের আশেপাশে না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্য ঃ

কোয়েল পালনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি স্বাস্থ্যরক্ষা, ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য এদের খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টিমাণ ও উপাদানের চাহিদার বেশ তারতম্য ঘটে। পুষ্টি উপাদানের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বয়স অনুযায়ী কোয়েলকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রারম্ভিক পর্ব, বৃদ্ধি পর্ব, ডিম পাড়া পব, ব্রিডার পর্ব।

বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্য তালিকা ঃ পরিমাণ-কেজিতে

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন	বৃদ্ধি /বাড়ন্ত রেশন	লেয়ার/ ব্রিডার রেশন
	(০-৩ সপ্তাহ)	(৪-৫ সপ্তাহ)	(৬ সপ্তাহ - বাকী সময়)
ভুট্টা	৫৩.২০	৫৩.২৫	৫০.২৫
মিহি চাউলের কুড়া	১৫.০০	১৬.০০	১৬.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.০০	৭.০০	৭.০০
সয়াবিন মিল	২১.০০	২০.০০	২০.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	৩.০০	৬.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ভিটামিন- মিনারেল প্রিমিক্স	০.৩০	০.২৫	০.২৫
সর্বমোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

কোয়েলের রোগ বালাই ঃ

কোয়েল প্রধানত রানীক্ষেত, পক্স, নিউমোনিয়া, কক্সিডিওসিস এবং কৃমিরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সঠিক পরিচর্যা ও খামার ব্যবস্থাপনা উন্নত করলে রোগব্যাধি অনেকাংশে কমে যায়। কোয়েল পাখিকে নিয়মিত টিকাপ্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

টিকা প্রদান -

বয়স	**টিকা**	**প্রয়োগস্থান**	**পরিমাণ**
৩-৭ দিন	বিসিআরডিভি	চোখে ফোঁটা	১ ফোঁটা
১৮ দিন	বিসিআরডিভি	চোখে ফোঁটা	১ ফোঁটা
২৮ দিন	ফাউল পক্স	চামড়ার নিচে নিডিল দিয়ে খুঁচিয়ে প্রয়োগ	১ ফোঁটা
৫০ দিন	আরডিভি	রানের মাংসে	১ সিসি

সেশন-৭৭

কবুতর পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কবুতরের জাত পরিচিতি
- কবুতর পালনের সুফল
- কবুতরের খাদ্য
- কবুতরের বাসস্থান ও প্রজনন
- কবুতরের টিকা

কবুতর পালনের সুফল ঃ

- ৬ মাস বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে এবং গড়ে প্রতি মাসে ২টি করে বাচ্চা উৎপাদন করে। খুব সহজে কবুতর পালন করা যায়।
- ছাদে বা উঠানের এক কোনে ভালোবাবেই ৫০-১০০ টি কবুতর পালা যায়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে সময় লাগে ১৮ দিন। ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের কবুতরের বাচ্চা খাওয়ার উপযোগি হয়।
- খাদ্য খরচ কম, বেশীরভাগ সময় নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। চালের খুদ, গম বা ভুট্টা ভাঙ্গা সম্পুরক খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা যায়।
- বাজারে মাংসের জন্য কবুতরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ।
- কবুতর লালন-পালন করতে আলাদা করে বেশী সময় ব্যয় করতে হয় না।
- কবুতরের পায়খানা কম্পোষ্টিং করে মূল্যবান সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।
- কবুতরের পালক দ্বারা মূল্যবান খেলনা সামগ্রী তৈরী হয়ে থাকে।

কবুতরের জাত ঃ

পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ জাতের কবুতর রয়েছে । তবে চাহিদা অনুযায়ী প্রধানত দুই ধরণের কবুতর আমরা চিনে থাকি ঃ মাংস উৎপাদনকারী জাত এবং বিনোদনমূলক জাত। মাংস উৎপাদনকারী জাত ঃ হোয়াইট কিং, সিলভার কিং, গোলা, লোখা, ইত্যাদি। বিনোদনমূলক জাত ঃ ময়ুর, শিরাজি, লাহোরি, ফ্যানটেইল, জেকোবিন, গিরিবাজ, লোটাল, রেসার, হোমার, লাক্ষা, পেনসিল ইত্যাদি।

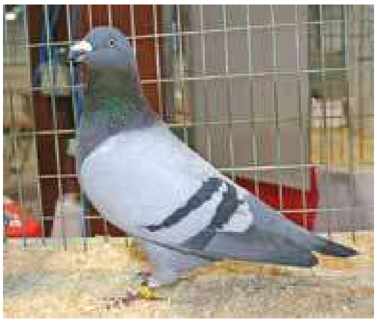

হোমার জাতের কবুতর

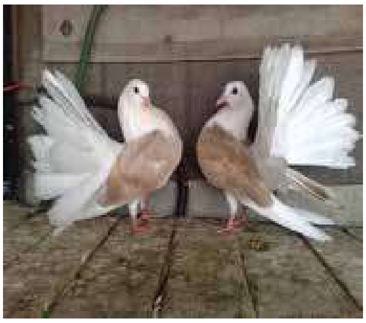

ফেনটেইল জাতের কবুতর

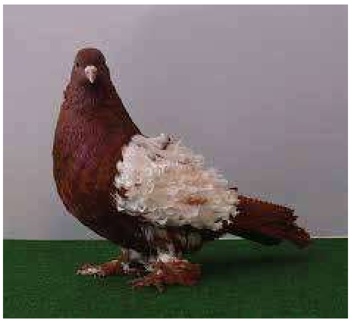

ফ্রিলব্যাক জাতের কবুতর

কবুতরের খাদ্য ঃ

হাঁস-মুরগির ন্যায় কবুতরের খাদ্য তালিকায়ও শ্বেতসার, আমিষ, চর্বি, খনিজ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকা জরুরি প্রয়োজন। আকার ও ওজন বিশেষে প্রতিটি কবুতর সাধারণত প্রতি দিন ৩০-৫০ গ্রাম খাবার খেয়ে থাকে। কবুতর প্রধানতঃ গম, মটর, ভুট্টা, সরিষা, যব, চাল, ধান, কলাই ইত্যাদি শস্য দানা খেয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে খাদ্য মিশ্রণ তৈরি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ভুট্টা-৩৫%, মটর ২০%, গম-৩০% ঝিনুকের গুড়া-৭%, ভিটামিন ও এমাইনো এসিডের প্রিমিক্স ৭% এবং লবন ১%।

কবুতরের শরীরবৃত্তিয় তথ্যাদিঃ

দেহের তাপমাত্রা থাকে-৩৮.৮-৪০ ডিগ্রি সে.। দৈহিক ওজন-হালকা জাতের-৪০০-৫০০ গ্রাম । ভারী জাত- ৪৫০-৫৫০ গ্রাম। খাদ্য গ্রহণ-৩০-৬০ গ্রাম প্রতিদিন, পানি পান-শীতকালে-৩০-৬০ এমএল.এবং গরম কালে ৬০-১২০ মিলি.। ডিম ফুটানোর সময়কাল- ১৭-১৮ দিন।

কবুতরের প্রজনন ঃ

ডিম পাড়ার ৪০-৪৪ ঘন্টা পূর্বে ডিম্বস্খলন হয় এবং ডিম পাড়ার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে তা নিষিক্ত হয় । অথাৎ ১৬-২০ ঘন্টা পর্যন্ত ডিম ডিম্বনালিতে থাকে যে সময়ে সে নিষিক্ত হয়। ডিম দেয়ার পর থেকে মর্দা এবং মাদি উভয়েই ডিমে তা দিয়ে থাকে। মাদি কবুতর প্রায় বিকাল থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত তা দেয়। মর্দা কবুতর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ডিমে তা দেয়। তা দেয়ার ৫ম দিনেই ডিম পরীক্ষা করে উবর ও অনুবর ডিম চেনা যায়। আলোর সামনে ধরলে উর্বর ডিমের মধ্যে রক্ত নালী দেখা যায় । কোন কিছু দেখা না গেলে বা স্বচ্ছ হলে বুঝতে হবে তা অনুর্বর ডিম। সাধারণত ডিমে তা দেয়ার ১৭-১৮ দিনে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। একটি মাদি কবুতর বছরে সাধারণত ১০-১২ জোড়া বাচ্চা উৎপাদন করে। জন্মের ২৬ দিন পর্যন্ত বাচ্চার দেহ বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রথম দিকে সারা দেহ হলূদ বর্ণের পাতলা লোম দ্বারা সারা দেহ আবৃত থাকে। প্রায় ৪-৫ দিন পরে বাচ্চার চোখ খোলে বা ফুটে। পনের দিনে সমস্ত দেহ পালকে ছেয়ে যায়। ১৯-২০ দিনে দুটো ডানা ও লেজ পূর্ণতা লাভ করে। ২৬-২৮ দিনে কবুতরের বাচ্চা পূর্ণতা পায়।

পিজিওন মিল্ক ঃ

কবুতরের খাদ্য থলিতে পিজিওন মিল্ক উৎপন্ন হয়। ডিমে তা দিতে বসার প্রায় ৮ম দিনে পিজিওন মিল্ক উৎপন্নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এন্টেরিওর পিটুইটারি গ্লান্ডের প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে এ পিজিওন মিল্ক উৎপন্ন হয়। কবুতর ছানা প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত মাতা-পিতার নিকট থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত খাবার পেয়ে তাকে। তাই বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় না। পিজিওন মিল্ক হলো পোস্টিক নালির ভিতরে থাকা চবির গুটিকা (ফ্যাট গ্লবিউলস)। ছানার জন্য একটি আদর্শ খাবার এ পিজিওন মিল্ক। এতে আছে-৭০% পানি, ১৭.৫% আমিষ, ১০% চর্বি, ২.৫% খনিজ পদার্থ। কবুতরের জিহ্বা সরু এবং লম্বা, মুখ গহবরের নিচের অংশ বেশ প্রশস্থ হয় যা ছানাকে খাওয়ানোর উপযোগী। মাতা-পিতা উভয়েই কবুতরের ছানার মুখের ভিতর মুখ প্রবেশ করিয়ে খাদ্য সরাসরি অন্ননালিতে পৌঁছে দেয়।

কবুতরের বাসস্থানঃ

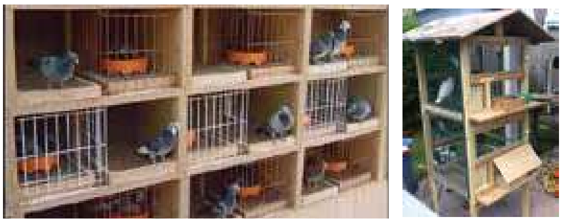

বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালনে কম খরচে কাঠ, বাঁশ, টিন ও নেট দিয়ে সহজেই কবুতরের ঘর বানানো যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে বন্য প্রাণি যেন কবুতরের ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কবুতরের টিকা ঃ

কবুতরের বিভিন্ন রোগ হয় । তার মধ্যে রানিক্ষেত ও পক্স অন্যতম। রানিক্ষেত রোগের টিকা-বিসিআরডিভি- ১ ফোঁটা করে প্রতি চোখে দিতে হয় প্রথম সপ্তাহে। ২২-২৮ তম দিনে পুনরায় বুষ্টার ডোজ হিসেবে দিতে হয়। টিকাবীজ ৬ সিসি পানিতে মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

পিজিওন পক্সের টিকা- ৩ সিসি পানিতে মিশিয়ে নিয়ে বিশেষ সুচের সাহায্যে টিকা বীজে লাগিয়ে কবুতরের পাখনার ত্রিকোনাকৃতি লোমহীন স্থানে খুচিয়ে খুচিয়ে টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সেশন-৭৮
টার্কি পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- টার্কির জাত পরিচিতি
- টার্কি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
- টার্কির ডিম ফোটানো
- পালন পদ্ধতি, মূক্ত চারণ ব্যবস্থায় খাওয়ানো,
- টার্কির বাসস্থান
- খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থাপনা
- টার্কির সাধারণ রোগ পরিচিতি ও প্রতিরোধ

টার্কির জাত ঃ

বিভিন্ন প্রজাতির পুরুষ পাখির বুকের পালকের রং কালো ও তার ডগাগুলি সাদা হয়, যার কারণে মাত্র ১২ সপ্তাহ বয়সেই লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়।

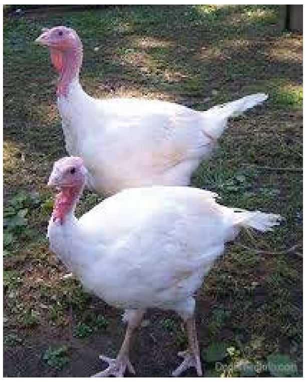

১. ব্রড ব্রেস্টেড হোয়াইট- এটি ব্রড ব্রেস্টেড ব্রোঞ্জ ও হোয়াইট হল্যান্ডের সংকর জাত যার পালকগুলি সাদা হয়। সাদা পালকের টার্কির গরম সহ্য করার ক্ষমতা বেশি এবং পালক ছড়ানোর পরে এদের পরিস্কার ও ভালো দেখায়।

২. বেল্ট সভিল স্মল হোয়াইট ঃ এটি রং ও আকারে ব্রড ব্রেস্টেড হোয়াইট প্রজাতির খুব কাছাকাছি তবে আয়তনে ছোট। ভারী প্রজাতিগুলির তুলনায় এদের ডিম দেওয়া ও উর্বরতা ও ডিম ফোটার পরিমান বেশি হয় এবং ডিমে তা দেয়ার ঝোঁক কম হয়।

টার্কি ডিম ফুটানো পদ্ধতি ঃ

তা দেওয়া স্ত্রী পাখির সাহায্যে স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানো। টার্কি সাধারণত ভালোভাবেই তা দেয় এবং তা দিতে বসা মাদি ১০-১৫ টি ডিম ফোটাতে পারে। ফুটানোর জন্য পরিস্কার খোসা ও ভালো আকারের ডিম তা দেওয়ার জন্য পাখির নিচে বসাতে হবে।

ব্রুডিং ঃ

০-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কে টার্কির ব্রুডিং পিরিয়ড বলে। তবে শীতকালে ব্রুডিং পিরিয়ড বাড়িয়ে ৫-৬ সপ্তাহ করা হয়। সাধারণত মুরগির তুলনায় টার্কির দ্বিগুন হোভারের জায়গা প্রয়োজন হয়। একদিন বয়সের শাবকদের ব্রুডিং-এর জন্য অবলোহিত আলোর বাল্ব বা গ্যাস ব্রুডার ও চিরাচরিত ব্রুডিং ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায়।

১. ০-৪ সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার মাপ পাখি প্রতি ১.৫ বর্গফুট।

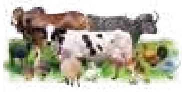

২. শাবক আসার ২ দিন আগে ব্রুডিং হাউস তৈরি রাখতে হবে।

৩. ২ লিটার ব্যাস জুড়ে গোলাকারে লিটার বিছিয়ে রাখতে হবে।

৪. শাবক যাতে তাপের উৎস থেকে দূরে চলে না যায় তাই অন্ততঃ ১ ফুট উচ্চতার একটি বেড়া রাখতে হবে।

৫. প্রারম্ভিক তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি রাখতে হবে যা প্রতি সপ্তাহে ৫ ডিগ্রি ফা. করে কমাতে হবে যতদিন না শাবকদের বয়স ৪ সপ্তাহ হয়।

৬. অগভীর পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম ৪ সপ্তাহে গড় মৃত্যুহার থাকে ৬-১০%। শাবকরা স্বভাবতঃই জন্মের পরে প্রথম কয়েকদিন খারাপ দৃষ্টিশক্তি ও ভয় পাওয়ার কারণে কিছু খেতে বা পান করতে চায় না। এ জন্য একটু কৌশলে খাওয়াতে হয়। শাবকদের অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ অভুক্ত থাকা। তাই খাদ্য ও জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। জোর করে খাওয়ানর ক্ষেত্রে প্রতি লিটার জলে ১০০ মিলি হারে দুধ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে এবং পনের দিন পর্যন্ত প্রতি ১০ টি শাবকের জন্য এক টি ডিম সিদ্ধ দিতে হবে। এটি শাবকদের প্রোটিন ও এনার্জির প্রয়োজন মেটাবে।

খাবারের পাত্রটিকে আলতো করে আঙুল দিয়ে ঠুকে শাবকদের খাবারের দিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। ফীডার এবং ওয়াটারারে রঙিন মার্বেল বা নুড়িপাথর রাখলেও শাবকেরা সেদিকে আকর্ষিত হবে। যেহেতু টার্কিরা সবুজ শাক পাতা ভালবাসে, তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু কুচোন সবুজ পাতাও খাবারে মেশাতে হবে। এই সঙ্গে প্রথম ২ দিন রঙীন ডিমের পাত্রকেও ফীডার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিটারের সরঞ্জাম ঃ

ব্রিডিং-এর জন্য সাদারণভাবে ব্যবহৃত লিটারের সরঞ্জামগুলি হল কাঠের চোকলা, কাঠের গুঁড়ো, ধানের তুষ, কুচোন খড় ইত্যাদি। প্রথমে লিটার ২ ইঞ্চি পুরু করে বিছাতে হবে এবং আস্তে আস্তে তা বাড়িয়ে ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত করা যেতে পারে। দলা বেঁধে যাওয়া আটকাতে লিটার কিছুদিন পরে পরেই উলটে পালটে দিতে হবে।

টার্কি পালন পদ্ধতিঃ

টার্কি মুক্ত ভাবে চরে বেড়ানো অথবা নিবিড় পদ্ধতিতে পালন করা চলে।

(ক) মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি

সুবিধা:

- খাবারের খরচ পঞ্চাশ শতাংশ কম হয়।
- স্বল্প বিনিয়োগ।
- খরচের তুলনায় লাভের হার বেশি।

মুক্ত চারণ পদ্ধতিতে, এক একর ঘেরা জমিতে আমরা ২০০-২৫০ টি পূর্ণ বয়স্ক টার্কি পালন করতে পারি। রাতে পাখী প্রতি ৩-৪ ব.ফু. হারে আশ্রয়ের জন্য জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে। চরে খাওয়ার সময় তাদের শিকারী জীব-জন্তুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছায়া ও শীতল পরিবেশের জন্য গাছ লাগান বাঞ্ছনীয়। চারণভূমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হবে যার ফলে পরজীবী সংক্রমণের ঘটনা কম হতে সাহায্য হবে।

মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় খাওয়ানো ঃ

টার্কি খুব ভালোভাবে অবর্জনা খুঁটে খায় বলে এরা কেঁচো, ছোট পোকা-মাকড়, শামুক, রান্না ঘরের বর্জ্য ও উই পোকা খেতে পারে যাতে প্রচুর পোটিন আছে ও খাবারের খরচকে পঞ্চাশ শতাংশে কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া সিম জাতীয় পশুখাদ্য যেমন লুসার্ন, ডেসম্যান্থস,স্টাইলো ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। চড়ে বেড়ানো পাখির পায়ের দুর্বলতা ও খোঁড়া হওয়া আটকাতে খাবারে ঝিনুকের গুড়া মিশিয়ে সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম হিসেবে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। খাবারের খরচ কম করার জন্য শাক-সব্জির বর্জ্য অংশ দিয়ে খাবারের দশ শতাংশ পরিমান পূরণ করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য রক্ষা ঃ

মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় পালিত টার্কির বিভিন্ন ধরণের পরজীবী আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সে জন্য প্রতি মাসে একবার করে ডিওয়ার্মিং-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিবিড় পালন পদ্ধতি ঃ

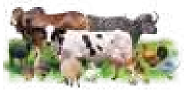

উপকারিতা-

- উন্নত উৎপাদন দক্ষতা
- উন্নত পরিচালন ও রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

বাসস্থান ঃ

- রোদ-বৃষ্টি,ঝড়, শিকারী জীবজন্তু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভালো বাসস্থান জরুরি প্রয়োজন।
- বাসস্থান আরাম দেয়।
- ঘর পূর্ব-পশ্চিম লম্বা করে তৈরি করতে হবে।
- দুটি ঘরের মধ্যে অন্ততঃ ২০ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে।
- বিভিন্ন বয়সের পাখির ঘরের মধ্যে দূরত্ব হবে ৫০-১০০ মিটার ।
- খোলা ঘরের প্রস্থ্য ৯ মিটারের বেশি হওয়া চলবে না।
- মেঝে খেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা হবে ২.৬-৩.৩ মিটার।
- বৃষ্টির ছাট আটকাতে ঘরের চালা এক মিটার বাড়িয়ে দিতে হবে।
- ঘরের মেঝে সস্তা, টেকসই ও নিরাপদ ও আর্দ্রতা রোধক বস্তু যেমন কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা ভালো।

ডিপ লিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালনের সাধারণ পরিচালনা ব্যবস্থা মুরগি পালনেরই অনুরুপ, তবে বড় আকারের পাখির জন্য যথাযথ বসবাস, পানি ও খাদ্যের পাত্রের জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

টার্কি ধরা ও নাড়াচাড়া করা ঃ

সব বয়সের পাখিকে খুব সহজেই লাঠি দিয়ে এক জায়গ থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নেয় যায়। টার্কি ধরার জন্য সব সময়ই অন্ধকার ঘর ভালো। এ অবস্থায় সহজেই চোট না লাগিয়ে দু’পা ধরে তোলা যায়। তবে বয়স্ক টার্কিকে ৪ মিনিটের বেশি সময় ঝুলিয়ে রাখা উচিৎ নয়।

প্রজনন সংক্রান্ত অভ্যাস ঃ

পূর্ণ বয়স্ক পূরুষ পাখির সঙ্গমকালিন আচরণকে সাধারণত স্ট্রাট বলা হয়, তখন তারা ডানাগুলি ছড়িয়ে দেয় ও ঘন ঘন একটি অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকে। স্বাভাবিক সঙ্গমে পুরুষ ঃ মাদীর অনুপাত মাঝারী ধরণের টার্কির জন্য ১.৫, বড় ধরণের জন্য ১.৩ থাকে। প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক মাদী পাখি থেকে গড়ে ৪০-৫০ টি ছানা পাওয়ার আশা করা যায়। উর্বরতা কমে যাওয়ার দরুন প্রথম বছরের পর পূর্ণ বয়স্ক পূরুষ পাখি সঙ্গমের জন্য খুব কমই ব্যবহার করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক পূরুষ পাখির কোনও একটি বিশেষ মাদীর প্রতি আকর্ষন জন্মানোর প্রবণতা থাকে, তাই প্রতি ১৫ দিন অন্তর আমাদের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখি বদলাতে হবে।

টার্কির সাধারণ রোগ, রোগের পরিচিতি, কারণ, লক্ষন ও প্রতিরোধঃ

রোগ	কারণ	লক্ষণ	প্রতিরোধ
অ্যারিজোনোসিস	সালমোনেলা অ্যারিজোনা	ছানা বাড়ে না এবং চোখে অস্বচ্ছতা ও অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত হবার সম্ভাব্য বয়স ৩-৪ সপ্তাহ।	সংক্রমিত ব্রীডারের পালকে বর্জন করা ও হ্যাচারী ফিউমিগেশন করা।
সিআরডি	মাইকোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম	কাশি,ঘর ঘর শব্দ, নাক দিয়ে সর্দি ঝরবে।	মাইকোপ্লাজমা বিহীন বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।
ফাউল কলের	পাস্চুরেলা মালটোসিডা	সবুজ, হলুদ পায়খানা	টিকা প্রদান
ফাউল পক্স	পক্স ভাইরাস	ঝুঁটি ও ওয়াটলে ফোসকা	টিকা প্রদান
রানিক্ষেত	প্যারামিক্সভাইরাস	সাদা পায়খানা,হা করে শ্বাস নেয়া	টিকা প্রদান
ট্যার্কি করাইজা	বরডেটেল্লা এভিয়াম	নাকে চাপ শব্দ, ফুসফুসে ঘর ঘর শব্দ।	টিকা প্রদান
কক্সিডিওসিস	আইমেরিয়া প্রটোজোয়া	রক্তযুক্ত ডায়রিয়া	যথাযথ জীবাণুনাশক ও লিটার ঠিক রাখা।

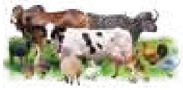

টিকা প্রদান কর্মসূচি ঃ

ক্রমিক নং	বয়স	টিকার নাম
১	১ দিন বয়সে	আইবি+এনডি টিকা
২	৪র্থ-৫ম সপ্তাহ	ফাউলপক্স টিকা
৩	৬-সপ্তাহ	আইবি+এনডি
৪	৭ সপ্তাহ	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা
৫	৮-১০ সপ্তাহ	ফাউল কলেরা টিকা

টার্কি বাজারজাত করা ঃ

পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও মাদী টার্কির ১৬ সপ্তাহে শরীরের ওজন হয় ৭.২৬ কেজি. এবং ৫.৫৩ কেজি। টার্কি বাজারজাত করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়।

টার্কির ডিম ঃ

একটি টার্কি ৩০ সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়া শুর করে। ডিম পাড়া আরম্ভ থেকে শুরু করে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম দেয়। সঠিক খাদ্য ও যথাযথ কৃত্রিম আলো প্রয়োগ করলে মাদী টার্কি বছরে ৬০-১০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। মোট ডিমের ৭০% বিকালে পাড়ে। টার্কির ডিম রঙিন হয়। ডিমের ওজন প্রায় ৮৫ গ্রাম হয়। ডিম একদিকে লক্ষণীয়ভাবে ছুঁচোল হয় ও খোসা শক্ত হয়। টার্কি ডিমে প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ থাকে যথাক্রমে-১৩.১%, ১১.৮%, ১.৭%,এবং ০.৮%। কোলেস্টরেল থাকে ১৫.৬৭-২৩.৯৭ মিগ্র./গ্রাম কুসুম।

টার্কির ডিম

টার্কির মাংস ঃ

টার্কির মাংস সুস্বাদু। এ মাংসে চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম থাকায় মানুষ এটি বেশি পছন্দ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম টার্কির মাংসে পোটিন ২৪%, ফ্যাট ৬.৬% ও এনার্জি ১৬২ ক্যালরি থাকে। এতে খনিজ পদার্থ -পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, সেলেনিয়াম, জিংক এবং সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। টার্কির মাংস ভিটামিন বি-৬, বি-১২ এবং নায়াসিন সমৃদ্ধ।

টার্কির মাংস

সেশন-৭৯

পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব এবং ক্ষতিকর প্রভাব

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব
- পোল্ট্রির উপর ক্ষাতদর প্রভাব
- রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগসমূহের প্রতিরোধ

পোল্টি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব ঃ

মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ বুনো-পাখিদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখিতে পরিণত করেছে। এসব গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি মানুষকে দিয়েছে উন্নতমানের আমিষ, স্নেহপদার্থ,খণিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ ডিম ও মাংস। মানুষ পোল্টির বিভিন্ন উপজাত বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করেছে। এদের পালক দিয়ে সাজিয়েছে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছেদ। লিটার মিশ্রিত মল সার হিসেবে ব্যবহার করেছে। মোটকথা, মানুষের খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোল্টির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের প্লোটির মধ্যে মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস, টার্কি, তিতির ইত্যাদি প্রধান। যদি ও বহু-প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এসব পোল্টি পালন করে আসছে, তথাপি এদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে আধুনিক ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খলভাবে পালনের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিন নয়। বর্তমানে পোল্টি পালন বিশ্বে এক ধরনের শিল্প হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পোল্টি শিল্প নামে খ্যাত এ শিল্প মানুষকে এনে দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করলে ও বাংলাদেশে এ শিল্প একেবারে নতুন, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল। তবে, এখনো এদেশে এ শিল্পের বিকাশ যথেষ্টে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পুঁজির অভাব, খাদ্য সমস্যা, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, বিপণন সমস্যা, রোগব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে রোগ-ব্যাধির সমস্যাটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। কাজেই পোল্টি খামার থেকে লাভ পেতে হলে অর্থাৎ পোল্ট্রি থেকে সঠিক উৎপাদন পেতে হলে এদের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে খামারী বা পালনকারিকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। পোল্ট্রি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এসব রোগ পোল্টির উৎপাদন ব্যহত করা ছাড়া ও এদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোল্ট্রির রোগব্যাধি দূরীকরণে বা দমনে সাধারণত চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি কার্যকরী। তাই খামারকে রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজন উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশনব্যবস্থা এবং পোল্টিকে নিয়মিত টিকাদান।

পোল্ট্রির ওপর রোগ-ব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

পোল্ট্রি থেকে হারে উৎপাদন পাওয়ার প্রধান অন্তরায় হলো রোগব্যাধি। বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি পোল্ট্রিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে। এতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এদের মৃত্যু ও ঘটে থাকে। কাজেই রোগ-ব্যাধির কারনে পোল্ট্রির উৎপাদন মারাত্নকভাবে ব্যাহত হয়। হাঁসমুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। এগুলো নানাভাবে পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। কিছু কিছু রোগ সরাসরি আক্রমন করে। আবার কিছু কিছু রোগ যেমন- স্পাইরোকিটোসিস ও এভিয়ান ম্যালেরিয়া কীটপতঙ্গ অর্থাৎ ভেক্টরের মাধ্যমে ছড়ায়।

মুরগির কয়েকটি রোগ যেমন-ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, পুলেরাম ইত্যাদি ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্য ফোঁটা বাচ্চায় ছড়ায়। এ রোগগুলো একদিকে যেমন দমন করা কঠিন, অন্যদিকে তেমনি ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন একেবারে কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এসব রোগে আক্রান্ত মুরগির মৃত্যুহার ও অত্যন্ত বেশি। খামার উন্নয়নে প্রোটাজোয়া জনিত ককসিডিওসিস রোগ একটি মারাত্নক সমস্যা। এ রোগের ফলে বাচ্চা মুরগির মৃত্যু হার ১৫-২০% এ দাঁড়ায়। কোনো খামারে একবার রোগের অনুপ্রবেশ ঘটলে রোগনিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল হয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে মুরগির বাড়ন ব্যাহত হয় এবং রোগ থেকে সেড়ে ওঠা মুরগির উৎপাদন একেবারে কমে যায়। মুরগির ডিম উৎপাদনে ভাইরাসঘটিত এগ ড্রপ সিন্ড্রোম নামক রোগটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ রোগে আক্রান্ত ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমতে কমতে শূন্যেও কোঠায় পৌছে। সঠিক সময়ে ও নিয়ামানুযায়ী টিকা প্রদান করা না হলে পোল্ট্রিতে ভাইরাসঘটিত রোগ। যেমন- রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক্স ইনফেকসাস ব্রঙ্কাইটিস, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এসব রোগ একবার কোনো এলাকায় বা খামারে মহামারি দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভাইরাস ঘটিত রোগ হওয়ায় এখন পর্যন্ত এগুলোর কোনো চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। এসব রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে

১০০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বা সর্দি রোগ বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা। ডিম ফোটানোর যন্ত্র কিউবেটর স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিচালনা না করলে বাচ্চায় ওমফ্যালাইটিস রোগ দমন করা যাবেনা। কারণ এ রোগেরজীবানু Escherichia coil (ইস্কোরিশিয়া কলাই) এমনিতেই প্রকৃতিতে অবস্থান করে। অত্যধিক ঠান্ডায় এ রোগের জীবাণু মুরগিকে আক্রান্ত করে। এ রোগ গুলো ফলে একদিকে যেমন মুরগির মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে বাড়ন্ত মুরগির বাড়ন ব্যাহত হয় ও উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজ পদার্থ সরবারহ না করলে ভিটামিন ও খনিজের অভাব জনিত রোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশে এ সমস্যাটি ব্যাপক। এসব রোগের ফলে মুরগি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায় এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশে সঠিক নিয়মে খাদ্য সংরক্ষণ করা এক বিরাট সমস্যা। পোল্ট্রির খাদ্য সঠিক ভাবে সংরক্ষণ না করলে খাদ্যে এক ধরনের ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে। এ ছত্রাক এক ধরনের বিষ উৎপন্ন করে যা খেলে পোল্ট্রিতে মাইকোটক্সিকোসিস রোগ দেখা দেয়। ফলে এদের ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং মৃত্যুহার অত্যন্ত বেড়ে যায়।

পোল্ট্রিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ ঃ

নিম্ন লিখিত কারণে এদেশে পোল্ট্রিতে রোগ ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। যেমন-

- কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাবণ্ড এদেশে কোনো কার্যকর পোল্ট্রি নীতি না থাকায় পরিচিতি ছাড়াই অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে রোগাক্রান্ত ডিম, বাচ্চা, মুরগি ইত্যাদি আমদানি হচ্ছে।
- সঠিক ভাবে খাদ্য সংরক্ষণের অভাবণ্ড বেশির ভাগ খামারেই সঠিক ভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে এতে নানা রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। তাছাড়া খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমিত মাত্রায় মিশিয়ে সরবরাহনা করলে পাখি রোগাক্রান্ত হয়।
- মৃত পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে কুকুর, শিয়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সেগুলো খায় ও পরিবেশে রোগ জীবাণু ছড়ায়।
- ইনকিউবেটর ও হ্যাচারির অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত না করলে এগুলো থেকে ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় রোগ ছড়াতে পারে।
- ইঁদুর ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।
- কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে রোগ ছড়াচ্ছে।
- বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও অনেক রোগের জীবাণু ছড়াচ্ছে।
- দূষিত পানি রোগ-জীবাণু ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম।
- পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়ায়।
- পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।
- খামারে মানুষ অবাধে চলাফেরা করলে মানুষের জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

সেশন-৮০

পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগবালাই পরিচিতি (ফাউল কলেরা ও সালমোনেলোসিস)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ ফাউল কলেরা রোগের কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও প্রতিরোধ
- ➢ সালমোনেলা রোগের কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও প্রতিরোধ।

ফাউল কলেরা

ফাউল কলেরা ঃ

ফাউল কলেরা গৃহপালিত ও বন্যপাখির একটি ছোঁয়াচে রোগ।

কারণ ঃ Postteurella multoeida নামক গ্রাম নিগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়।

বিস্তার ঃ আক্রান্ত হাঁস মুরগি থেকে সরাসরি সুস্থ হাঁস মুরগিতে বিস্তার করে।

রোগ লক্ষণ ঃ

একিউট পর্যায়ঃ

- কোন প্রকার লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ করে মারা যেতে পারে।
- কখনো কখনো জ্বর, ক্ষুধামন্দা, নাকমুখ দিয়ে পানি পড়া, পাতলা পায়খানা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

ক্রনিক পর্যায়ঃ

ক্রনিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে-

- দল থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া
- শ্বাস কষ্ট
- খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটা
- চোখে ময়লা জমা
- ঝুলি ফুলে যাওয়া
- পা ও ডানার জোড়া ফুলে যাওয়া

প্রতিরোধ ঃ

- নিয়মিত টিকা প্রদান
- মৃত পাখি মাটির নিচে পুতে ফেলা

সালমোনেলোসিস/পলুরাম ডিজিজ ঃ

সালমোনেলোসিস মুরগির একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ।

কারণ ঃ Salmonella pullorum নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়।

রোগের বিস্তার ঃ

- প্রধানত: ডিমের মাধ্যমে মুরগির বাচ্চাতে বিস্তার লাভ করে
- এছাড়া আক্রান্ত মুরগি/মুরগির বাচ্চা থেকে সুস্থ গুলোতে রোগ ছাড়াতে পারে।

সালমোনেলোসিস ডিজিজ

রোগ লক্ষণ ঃ

- ঝিমুনি , শ্বাস কষ্ট, সাদা আঠালো পায়খানা, ক্ষুধামন্দা এবং মৃত্যুহার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।
- ক্রনিক পর্যায়ে আক্রান্ত মুরগি সাধারনত : বাহক হিসাবে কাজ করে।
- ঝুটি সাদা হয়ে যায়।
- হক জয়েন্ট ফুলে যায় এবং খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ ঃ

- বাহক মুরগি নিধন করে।
- বাসস্থান জীবানু মুক্ত করা।
- সালমোনেলা মুক্ত বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করা।

সেশন-৮১

পোল্ট্রির ভাইরাস জনিত রোগ বালাই পরিচিতি-১
(রানীক্ষেত ও ফাউলপক্স)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ রানীক্ষেত রোগ পরিচিতি
- ➢ রানীক্ষেত রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ
- ➢ ফাউলপক্স রোগ পরিচিতি
- ➢ ফাউলপক্স রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ

রাণীক্ষেত রোগঃ

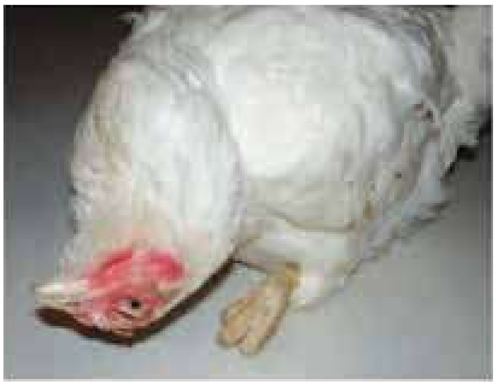

রাণীক্ষেত মুরগির ভাইরাস জনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কম বেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্নক ও গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি মারাত্নকভাবে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায় , যেমন- শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়ে ও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে সনাক্ত করা হয়। তাই একে নিউক্যাসল ডিজিজ বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটি ধরা পড়ে বলে একে রাণীক্ষেত রোগ বলা হয়।

রোগ সংক্রমণ (Disease Transmission) নিম্ন লিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

- ▪ বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- ▪ অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, কাশি, হাঁচি থেকে সুস্থ পাখিতে এ রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।
- ▪ আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- ▪ মৃত মুরগি বা পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে।
- ▪ বন্য পশু-পাখির মাধ্যমে ।
- ▪ পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- ▪ খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ (clinical signs) ঃ

এ রোগের প্রধানত শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়।

নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেমন-

- প্রথম দিকে আক্রান্ত পাখি দল ছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- মাথায় কাঁপুনি হয়, ঘনঘন শ্বাস গ্রহণ করে।

- সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাক মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- শরীর শুকিয়ে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখ মুখ ফুলে যায়।
- ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

রোগ প্রতিরোধ (Prevention) ঃ প্রতিরোধই এ রোগ দূরীকরণের একমাত্র উপায়। তাই সময় মতো পাখিদের টিকা দান করতে হবে। বাংলাদেশে রাণীক্ষেত রোগের দু'ধরনের টিকা প্রস্তুত হয়। যথা- বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.।

পোল্ট্রির বসন্ত রোগঃ.

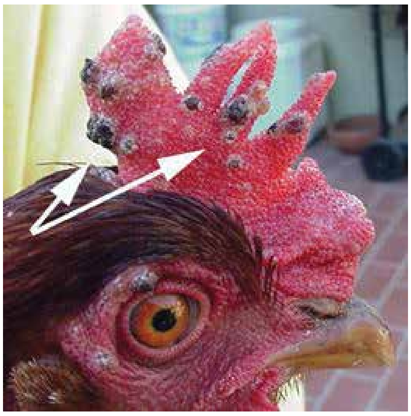

পোল্ট্রির বসন্ত বা ফাউল পক্স (Fowl Pox) একটি ভাইরাস জনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের ও সব প্রজাতির পোল্ট্রি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পোল্ট্রির বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এ রোগের সঙ্গে পরিচিত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মৃত্যুহার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পোল্ট্রির বসন্ত রোগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও, যেমন- পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখাযায়। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল (Nodule) সৃষ্টি হয় যা বসন্তের গুটি নামে পরিচিত।

রোগের লক্ষণ ঃ

বসন্ত রোগ প্রধানত দু'প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা-

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম (Cutaneous or Head Form) ঃ এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখ-মন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্তও (Dry Pox) বলা হয়।

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি (Diptheritic Form) ঃ এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালি ও ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে। অপ্রধান জীবাণুর জটিলতায় অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত (Wet Pox) নামে ও পরিচিত।

এ দু'প্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যেমন-

মৃদু প্রকৃতির বসন্তে-

- পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোস্কা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- মুরগির ঝুঁটি, গল-কম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।
- চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে-

- দেহের মুখ-গহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রের দেয়ালে ও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
- শ্বাস নালি আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
- এতে ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- এতে পাখির মৃত্যু হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ

নিম্ন লিখিত ভাবে পাখিতে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে। মুরগির আক্রান্ত স্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা-

১. আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।
২. পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজ পূর্ণ হয় ও পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে। এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।

আক্রান্ত পাখির ক্ষতের নমুনা সুস্থ পাখির ঝুঁটি বা পালকের ফলি কুলে আঁচড়িয়ে প্রবেশ করিয়ে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুটি দেখে।

- পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোস্কা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- মুরগির ঝুঁটি, গল-কম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।
- চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে-

- দেহের মুখ-গহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রের দেয়ালে ও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
- শ্বাস নালি আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
- এতে ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- এতে পাখির মৃত্যু হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ

এ রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষতে জীবাণু নাশক ওষুধ (যেমন-মারকিউরিক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো জীবাণু নাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সময়মত ফাউল পক্সের টিকা প্রদান করলে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সেশন-৮২

পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত রোগ বালাই পরিচিতি-২ (ডাকপ্লেগ)

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ রোগ পরিচিতি
- ডাক প্লেগের কারণ, সংক্রমন ও লক্ষণ
- ডাক প্লেগ রোগ প্রতিরোধ

হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ (Duck Plague) ঃ

হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ (Duck Plague) একটি তীব্র প্রকৃতির ভাইরাস জনিত সংক্রমক রোগ। এ রোগে যে কোনো বয়সের গৃহপালিত বা বুনোহাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি আক্রান্ত হতেপারে। এ রোগ মহামারি আকারেও দেখা দিতে পারে। উচ্চ মৃত্যুহার, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ও ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে ৫-১০০% মৃত্যুহার হতেপারে। এ রোগকে ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিসও (Duck Viral Enteritis) বলা হয়।

রোগের কারণ ঃ

হার পেসভিরিডি (Herpesviridae) পরিবারের অন্তর্গত ডাক হারপেস ভাইরাস ১, অ্যানাটিডহারপেস ভাইরাস ১ বা ডাক প্লেগ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ ঃ

নিম্ন লিখিতভাবে সুস্থ হাঁসে বা রাজহাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছড়াতে পারে। যেমন- রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, দুষিত খাদ্য, পানি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে ডাক প্লেগের সংক্রমণ ঘটে।

- রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে। ● দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- রুগ্ন পাখি বেচা কেনার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে। ● কীট-পতঙ্গের মাধমে।

রোগের লক্ষণ ঃ

আক্রান্ত পাখিতে নিম্ন লিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন-

● আকস্মিক রোগাক্রমণ, অধিক ও অপরিবর্তিত মৃত্যুহার। ● হঠাৎ ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হাঁসের আকস্মিক রোগাক্রমণ অধিক মৃত্যু ঘটে। ● মৃত হাঁসের পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে থাকে ● আলোতাঙ্ক দেখা দেয় ● ক্ষুধা মন্দা থাকে ● প্রচন্ড পিপাসা থাকে ● নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝড়ে ● পালক উসকো-খুশকো হয় ও পাখা ঝুলে থাকে ● চলাফেরায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়

● পাতলা পায়খানা হয় যা পাখির যে আশেপাশে লেগে থাকে ● ঘাড় মাথা বাকা করে উপরের দিকে চেয়ে থাকে। এটি ডাক প্লেগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

নিম্ন লিখিতভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন-

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে
- অসুস্থ হাঁস মুরগিকে পৃথক করে রাখতে হবে
- খামারের ঘরদোর,যন্ত্রপাতি, রোগাক্রান্ত পাখির ঘর, লিটার ইত্যাদি জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে
- রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত ডাকপ্লেগ টিকা প্রয়োগ সর্বোত্তম পন্থা ।

সেশন-৮৩
পোল্ট্রি খামারের জীব নিরাপত্তা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- জীব-নিরাপত্তা ও এর গুরুত্ব
- বায়োসিকিউরিটির তিনটি প্রধান তিনটি অঙ্গ
- রোগ প্রতিরোধের চাবিকাঠি
- মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায়
- স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা

জীব-নিরাপত্তা (Bio-security) ঃ

বর্তমান বিশ্বে পোল্ট্রি শিল্পে ‘জীব-নিরাপত্তা’ বা Bio-security কথাটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে। রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রি রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি আছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে ‘জীব-নিরাপত্তা’ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রির জীবন রক্ষা করা বা নিরাপত্তা বিধান করা। তবে, যদিও ‘জীব-নিরাপত্তা’ কথাটি পোল্ট্রি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে তথাপি এ সম্পর্কে অনেক খামারির মধ্যেই বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন হয়তো পোল্ট্রি হাউজের প্রবেশপথ জীবাণুনাশক দিয়ে বা এ জাতীয় কিছু টুকটাক ব্যবস্থার মাধ্যমেই পোল্ট্রির ‘জীব-নিরাপত্তা’ বিধান করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। আসলে জীব-নিরাপত্তা হচ্ছে সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি ব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে। রোগ ও রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি রয়েছে তাদের সমন্বয়কে একত্রে ‘জীব-নিরাপত্তা’ বলে অভিহিত করা হয়।

একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পোল্ট্রি ফার্মের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, বন্য শিকারী জন্তু, রোডেন্ট ইত্যাদি কবল থেকে মুরগিকে রক্ষা করা যায়। কম খরচে সবচেয়ে কার্যকর একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো জীব-নিরাপত্তা। বায়োসিকিউরিটি ছাড়া কোনভাবেই পোল্ট্রি ফার্ম রোগমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। তাই জীব নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম।

জীব নিরাপত্তার গুরুত্ব ঃ

বায়োসিকিউরিটির তিনটি প্রধান তিনটি অঙ্গ ঃ জীব-নিরাপত্তা (Bio-security) রোগ প্রতিরোধের চাবিকাঠি, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায়, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা, পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায়, পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ।

- পরিবেশ বান্ধব খামার ব্যবস্থাপনার জন্য জীব-নিরাপত্তা একটি অপরিহায্য বিষয় ।
- রোগব্যাধী নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।
- জীব-নিরাপত্তা ছাড়া পোল্ট্রি ফার্ম পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- খামার বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয়।

DANGER
VISITORS
PLEASE RESPECT
FARM BIOSECURITY

বায়োসিকিউরিটির তিনটি প্রধান তিনটি অঙ্গ ঃ

- আইসোলেশান
- ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ
- স্যানিটেশন

আইসোলেশান ঃ

মুরগিকে বয়স অনুযায়ী আলাদা শেডে রাখতে হবে-অল-ইন-অল-আউট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ফার্মের চারিদিকে ভালো করে বেড়া দিতে হবে যাতে করে বন্য জীব-জন্তু বা ক্ষতিকর কোন কিছু ফার্মে ঢুকতে না পারে।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ফার্মের ভিতর এবং বাইরে। প্রয়োজনে চলাচল অবশ্যই করতে হবে। তবে অবাধ বিচরণ পরিহার করতে হবে ফার্মের ভালোর জন্য। যে কোন যানবাহন ফার্মে ঢোকানোর সময় ভালোভাবে জীবাণু মুক্ত করণের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ যানবাহনের সাথে অসংখ্য জীবাণু ফার্মে প্রবেশ করে থাকে এবং জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্তা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। নতুন মুরগির বাচ্চা ঢোকানোর পূর্বে ভালোভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ঢুকানো উচিৎ। কারণ নতুন বাচ্চার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অজানা। তা ছাড়া খামারে মুরগি আপাতত সুস্থ্য মনে হলেও রোগের জীবাণু বহন করতে পারে এবং নতুন বাচ্চার দেহে সে সমস্ত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। এ জন্য নতুন বাচ্চা ঢোকানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

স্যানিটেশন ঃ

জীবাণু মুক্ত করণ করে খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। ফার্মের কর্মীদের ব্যবহার্য জামা-কাপর জুতা-সেন্ডল পরিস্কার করে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। ফার্মে প্রবেশ পথে ফুট বাথ থাকতে হবে এবং সব সময় ব্যবহার উপযোগী আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, প্রতিবার মুরগি পরিচর্যা করার পর হাত ভালো করে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে।

পোল্ট্রি খামারে সংক্রামক রোগ বিস্তার

যে কারণে সংক্রামক রোগ এক ফার্ম থেকে অন্য ফার্মে ছড়ায় ঃ

- ➢ রোগাক্রন্ত মুরগি ফার্মে প্রবেশ করিয়ে।
- ➢ রোগ থেকে ভালো হওয়া মুরগি কিন্তু রোগের জীবাণু বহন করছে (বাহক) এমন মুরগি খামারে প্রবেশের মাধ্যমে।
- ➢ কেয়ারটেকার, যারা এক শেড থেকে অন্য শেডে যাতায়াত করে, তাদের ব্যবহৃত জুতা, সেন্ডল, পরিধানের বস্ত্র হতেও রোগ ছড়াতে পারে ।
- ➢ রডেন্টস, মুক্তভাবে উড়ে বেড়ানো পাখি।
- ➢ দূষিত খাদ্য, পানি সরবরাহের মাধমে রোগ ছড়ায়।
- ➢ মৃত মুরগি যদি ফেলে রাখা হয় তা হলে দ্রুত রোগ-জীবাণু অন্য শেডের মুরগিকে আক্রান্ত করবে।
- ➢ ডিমের ট্রে যদি ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত না করে ফার্মে প্রবেশ করানো হয় তা হলে রোগ ছড়াতে পারে।

খামারে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায় ঃ

মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. অ-প্রয়োজনে যে কোনো দর্শনার্থীকে খামারের ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া।

২. যেসব দর্শনার্থী অনুমতি সাপেক্ষে খামারে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেকের রেকর্ড রাখতে হবে।

৩. এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার দ্বারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে। অর্থাৎ ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকার মধ্যে ডিভাইডার (Divider) থাকবে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে পরিষ্কার এলাকায় যেতে হলে নিজেকে অবশ্যই জীবাণু মুক্ত হতে হবে।

৪. যে কোনো বড় খামারের ক্ষেত্রেই গাড়ি পার্কিংয়ের এলাকা, দর্শনার্থী কক্ষ ইত্যাদিকে ময়লা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার এবং গাড়ি দুটোই ময়লা হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই পোল্ট্রি সামগ্রী বহনকারী গাড়ি, ড্রাইভার এবং পোল্ট্রি ম্যানকে পরিষ্কার এলাকাতে ঢুকতে হলে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

৫. দর্শনার্থীর মধ্যে যারা পোল্ট্রি খামারের পরিষ্কার এলাকায় প্রবেশ করবে তাদেরকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। আর পোল্ট্রি হাউজে যেসব পোল্ট্রিম্যান কাজ করতে ঢুকবে তারা অবশ্যই রাবারের জুতো, বিশেষ ধরনের জামা ও মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি পরে ঢুকবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি হাউজের দরজার সামনে জীবাণু নাশক ওষুধ থাকবে যা তাদেরকে মাড়িয়ে যেতে হবে।

৬. তাছাড়া খামারের এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। সে কারণেই সম্ভব হলে প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত। খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

৭. খামারের নিজস্ব পোল্ট্রি বাদে আশেপাশের এলাকার যে কোনো পোল্ট্রি, পোষা পাখি বা প্রাণী এবং বন্য জন্তু রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কাজেই এগুলোকে খামারের ত্রি সীমানায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৮. বন্য-জন্তু এবং ইঁদুর যেহেতু পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাই ঘরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদিতে চিকন তারজালির লাগিয়ে হাউসে এদের প্রবেশ রোধ করা যায়। খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাছাড়া পোল্ট্রির ঘরে ব্যবহৃত খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৯. স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাঃ

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে নিরমোক্ত বিষয়গুলো অবশ্য পালনীয়ণ্ড সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং আশেপাশে অন্য কোনো পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার না থাকলেই ভালো।

১০. আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

১১. খামারে বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি পালন না করা।

১২. বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করা।

বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহীন পোল্ট্রি সুস্থ পাখিদের থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথক করে ফেলা। স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ডিম ফোটানোর পূর্বে সঠিকভাবে ফিউমিগেশনের মাধ্যমে তা জীবাণুমুক্ত করা।

১৩. খামার থেকে কোনো একটি ব্যাচ বিক্রি করার পর বা ঘর থেকে স্থানান্তর করার পর সেখানে আরেকটি ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে অবশ্যই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এরপর পরবর্তী ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে ঘর কিছুদিন খালি অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত। তাছাড়া খামারের অন্যান্য ঘরদোর, জিনিসপত্র, সরঞ্জামও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

১৪. ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণী বা রডেন্ট (Rodents), কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামার মুক্ত রাখতে হবে। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে ঘরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে ভালোভাবে প্লাস্টার (Plaster) করতে হবে। তাছাড়া ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কোনো ফাঁক-ফোকড় না থাকে। ভেন্টিলেটর, জানালা বা অন্যান্য খোলা জায়গায় চিকন তারজালির লাগিয়ে খামারে এদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না।

১৫. খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাকে তাকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। যদি কারও প্রবেশের প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। কোনো দর্শনার্থীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে তাকে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়।

১৬. মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশেপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের ওপর নির্ভর করে করতে হবে। তাছাড়া সময়মতো কৃমির ওষুধও খাওয়াতে হবে। তবে কোয়েলের ক্ষেত্রে এসবের কোনো দরকার নেই। মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

১৭. মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন- খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, ওষুধ বা টিকার খালি শিশি (Vial) ইত্যাদি গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সেশন-৮৪

মুরগির পরজীবীজনিত রোগ পরিচিতি

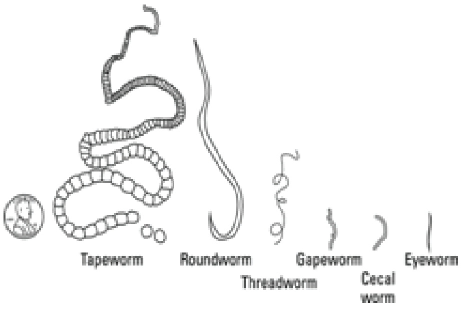

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- মুরগির অন্ত পরজীবী নিয়ন্ত্রণ
- মুরগির গোল কৃমি রোগের লক্ষণ ও রোগ-প্রতিরোধ
- বৃহদান্ত্রের কৃমি রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধ
- ফিতা কৃমি রোগের লক্ষণ ও রোগ-প্রতিরোধ

মুরগির অন্তঃপরজীবী নিয়ন্ত্রণ ঃ

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পোল্ট্রিতে আন্ত্রিক কৃমি বা পরজীবীর সংক্রমণ প্রায়ই ঘটে থাকে। সাধারণত দুই ধরণের আন্ত্রিক পরজীবী পোল্ট্রিকে বেশি আক্রমণ করে থাকে। যেমন- ১) গোল কৃমি (Roundworms), ২) ফিতা কৃমি (Tapeworms)। তবে উন্নত মানের ব্যবস্থাপনা, অল্প সময়ে পালন করা মুরগি বিশেষ করে ব্রয়লার পালন, খাচায় মুরগি পালন এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা ইত্যাদির কারণে হাঁস-মুরগির অন্তঃপরজীবী আক্রান্তের হার অনেকাংশে কমে গেছে। তবুও অনেক সময় বিশেষ করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গৃহ-পালিত মোরগ-মুরগি এবং ডিপ লিটার পদ্ধতিতে পালন করা ডিম পাড়া ও ব্রিডার মুরগিতে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

যে সমস্ত উপায়ে কৃমি বা পরজীবী মোরগ-মুরগির ক্ষতি সাধন করে থাকে তা নিম্নরুপ -

- প্রতিটি কৃমির একটি নির্দিষ্ট আবাসস্থল আছে যেখানে সে বসবাস করে এবং উক্ত স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে। ফলে মুরগির স্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্মের ব্যঘাত ঘটে এবং মুরগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- খাদ্য অন্ত্রে যদি অনেক কৃমির উপস্থিতি ঘটে তাহলে হজমে ব্যঘাত ঘটে এবং মোরগ-মুরগি মারাও যেতে পারে।
- কৃমি অন্ত্রে অবস্থান করে মুরগির খাদ্য থেকেই পুষ্টি গ্রহণ করে ফলে মোরগ-মুরগি অপুষ্টিতে ভোগে।
- ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরিস্থিতি আরো মারাত্বক আকার ধারণ করতে পারে।
- কিছু পরজীবী টক্সিন ছড়াতে পারে।
- মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।
- বাড়ন্ত মুরগির বৃদ্ধি কমে যায় অবশেষে দুর্বল হয়ে মারা যায়।

মুরগির বিষ্ঠায় দৃশ্যমান কৃমি

মুরগির গোল কৃমি (এসকারডিয়া গেলি)

মুরগির গোল কৃমি ঃ

এ কৃমি দেখতে অনেকটা কেঁচোর মত বলে এদেরকে কেঁচো কৃমি বলে। এরা মুরগির ক্ষুদ্রান্তে বাস করে। এ কৃমি মুরগি ছাড়াও গিনি ফাউল, টার্কি, রাজহাঁস ও বন্যপ্রাণীকে আক্রান্ত করে। কেঁচো ও ফড়িং এদের ডিম খেয়ে এ রোগের বিস্তারে সাহায্য করে। বড় কৃমিরা খাদ্য নালিতে ডিম পাড়ে যা বিষ্টার সাথে বের হয়ে আসে এবং খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ্য মুরগির দেহে প্রবেশ করে।

রোগের লক্ষণ ঃ

দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হবে না। আক্রান্ত মুরগি ঝিমাবে, পালক উসকো-খুসকো থাকবে। পাতলা পায়খানা হবে। ডিম পাড়া এবং দেহের বৃদ্ধি কমে যাবে।

রোগ-প্রতিরোধ ঃ খামারের পরিবেশ সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে। বন্য-পাখি থেকে খামারের পাখিকে নিরাপদে রাখতে হবে। বিভিন্ন বয়সের মুরগি এক সংগে রাখা যাবে না। কেঁচো এ রোগ ছড়ায়, কাজেই মুরগি যেন কেঁচো না খায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মিত মুরগীকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে।

বৃহদান্ত্রের কৃমি ঃ

হেটারকিস গেলিনেরাম- এ ধরণের কৃমি সাধারণত খাদ্য নালির সিকামে থাকে যা ১-১.৫ সেমি. পর্যন্ত লম্বা, সাদা রং-এর সুতার মত দেখতে। বিষ্ঠার সাথে এদের ডিম বাইরে আসে এবং সেখান থেকে বাচ্চা, যা আবার সুস্থ্য মুরগি খায় এবং এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ মুরগি ঝিমাবে, কম খাবে, ডিমপাড়া কমে যাবে, বাদামি রং-এর পাতলা পায়খানা হবে, মুরগি শুকিয়ে যাবে। পরিশেষে আক্রান্ত মুরগি মারা যাবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। খাদ্য ও পানি যাতে বিষ্ঠা দ্বারা দূষিত হতে না পারে সে দিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। রুটিন অনুযায়ী ডি-ওয়ার্মিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ফিতা কৃমি ঃ

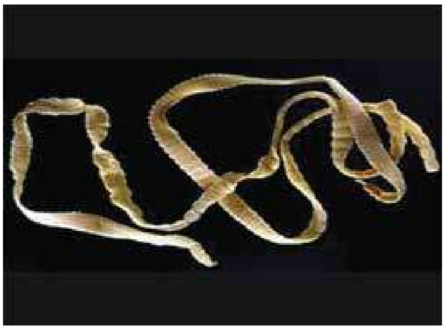

বেশ কয়েক রকমের ফিতা কৃমি মুরগিকে আক্রান্ত করে। এদের কোনটা ১ মিমি. থেকে ও ছোট আবার কোনটা ২৫ সেমি. এর মত লম্বা হতে পারে। এসব কৃমি খাদ্য নালির মাঝে থাকে। কৃমির ডিম বিষ্টার সাথে বাইরে আসে এবং শামুক, ঝিনুক, মাছি, বা পিপড়া ইত্যাদি যেখানে যেটা প্রযোজ্য তার ভিতর প্রবেশ করে। হাঁস বা মুরগি যখন এসব বাহক প্রাণি খায় তখন এরা নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ রোগের তীব্রতা ফিতা কৃমির প্রজাতি ও মুরগি বয়সের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত মুরগির বাচ্চা এ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত মুরগি খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখায়, পানির পিপাসা বৃদ্ধি পায়। ফিতা কৃমির সংক্রমণের ফলে রক্ত শুন্যতা দেখা দেয় ও মুরগি কৃশকায় হয়ে পড়ে। সংক্রমণ মারাত্মক হলে অল্প বয়সী মুরগির মৃতু হতে পারে। ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়। পালক উসকো-খুসকো থাকে, পাতলা পায়খানা হয়।

রোগ-প্রতিরোধ ঃ ফিতা কৃমি সংক্রমণে মাধ্যমিক পোষকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং রোগ প্রতিরোধের জন্য মাধ্যমিক পোষকের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।সে জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা নিম্নরূপ-

১. কীটনাশক ঔষধ ক্লোরডন বা প্যারাথিওন স্প্রে করে মাধ্যমিক পোষক যেমন- মাছি, ফড়িং, গুবরে পোকা ইত্যাদি নিধন করতে হবে।

২. শামুক নির্মূলের জন্য কপার সালফেট ১০ঃ১০০০০০ অনুপাতে স্প্রে করলে ৮ ঘন্টার মধ্যে শামুক মারা যাবে।

৩. খামারে নিয়মিত ভাবে ফিতা কৃমি-নাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

সেশন-৮৫

পোল্ট্রি খামারের জীবানুনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাঁস-মুরগির খামারের জীব নিরাপত্তা
- জীবানুমুক্ত করণের উদ্দেশ
- জীবানুমুক্ত করণের বিভিন্ন পদ্ধতি

হাঁস-মুরগির খামারের জীব নিরাপত্তা ঃ

জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা যা নানা ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে একটি খামারের মধ্যে অথবা আন্তঃ খামারের মধ্যে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রোগ জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করে।

জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধাপগুলো হলো-

- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা
- বন্যপাখির প্রবেশ বন্ধ করা।
- পোকামাকড় ধবংস করা।
- বাহিরের লোক জনের অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত বন্ধ করা।
- জীবানু ধবংসের বিভিন্ন পদ্ধতি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা।
- খামারে আলো বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা।
- স্যাঁতস্যাতে অবস্থা মুক্ত করা।
- সময়মত ও নিয়মিত টিকা প্রদান করা।
- চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা।

জীবাণুমুক্ত করণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের উদ্দেশ্য ঃ

জীবাণুমুক্ত করনের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন প্রকারের রোগ বালাই প্রতিরোধ করা।
- রোগবালাই জনিত ক্ষতি হ্রাস করে খামারকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা।

জীবাণুমুক্ত করনের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

ফিউমিগেশন -

সাধারণত ফরমালিন ও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করে জীবাণুনাশ করার পদ্ধতিকে ফিউমিগেশন বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য-

- ফরমালিন- ৫২.৫ গ্রাম,
- পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ১০৫ গ্রাম
- মাটির পাত্র- যে পরিমান ঔষধ হবে তার ১০ গুন বেশি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ও চ্যাপ্টা পাত্র নিতে হবে।

পদ্ধতি ঃ

- ঘরের জানালা দরজা ভালভাবে বন্ধ করে নিতে হবে।
- যে ব্যক্তি ফিউমিগেশন করবেন তাকে রাবারের হাতমোজা ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হবে।
- মাটির পাত্রে ফরমালিন দিয়ে তাতে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশাতে হবে।
- এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- তারপর ঘরের জানালা দরজা খুলে দিতে হবে এবং ধোয়া সম্পূর্ন রূপে বের হলে ঘরটি ব্যবহার করতে হবে।

জীবানুনাশক স্প্রেঃ

বিভিন্ন জীবানুনাশক (আয়োসন, ভিরকনএস, ডেটল, সেভলন প্রভৃতি) দিয়ে হ্যান্ড স্প্রেয়ার বা মেশিন স্প্রেয়ার দিয়ে খামার এবং খামারের যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত করা হয়।

ফুটবাথ ঃ

খামারের ঢোকার পথে জীবাণুনাশক দিয়ে পা ধৌত করণের পদ্ধতিকে ফুটবাথ বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ০.০১% দ্রবণ

পদ্ধতি ঃ

- খামারে ঢোকার পথে আয়তাকার ৩-৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সিমেন্ট দিয়ে আস্তর দিতে হবে।
- এই গর্তে ০.০১% পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ঢেলে দিতে হবে।
- খামারে প্রবেশকারী এই দ্রবণে পা চুবিয়ে খামারে প্রবেশ করবে।
- এই পদ্ধতি জুতা বা পায়ে লেগে থাকা রোগজীবাণূ ধবংস হয়।

সেশন-৮৬

হাঁস মুরগির টিকাবীজের প্রকারভেদ, টিকাবীজ পরিবহন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা বা শেখা যাবে-

- ➢ টিকার প্রকারভেদ, টিকাবীজ পরিবহন পদ্ধতি
- ➢ টিকা সংরক্ষণের নিয়মাবলী
- ➢ হাতে কলমে টিকা টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি শেখা

টিকা সমুহকে উহার কার্যকরী ক্ষমতা ও প্রস্তুত প্রণালীর উপর ভিত্তি করে প্রধাণত দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

১. **জীবন্ত টিকা (live attenuated vaccine) ঃ** জীবন্ত টিকা যা জীবন্ত রোগজীবাণু কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে অসমর্থ। এই প্রকা টিকার জীবাণুকে বিভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এমনভাবে দুর্বল করে তোলা হয় যে, উক্ত টিকায় অবস্থিত ভাইরাসের রোগ তৈরি ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। উপরন্তু রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। জীবন্ত টিকাকে আদর্শ টিকা বলা হয়। কারণ, এ থেকে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী এবং ইহা প্রয়োগের ফলে পশুপাখিতে অতিদ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

২. **মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকা (killed vaccine) ঃ** মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত এ টিকাও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। এই ধরনের টিকায় ভাইরাস মৃত থাকে। তাই রোগ তৈরির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রকারে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে ফলে ধীরে ধীরে ইমিউনিটির সৃষ্টি হয়। ইহা মূলত লাইভ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাকে ধরে রাখে। লাইভ ভ্যাকসিনের ন্যায় এই প্রকারের ভ্যাকসিন কর্তৃক সৃষ্ট ইমুউনিটি অতি দ্রুত নেমে যায় না।

টিকাবীজ পরিবহন ঃ

কুল বক্স

কুল ভ্যান

পোল্ট্রি সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয়। এ ছাড়াও বাণিজ্যিক খামারগুলি টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ বহন করতে হয়। এটা cool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই পশুপাখিকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা-

১. টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া যায়। তবে, বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।

২. বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (cool room) রেখে স্থানান্তর করা হয়।

৩. থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে করে বেশি সময় ধরে পরিবহনের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাক্সে রাখতে হবে।

৪. টিকা কুলবক্সের বা ফ্লাক্সের বাইরে বের করে থইং (thawing) বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাক্সেবরফ থাকতে হবে।

৫. টিকার সঠিক পরিবহনের ওপর নির্ভর করে এর অপচয় ও ঘাটতি। খুব কম সময়ের জন্য টিকাবীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

টিকাবীজ সংরক্ষণ ঃ

প্রতিটি টিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ তাপমাত্রা আছে। ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকা ব্যবহার করলে তা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। টিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টিকাবীজকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. হিমশুষ্ক (freeze dried) ও খ. তরল সাসপেনশন (liquid suspension)। সাধারণত হিমশুষ্ক টিকা ২°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে এবং তরল টিকা ৪°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়। টিকা কোন সময়ই ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না। রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখার পর ফ্রিজের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফ্রিজের সুইচ, সকেট, প্লাগ ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা এবং ফ্রিজ ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

১. প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্যই রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অতিরিক্ত অথবা অতি অল্প তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করলে টিকার গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. টিকাবীজ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়সীমা থাকে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই টিকাবীজ ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ যতই যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হোক না কেন, এর গুণাগুণ নির্দিষ্ট সময় সীমার পর কোনক্রমেই থাকে না। তাই মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা উচিত নয়।

শুষ্ক হিমায়িত ট্যাবলেট আকারের টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে কোন টিকাবীজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। সাধারণত একটি টিকাবীজ এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। এ সময়ের পর গুলানো টিকাবীজ কখনোই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে না। তাই ব্যবহারের পর টিকার অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করা যাবে না।

১. টিকা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত টিকা পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা জীবাণুনাশক দ্বারা নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২. কেবলমাত্র সুস্থ্য ও সবল বাচ্চা/মুরগিকে টিকা দিতে হবে।

৩. টিকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- সিরিঞ্জ, সুঁচ , বিকার ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। কোন ক্রমেই জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

৪. লাইভ ভাইরাস ভ্যাকসিন চোখে ড্রপ দেয়ার সময় নিচে কাগজ বিছিয়ে নেওয়া ভালো। অসাবধানতাবসত টিকা বীজের ফোঁটা কাগজে পড়তে পারে। পরবর্তীতে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

৫. বাচ্চা সংগ্রহের সময় প্যারেন্ট মুরগির কি কি টিকা প্রদান করতে হয় তা জানতে হবে।

পোল্ট্রি টিকা সংরক্ষণের সাধরণ নিয়মাবলী ঃ

ক্রমিক নং	টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি	সংরক্ষণের মেয়াদ
১	বসন্ত	-২০° সেন্টিগ্রেড ২° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	১ বছর ১ মাস
২	মারেক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড -৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর ৬ মাস
৩	বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেন্টিগ্রেড -৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড ২° থেকে ৯° সেন্টিগ্রেড থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১ বছর+ ৬ মাস ৪ মাস ১৫ দিন

৪	বড় মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেন্টিগ্রেড -৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড ২° থেকে ৯°সেন্টিগ্রেড থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১ বছর+ ৬ মাস ৪ মাস ১৫ দিন
৫	ফাউল পক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড -৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর ৫ মাস
৬	পিজিয়ন পক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড -৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর ৫ মাস
৭	হাঁস-মুরগির কলেরা	৪° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৮	সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড	২° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৯	গামবোরো	০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
১০	ডাকপ্লেগ	-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড ৪° থেকে ৮°সেন্টিগ্রেড থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	৬ মাস ১ মাস ৭ দিন

লেয়ার মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচি ঃ

বয়স	রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রদানের মাধ্যম
১দিন	মারেক্স রোগ	মারেক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে ইনজেকশণ
২ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন(লাইভ)	চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান করা না থাকলে)
৩-৫দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দুই চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান করা থাকলে ৭-১০ দিন বয়সে)
৭ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	আই. বি.	চোখে ফোঁটা
১০-১৪দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
২১-২৪ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দু’ চোখে ফোঁটা
২৪-২৮ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
৩৫ দিন	মুরগির বসন্ত	ফাউল পক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে সুচ ফুঁটিয়ে
৬০ দিন	রানীক্ষেত রোগ	আর ডি.ভি.	চামড়ার নিচে /মাংসে ইনজেকশন
৮০-৮৫ দিন	কলেরা	ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে /মাংসেইনজেকশন
১১০-১১৫	কলেরা	ফাউলকলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০-১৩৫	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	সমন্বিত টিকা	চামড়ার নিচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০-১৩৫	কৃমি	কৃমিনাশক ঔষধ	খাদ্য /পানির সাথে।

ব্রয়লার মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচি ঃ

বয়স	রোগর নাম	টিকার নাম	টিকা ব্যবহার পদ্ধতি
১দিন	মারেক্স	মারেক্স টিকা	চামড়ার নিচে ০.৫ সিসি পুস করতে হবে।
২দিন	গামবোরো	গামবোরো টিকা	চোখে ড্রপ (প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান না করা থাকলে)
৩-৫ দিন	রানিক্ষেত	বিসিআরডিভি	চোখে ড্রপ (প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান না করা থাকলে)
৭-১০ দিন	রানিক্ষেত	বিসিআরডিভি	উভয় চোখে ড্রপ-টিকা প্রদান করা থাকলে
১২-১৪ দিন	গামবোরো	গামবোরো টিকা	প্যারেন্ট মুরগি টিকা দেয়া থাকলে-প্রাথমিক ডোজ চোখে ড্রপ
২৪-২৮ দিন	গামবোরো	গামবোরো টিকা	২য় ডোজ চোখে ড্রপ

সেশন-৮৭, ৮৮, ৮৯

হাঁস-মুরগির টিকাপ্রদান পদ্ধতি (ব্যবহারিক)

সেশন শেষে যা শেখা যাবে-

- হাঁস-মুরগির টিকাবীজের পরিচিতি
- টিকা প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি

উপকরণ ঃ

টিকাবীজ, পরিশ্রুত পানি, সিরিঞ্জ, নিডিল, কটন, থার্মোফ্ল্যাক্স, এন্টিসেপটিক, গ্যলিপট, ড্রপার, মুরগি ও হাঁস।

পদ্ধতিঃ

এই সেশনগুলিতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে শ্রেণী কক্ষে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাঁস মুরগীর টিকাদান পদ্ধতি হাতেকলমে শেখাবেন।

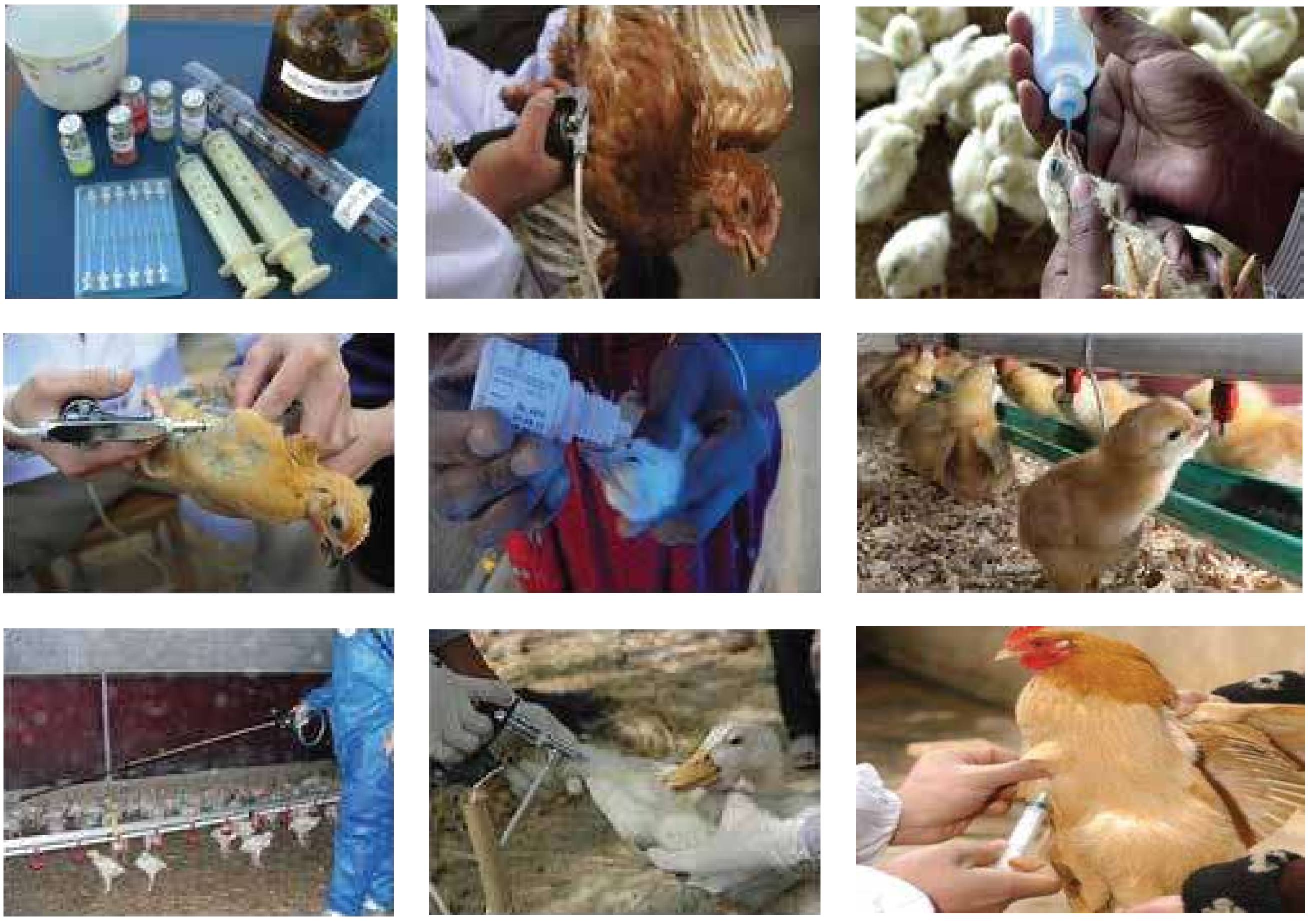

হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানে বিভিন্ন পদ্ধতি

সেশন-৯০

গবাদিপশু পরিবহণকালীন ধকলসমূহ, সতর্কতা এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রাণি পরিবহণকালীন ধকল
- সড়কপথে পরিবহনে বিবেচ্য বিষয় এবং হেঁটে পরিবহণ ব্যবস্থা
- পরিবহণ জনিত রোগ বালাই এবং সতর্কতা

প্রাণি পরিবহণ ধকল ঃ

ধকল হচ্ছে পরিবেশ বা ব্যবস্থাপনাগত প্রতিকূল অবস্থা যা প্রাণির স্বাভাবিক কার্যাবলিকে বাধাগ্রস্থ করে। ধকলের সম্ভাব্য কারণসমূহ সনাক্তকরণ এবং সেগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় নিরুপন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খামার করা যেতে পারে। পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা জনিত ধকল সমূহকে স্থুলভাবে চার শ্রেহীতে ভাগ করা যেতে পারে-

ক) তাপমাত্রা জনিত ধকল ঃ

সাধারণত বয়স্ক গরুর তুলনায় কম বয়স্ক এবং রোগাক্রান্ত গরুতে ঠান্ডা জনিত ধকল বেশি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে দুধাল গাভী এবং স্থুলকার মাংশল জাতের গরুতে উচ্চ তাপমাত্রা জনিত ধকল প্রকট হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু গরুর জাত রয়েছে যেগুলো ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়ার প্রতি কিছুটা সহনশীল। বাতাসের আদ্রতা, বায়ু প্রবাহের বেগ, সোলার রেডিয়েশন ইত্যাদি কারণে ও গরুতে ধকল সৃষ্টি হতে পারে।

খ) শারীরিক নিয়ামক ঃ

গোয়াল ঘরে গরু প্রতি জায়গায় পরিমাণ, গোয়াল ঘরের মেঝের গঠন ইত্যাদি কারণেও ধকল সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ) রোগ-ব্যাধি জনিত ধকল ঃ রোগ সংক্রমণ জনিত কারনেও গরুতে ধকল সৃষ্টি হয়।

ঘ) আচরণগত বা অভ্যাসগত ধকল ঃ

যে সমস্ত নিয়ামক গরুর আচরণ/অভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটায় তাদের কারনে সৃষ্ট ধকল। যেমন-দীর্ঘ সময় ধরে গরুর খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা প্রদান না করলে তাদের স্বাভাবিক আচরনে পরিবর্তন ঘটে।

প্রাণির ধকল পর্যবেক্ষণ ঃ

প্রাণির ধকল পরিমাপের জন্য বাস্তবসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য কোন পদ্ধতি নাই। তবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গরুর ধকল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদি ধকলের ফলে গরুর হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তের চাপ বেড়ে যায়। দীর্ঘ মেয়াদে ধকলের ক্ষেত্রে গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রাণরস নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। নিম্নলিখিত এক বা একাধিক লক্ষণের উপস্থিতি দেখে গরুতে ধকল সৃষ্টি পর্যায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

১. ক্ষুধামন্দা
২. অস্বাভাবিক আচরণ
৩. অস্থিরতা
৪. ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া
৫. পা খোড়ায়
৬. গরু অস্বাভাবিক ডাকা-ডাকি করে
৭. অন্য গরু থেকে আলাদা থাকবে
৮. গরু অবসন্ন দেখায়

ধকল জনিত প্রাণির আচরণ নির্দেশক সমূহ

- পালাতে চেষ্টা করে
- লাথি মারে
- ধস্থা-ধস্থি করে

পরিবহনকালীন সময়ে গরুর শারীরবৃত্তিয় অবস্থা

১. শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়

২. হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়

৩. রক্তে গ্লুকোজ ও করটিসল বেড়ে যায় এবং গ্লাইকোজেন এর পরিমাণ কমে যায়। রক্তে গ্লাইকোজনের পরিমাণ কমে গেলে ল্যাকটিক এসিড উৎপাদন কমে যায় এবং মাংসের পিএইচ কমে যায়। ফলশ্রুতিতে মাংস কালচে ধরনের হয়।

৪. গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

গরু পরিবহন জনিত ধকল ঃ

যে সকল নিয়ামক প্রাণি দেহে ধকল সৃষ্টি করে তার মধ্যে পরিবহন একটি অন্যতম উপাদান। পরিবহনজনিত ধকলের ফলে গরুর দৈহিক ওজন, কারকাসের ওজন এবং মাংসের গুনগত মান কমে যায়। জবাই করার পূর্বে গরু পরিবহন জনিত ধকলে থাকলে জবাই পরবর্তী সময়ে মাংস কালচে হয়, মাংসের নমনীয়তা এবং স্বাদ কমে যায়। পরিবহনকালিন সময়ে বিরূপ আবহাওয়া (অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা), খাদ্য ও পানির অভাব এবং সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন (যেমন- পরিচিত ও অপরিচিত গরুকে একত্রে রাখা) সহ নানাবিধ কারণে ধকল সৃষ্টি হতে পারে।

গরু পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ক. বাজার/খামারীর বাড়ী থেকে প্রাণি সংগ্রহ করে খামারে পালন করা

খ. যেক্ষেত্রে দুধাল,বাড়ন্ত ও বয়স্ক প্রাণি আলাদা আলাদা স্থানে পালন করা হয় তখন এক খামার থেকে অন্য খামারে স্থানান্তরের জন্য

গ. খামার থেকে কসাই খানায় নেয়ার জন্য

ঘ. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হাট বাজারে নেওয়া

পরিবহন জনিত ধকলের উৎস ঃ

১. পরিবহন পূর্ব প্রস্তুতি জনিত নিয়ামকঃ টিকা প্রদান, খোজাকরণ, শিং কাটা

২. অপরিচিত শব্দ দূষণ

৩. পরিবহনকালিন ঝাকুনি

৪. সামাজিক পুনঃগঠন

৫. পরিবহনকালিন সময়ে ট্রাকে প্রাণির ঘনত্ব

৬. পরিবেশগত নিয়ামক-তাপমাত্রা, আদ্রতা,বায়ু চলাচল ব্যবস্থা

৭. যানবাহনে উঠানো ও নামানোর সময় প্রাণির প্রতি মানুষের আচরণ

৮. পরিবহনের স্থিতিকাল এবং পরিবহনকালিন বিশ্রাম

৯. পরিবহনকালিন সময়ে খাদ্য ও পানির গুনাগুন ও প্রাপ্যতা

পরিবহণকালীণ ধকলসমূহ ঃ

- থেতলানো/ছিলে ফেলা
- শ্বাসকষ্ট
- হৃৎপিন্ডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া (হার্টফেল)-ভ্রমণের পূর্বে অতিরিক্ত খাওয়ানো
- হিট-স্টোক-অতিরিক্ত গরম ও আর্দ্রতায় হতে পারে।
- পেট ফুলা
- ঠান্ডা বাতাস- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় ফলে মারাত্বক ধকল এমনকি মৃত্যু ও ঘটাতে পারে

- পানির স্বল্পতা- দীর্ঘপথ ভ্রমণের সময় পর্যাপ্ত পানির অভাবে ওজন হ্রাস সহ মৃত্যু ঘটতে পারে।
- ক্লান্তিভাব - দুর্বল ও গর্ভবতী প্রাণির ক্ষেত্রে হতে পারে
- আঘাত - পা খোঁড়া, শিং ভাঙ্গা
- লড়াই - শিং বিশিষ্ট ও শিং বিহিন গরু একসাথে রাখলে।

গরু বোঝাইকরণের পূর্ব সতর্কতা ঃ

- বোঝাই পূর্ব একত্রীকরণ-অপরিচিত গরু বোঝাইয়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে একত্রিত করে পরস্পরের মধ্যে পরিচিত করা উত্তম।
- পানি ও খাদ্য খাওয়ানো-ভ্রমনের ১ ঘন্টা পূর্বে গরুকে পানি ও খাদ্য খাওয়ানো জরুরী
- শিং বিশিষ্ট ও শিং বিহীন গরু গাড়ীতে একসাথে রাখা যাবে না এতে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিকে একসঙ্গে পরিবহন করা যাবে না ।
- তাছাড়া রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, শুকনো, গর্ভকালীনের শেষের সময় এবং অতিরিক্ত খাওয়ানো গরুকে পরিবহন করা ঠিক নয়।

ট্রাকে গরু উঠানোর সময় সতর্কতা ও করণীয় ঃ

১. গরু শান্ত রাখা ঃ শান্ত প্রাণিকে সহজেই নড়াচড়া এবং গাড়ীতে উঠানো-নামানো যায়। গরু একবার রাগান্বিত হলে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে।

২. কম শব্দ করা-গরু খুবই শব্দ সংবেদনশীল

৩. গরু নিয়ন্ত্রনের জন্য ইলেকট্রিক শক ব্যবহার না করা

৪. পতাকা বা প্যাডেল স্টিক বা নন-ইলেকট্রিক বস্তু ব্যবহার করা

৫. প্রাণির আচরণগত বিষয়গুলো বুঝা

৬. প্রতিবন্ধকতা বা কোনরূপ ব্যাঘাত প্রতিহত করা- লোকজন, অন্য প্রাণি, নিকটে অন্য গাড়ী পার্কিং

৭. গরুর পরিচিত লোক দ্বারা স্থানান্তর করা

পরিবহনজনিত রোগ-বালাই ঃ

পরিবহনকালে অচেনা ও বৃদ্ধ পরিবেশ এবং যত্ন ও পরিচর্যার অবহেলায় জন্য গবাদিপশুর মধ্যে ভয়-ভীতি ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা অনেক সময় স্নায়ুচাপজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

১. গরুর চামড়া লাল হয়ে যায়।

২. পরিবহন পীড়া ঃ গরু শুয়ে পড়ে ও জ্ঞান হারায়। পরিবহনকালীন সময়ে গরু খাদ্য ও পানির অভাবে দূর্বল হয়ে পড়লে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

৩. পরিবহণ ধকল ঃ পরিবহনকালীন সময়ে গরু ক্লান্ত ও অবসন্ন থাকায় পাস্তুরেলা নামক জীবানু দ্বারা সংক্রমিত হয়।

৪. পরিবহন হেতু ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

সড়ক পথে পরিবহনের জন্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

১. বয়স্ক গাভী প্রতি ১.৪ বর্গমিটার বা ১৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন

২. বাছুর প্রতি ০.৩ বর্গমিটার বা ৩.৫ বর্গমিটার জায়গায় প্রয়োজন

৩. উচ্চতাঃ ১.৬ মিটার বা ১৭.৫ বর্গফুট

৪. মেঝে পিচ্ছিল হবে না

৫. পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে

৬. প্রাণি উঠানোর জন্য ছোট আকারে ১ টি দরজা থাকবে

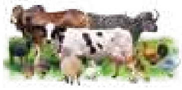

হেঁটে পরিবহনের সময় সর্বোচ্চ দূরত্ব ঃ

প্রাণির প্রজাতি	পরিবহনকালীন সময় একদিন হলে	পরিবহনকালীন সময় একদিন বেশি হলে	
		প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন
গরু	২৪ কিমি	২৪ কিমি	২২ কিমি
ছাগল/ভেড়া	২০ কিমি	২০ কিমি	১৬ কিমি

পরিবহন ব্যবস্থাপনা ঃ

১. ট্রাকে গরুর ঘনত্ব

গরুর ওজন	জায়গার পরিমাণ	
	শিংযুক্ত	শিংবিহীন
৬০০ পাউন্ড/২৭২ কেজি	৮.৯ বর্গফুট/০.৮২ বর্গমিটার	৮.৬ বর্গ ফুট/ ০.৮০ বর্গমিটার
৮০০পাউন্ড/৩৬০ কেজি	১০.৯০ বর্গফুট/১.০১ বর্গমিটার	১০.৪০ বর্গ ফুট/ ০.৯৭ বর্গমিটার
১০০০ পাউন্ড/৪৫৪ কেজি	১২.৮০ বর্গফুট/১.২০বর্গমিটার	১২.০০ বর্গ ফুট/ ১.১১ বর্গমিটার
১২০০ পাউন্ড/৫৪৫ কেজি	১৫.৩০ বর্গফুট/১.৪২ বর্গমিটার	১৪.৫০ বর্গ ফুট/ ১.৩৫ বর্গমিটার
১৪০০ পাউন্ড/৬৩৫ কেজি	১৯.০০ বর্গফুট/১.৭৬ বর্গমিটার	১৮.০০ বর্গ ফুট/ ১.৬৭ বর্গমিটার

২. ড্রাইভিং পদ্ধতি ঃ সতকর্তার সহিত গাড়ী চালানোর মাধ্যমে গরুর আঘাত পাওয়া বা থেতলানো অনেকাংশে প্রতিহত করা যায়। তাছাড়া প্রাণির ওজন কমে যাওয়ার মাত্রা হ্রাস পায়। হঠাৎ গাড়ী থামানো বা দ্রুত গাড়ীর গতি বাড়ানো পরিহার করতে হবে।

৩. গরম/ঠান্ডা জনিত ধকল কমানোঃ গরমের সময় রাতে বা খুব সকালে গরু স্থানান্তর করা উত্তম । তাছাড়া ঝড়-তুফান বা বৃষ্টির সময় প্রাণি পরিবহণ না করা। অধিক ঠান্ডায় পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রস্তুতি রাখা।

৪. লোড চেকিং ঃ গাড়ীতে গরু উঠানোর পর ভালভাবে দেখে নিতে হবে যেন কোথা ও থামলে বা চলমান অবস্থায় গরু না পড়ে যায়। যাত্রা শুরুর ৩০-৬০মিনিটের মধ্যে গরুর অবস্থা প্রথম বার পর্যবেক্ষণ করা এবং পরবর্তী প্রতি ২-৩ ঘন্টা পর পর দেখতে হবে গরুগুলো ঠিক আছে কি না।

৫. যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ঃ প্রাণি পরিবহণে ব্যবহৃত গাড়ী মোটামুটি ভাল হওয়া প্রয়োজন। ভাঙ্গা যান দ্বারা যে কোন ধরনের আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. যানবাহন পরিচ্ছন্নতা ঃ গরু উঠানোর পূর্বে গাড়ী ভালভাবে ধৌত করা প্রয়োজন। নতুবা রোগ-জীবানু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৭. দ্রুত নামানো ঃ পৌঁছার ১৫ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী থেকে গরু নামাতে হবে। নামানোর সময় অপিচ্ছল মেঝে ব্যবহার করতে হবে।

৮. ড্রাইভার ইনসেনটিভ ঃ ড্রাইভারকে ইনসেনটিভ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত/খুশি রাখা, এতে গাড়ী সতর্কতার সহিত চালাবে ফলে প্রাণির আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

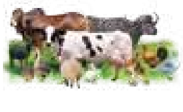

সেশন-৯১

সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ দিবস ও খামারী সমাবেশ ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে -

- মাঠ দিবস সর্ম্পকে ধারণা
- মাঠ দিবস পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- মাঠ দিবস বাস্তবায়ন
- খামারী/কৃষক সমাবেশ
- কৃষক সমাবেশ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

মাঠ দিবস ঃ

মাঠ দিবস একটি দলীয় সম্প্রসারণ (Group Extension) পদ্ধতি যা ফলাফল প্রদর্শণী স্থানে পরিচালিত হয়। একক খামারীর ফলাফল প্রদর্শণীর ক্ষেত্রে মাঠ দিবস ব্যয় সাশ্রয়ী ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ দিবসে অধিক সংখ্যক কৃষককে প্রদর্শণী স্থান পরিদর্শনে কী প্রযুক্তি প্রদর্শণী হচ্ছে তা শিখতে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নতুন প্রযুক্তি নিজের খামারে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দেবে।

সাধারণত নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে কৃষক/খামারীদের উৎসাহ এবং উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে প্রযুক্তি প্রদর্শণীর ফলাফল প্রাপ্তির দিনে অধিক সংখ্যক কৃষক/খামারীদের সমাবেশের মাধ্যমে মাঠ দিবস সংগঠিত করা হয়। এই দিন নতুন প্রযুক্তির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অবহিত ও প্রদর্শণী প্রযুক্তি গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে সদস্য কৃষক/খামারীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে মাঠ দিবসে ঘাস চাষ/প্রাণিপালন পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন সময়কালে গৃহীত প্রক্রিয়া এবং শেষ পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাণিসম্পদের তথ্য প্রচারের জন্য একটি ভাল উৎস, কারণ এই দিন সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং অতিথিবৃন্দকে সমাবেশে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মাঠ দিবসের আয়োজনে নিম্ন বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন :

মাঠ দিবস পরিচালনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ঃ

- মাঠ দিবসের তারিখ এবং সময় আগেই ঠিক করতে হবে এবং প্রতিবেশী কৃষকদের জানাতে হয়।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারী কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা।
- মাঠ দিবসের দিন প্রয়োজন হতে পারে এমন সব সামগ্রী সংগ্রহ করা।
- প্রতিবেশী কৃষক ও পূর্বে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কৃষককে মাঠ দিবসের বিষয় জানানো, যেখানে সম্ভব একই আর্থ-সামাজিক পরিপার্শ্বিকতা হতে খামারীদের আনা উচিত।
- অংশগ্রহণকারী খামারীদের সংখ্য ৩০-৩৫জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। কেননা কৃষকদের ছোট দল হলে তাঁরা ভালভাবে দেখার এবং খামারী ও সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হতে ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ বেশি পাবে।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারী খামারী যেন সঠিকভাবে প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য, কি করা হয়েছে, প্রত্যাশিত লাভ, খরচ ও উৎপাদন ব্যাখ্যা করতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা।
- এমন একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে খামারীগণ প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং প্রযুক্তি সম্বন্ধে খোলামেলা আলাপ করতে পারে।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট খামারীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপের মাধ্যমে জেনে নেবেন যে তাঁরা প্রদর্শণীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাব এবং তারা প্রযুক্তি নিজের খামারে প্রয়োগ করে দেখবেন কিনা।

মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়ন ঃ

মাঠ দিবসের দিন সম্প্রসারণ কর্মীদের আগেই প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী নিয়ে মাঠে/প্রদর্শণী স্থানে উপস্থিত হয়ে সবকিছু ঠিকমত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ঃ

- মাঠ দিবসে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে লোক জন প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারীকে প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য, প্রদর্শণীতে কী করা হয়েছে এবং প্রযুক্তির উপকারিতা ও খরচ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব উপস্থিত কৃষক/খামারীকে জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- উপস্থিত কৃষকেরা যাতে প্রদর্শণীর চারপাশ ঘুরে প্রযুক্তির বিষয়ে জানতে পারেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারেন সে জন্য প্রদর্শণীর নিকটে নিয়ন্ত্রণ প্রাণি/প্লট থাকতে হবে। তা হলে দু'টির মধ্যে পার্থক্য দেখতে খামারী/কৃষকেরা উৎসাহিত হবেন।
- কৃষকদের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মীদের অনানুষ্ঠানিক আলাপের মাধ্যমে জেনে নেয়া উচিত যে তাঁরা প্রদর্শণীর বিষয়বস্তু পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাব এবং প্রদর্শিত প্রযুক্তি তাদের নিজের খামারে পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা?
- অংশগ্রহণকারী কৃষকদের নাম, এনআইডি, মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে।
- প্রতিটি মাঠ দিবসের ছবি তুলে রাখতে হবে। ছবির নিচে উক্ত পদ্ধতি প্রদর্শণীর তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ এলডিডিপি পিএমইউ এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

খামারী/কৃষক সমাবেশ ঃ

খামারী/কৃষক সমাবেশ হচ্ছে বড় ধরনের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এগুলো সফল প্রযুক্তি প্রবর্তন ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন সমাবেশকে (Campaign) কেন্দ্র করে ব্যবহার করা উচিত। এলডিডিপি এর আওতায় প্রকল্পাধীন প্রতি ইউনিয়নে এ ধরণের সমাবেশের ব্যবস্থা রয়েছে।

খামারী/কৃষক সমাবেশ পরিকল্পনা ঃ

খামারী/কৃষক সমাবেশ বড় মাঠ দিবসের মতো বাইরে আয়োজন করা হয়। কারণ এটি অনেক কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি একক অনুষ্ঠান। তাই সাবধানে পরিকল্পনা করা দরকার। এটা অবশ্য অন্যান্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারীদের অংশীদারিত্ব নেয়ার সুযোগ করে দেবে।

কৃষক/খামারীদের সফল সমাবেশের পরিকল্পনা করার জন্য কিছু ধারণা নিচে দেয়া হলো -

- খামারী/কৃষক সমাবেশের ব্যাপারে একটি কর্মসূচি নেয়া যেখানে-উদ্বুদ্ধকরণ, উপস্থাপন, লোকজ সঙ্গীত, অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপন, লোকজ নাটক, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি বিষয় থাকতে পারে।
- উক্ত সমাবেশের সহায়ক সামগ্রী তৈরি করা যেমন- ব্যানার, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি।
- সমাবেশ অনুষ্ঠানের স্থান এমন হওয়া উচিত যাতে সেখানে অনেক লোকের বসার জায়গা থাকে এবং অনুষ্ঠানের স্থান সকল কৃষকের নিকট সহজে যাতায়াত উপযোগী হয়।
- সমাবেশের তারিখ ও অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করা হলে তা প্রচার করা উচিত। এ জন্য পোস্টার তৈরি ও বিতরণ করা যেতে পারে, কৃষক গ্রুপকে এ সমাবেশে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পার্টনার সংস্থাগুলোকে জড়িত করা উচিত, এটা অভিজ্ঞতা ও সম্পদ ভাগ করে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে।

খামারী/কৃষক সমাবেশ বাস্তবায়নে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

- অনুষ্ঠানের স্থান সাজাতে ও বসার ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় সময়ের প্রয়োজন হবে।
- যে সমস্ত সংস্থা জড়িত তাদের প্রত্যেকে অনুষ্ঠান সূচী ও তাদের দায়িত্ব জানাতে হবে।
- ভাড়া করা সব যন্ত্রপাতি সচল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- প্রতিটি সমাবেশের ছবি তুলে রাখতে হবে। উক্ত ছবির নিচে সমাবেশের তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ এলডিডিপি-ডিএলএস এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

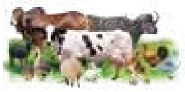

সেশন-৯২

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ অনুষ্ঠান

সেশন শেষে যা জানা যাবে

- কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ পরিকল্পনা গ্রহণ
- কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ আয়োজন

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ একটি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতি (Group Extension) সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে যে কোন একটি দিন নির্ধারণ পূর্বক সুধিাজনক মাঠে/খোলা জায়গায় পরিচালিত করা হবে। ঐ দিন অধিক সংখ্যক কৃষক তাঁদের গো-বাছুর, ছাগল/ভেড়া ও হাঁস/মুরগিকে কৃমি মুক্তকরণ ঔষধের জন্য নির্ধারিত মাঠে/খোলা জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন অথবা প্রাণিকে বাড়িতে রেখেও সমাবেশে আসতে পারেন। কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ কার্যক্রম শুরুর আগে সমাবেশে আগত কৃষক/খামারীদেরকে প্রাণিকে কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ও প্রচার পত্র বিলি করতে হবে। এখানে খামারী/কৃষক কৃমি মুক্তকরণ এর কার্যকারিতা ও প্রাণির বিভিন্ন কৃমি রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে শিখতে পারেন। এ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং প্রাণিকে সময়মত কৃমি মুক্তকরণ ঔষধ প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। এ ধরণের সমাবেশ অনেক কৃষকদেরকে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তখন তাঁরা নিজেদের সমস্যা ও সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ পরিকল্পনা ঃ

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ এর জন্য একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে, যেমন কোন সময়ে/মৌসুমে ক্যাম্পেইন করা হলে অধিক সংখ্যক প্রাণিকে কৃমি মুক্ত করার ঔষধ প্রয়োগের জন্য মাঠে পাওয়া যাবে, কোন কোন প্রজাতির প্রাণিকে কৃমিনাশক প্রদান করা হবে, কৃমি মুক্তকরণ সম্পর্কে প্রচার পত্র প্রস্তুত করণ ও অন্যান্য প্রচার-প্রচারণার বিষয়ে প্রস্তুতি, মাঠ/খোলা জায়গা প্রাপ্তির বিষয় ইত্যাদি। প্রকল্পের আওতায় (অর্থাৎ শুধু গো/মহিষ, ছাগল/ভেড়া) ১টি করে কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ করা যাবে। সমাবেশে সকলকে জানাতে হবে যে পরবর্তীতে খামারে নতুন প্রাণি সংযোজন হলে সময়মত তাদেরও কৃমি মুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণত একটি গরুকে বছরে কমপক্ষে দুইবার কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হয়। একবার শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) এবং দ্বিতীয়বার বর্ষার শুরুতে (মে-জুন মাসে)।

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ আয়োজনঃ

কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ এর জন্য দিন, তারিখ এবং সময় আগেই ঠিক করতে হবে। ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের প্রাণির সংখ্য ১০০ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। এতে কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান কার্যক্রম ভালভাবে করা যাবে এবং কৃষক/খামারীগণ সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হতে ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ বেশি পাবে। সম্ভব হলে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে, এতে ক্যাম্পেইন এর প্রচার-প্রচারনার গুণগত মান বাড়বে। এই দিন প্রাণির কৃমির বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে পোষ্টার ও মুদ্রিত সামগ্রী ব্যবহার করলে ভাল হয়। কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা থাকতে হবে। উক্ত পরিকল্পনায় যাচাই তালিকায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে-

- কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ দিবসের প্রয়োজন হতে পারে এমন সব সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে, যেমন- ব্যানার, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি।
- বাজেট স্বল্পতায় সমাবেশে আগত সকল প্রাণিকে প্রয়োজন অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা নাও যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সমাবেশে আগত কৃষক/খামারীদেরকে কৃমি মুক্তকরণ এর গুরুত্ব বুঝাতে পারলে তাঁরা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রাণিকে কৃমি মুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। তাছাড়া প্রচার পত্রে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির বয়স অনুযায়ী কৃমিমুক্ত করণের ঔষধ সেবনের বিষয়টি সিডিউলে উল্লেখ থাকলে খামারী/কৃষকদের সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হবে।

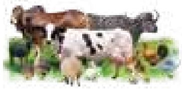

- প্রাণিকে কৃমিমুক্ত অবস্থায় টিকা প্রদান করা হলে টিকার কার্যকারিতা (Immunity) বৃদ্ধি পায়। তাই টিকা প্রদান সমাবেশ দিবসের অন্তত ৭ দিন আগে প্রাণিকে কৃমি মুক্ত করতে হবে। এজন্য যেখানে টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন করা হবে, সেখানে আগে কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ (Deworming Campaign) করা প্রয়োজন। কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ পরিকল্পনায় এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এবং কৃষক/খামারীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রতিবেশী কৃষক ও পূর্বে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কৃষককে কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ দিবসের বিষয় জানাতে হবে। তাঁরা সমাবেশ দিবসে উপস্থিত হলে আরো উদ্বুদ্ধ হবেন এবং প্রাণির কৃমি মুক্ত করণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
- কৃষক/খামারীগণ যেন কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ দিবসের উদ্দেশ্য, কী করা হয়েছে, এর খরচ ও সে অনুযায়ী উৎপাদনে প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে।
- যাতায়াতে ও মাঠের মধ্যে চলাফেরার সুবিধাদি, কৃমি মুক্তকরণ সমাবেশ দিবসের আগেই পরিদর্শন করে নিশ্চিত হতে হবে।
- সমাবেশ দিবসে প্রযুক্তি সম্বন্ধে খোলামেলা আলাপে প্রয়োজনে মেগাফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেশন-৯৩

কৃষক মাঠস্কুলের ধারণা ও উদ্দেশ্য

- ➢ কৃষক মাঠস্কুলের ধারণা
- ➢ কৃষক মাঠস্কুলের উদ্দেশ্য

কৃষক মাঠ স্কুল ঃ

কৃষক মাঠ স্কুল একটি অংশগ্রহণমূলক অনানুষ্ঠানিক কৃষক শিখন প্রক্রিয়া যা বয়স্ক শিক্ষার নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। যেখানে কৃষক নিজেরাই পরস্পরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খামারের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং তার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান তৈরি করতে পারে। ফসল/বসতবাড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে একদল কৃষক-কৃষানী তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। প্রাথমিকভাবে একজন সহায়ক এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে প্রক্রিয়াটি শুরু ও চলমান করার জন্য সহায়তা করবে এবং সবার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। ফলত এটি সবার শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে শিখন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো খামারের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষক-কৃষানীদের ক্ষমতায়ণ করা।

জানা যায় যে, ৯০ দশকে ইন্দোনেশিয়াতে কৃষক মাঠ স্কুল শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সহায়তা ইন্দোনেশিয়ার কৃষি বিভাগ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ধান চাষী কৃষকদের মধ্যে কৃষক মাঠ স্কুল প্রথমত চালু করে। কেয়ার বাংলাদেশের ANR Sector এর INTERFISH এবং NOPEST প্রকল্প প্রথমে FFS বিষয়টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে ANR Sector এবং Homestead Program এর অন্যান্য প্রকল্পে এই FFS প্রক্রিয়া চালু করেছে। FFS প্রক্রিয়াটি এখন ধানের মাঠ থেকে সবজি ও গাছ-পালা, মাছ ও চিংড়ী চাষ, হাস-মুরগী ও গবাদিপশুর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ হয়েছে। অনেক দেশেই কৃষক মাঠ স্কুল শিখন প্রক্রিয়া থেকে অন্যান্য শিক্ষা-সম্প্রসারণ কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। যেমনঃ কৃষক থেকে কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কৃষক পরিচালিত গবেষণা এবং কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি ও সংগঠন।

কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্দেশ্য ঃ

- ফসল, ক্ষেত, খামার ও পুকুর এর প্রতিবেশ (eco system) সর্ম্পকে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃষকদের পর্যবেক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- ফসল/খামার ব্যবস্থাপনা ক্ষেতে নতুন/সৃজনশীল চিন্তা করা ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্ষমতার উন্নয়ন করা
- কৃষক থেকে কৃষক সম্প্রসারণের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান/দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- কৃষকদের নিজেদের ভেতর দলীয় মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের এবং সমাজের অন্যান্য কৃষকদের ফসল ব্যবস্থাপনার সহযোগিতা করতে পারে।
- কৃষকদের বাজার ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকদেরকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা যাতে কৃষক তা নিজ মাঠে অনুশীলন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।
- কৃষকদের নতুন সমস্যা বিশ্লেষণ করা- সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখানো।

কৃষক মাঠ স্কুল একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া যেখানে ঃ

কৃষককের অর্জিত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। এটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে কৃষকেরা নিজেরা করে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিখতে পারে। কৃষক মাঠ স্কুল এক কথায় বুঝায় নিজে করে ও বুঝে শেখা। কৃষক মাঠ স্কুল কৃষকদেরকে নিজে করে শেখানোর মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে কৃষকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে পারে, এক অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে। কৃষক মাঠ স্কুল একদল কৃষক নিয়ে পরিচালিত হয়, এটি একটি স্কুল যার জন্য কোন দেয়াল থাকবে না। স্কুলটি মৌসুম ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেখানে কৃষকেরা নতুন কৌশল মাঠে অনুশীলন করবে।

কৃষক মাঠ স্কুলের মূলনীতি ঃ

☐ হাতে কলমে শিখন ☐ কৃষকের খামার বা মাঠ হল শিখন স্থান ☐ শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক সহায়তা দান
☐ গবেষণা উদ্ভুত শিখন প্রক্রিয়া ☐ নির্দিষ্ট পাঠক্রম ☐ খামার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ ☐ অংশগ্রহণমূলক তদারকি ও মূল্যায়ন

সেশন-৯৪

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সম্পর্কে ধারণা
- মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের গুরুত্ব
- মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কার্যক্রম

the
Visiting Vet

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকঃ

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বা ভ্রাম্যমান প্রাণি চিকিৎসা ক্লিনিক হচ্ছে প্রাণির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ মোটরগাড়ির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোরায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের গুরুত্বঃ

- ✓ খামারিদের জরুরী প্রাণি চিকিৎসা সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
- ✓ রোগাক্রান্ত প্রাণি পরিবহন ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য বিধায় এটি একটি উপযুক্ত সেবা মাধ্যম।
- ✓ রোগাক্রান্ত অপেক্ষাকৃত কম দখল সহ্য করতে পারে তাই এটি খুব প্রয়োজন।
- ✓ রোগের বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম থাকে এটি ব্যবহারের ফলে।
- ✓ ভ্রাম্যমান প্রাণি চিকিৎসার মাধ্যমে দক্ষ ভেটেরিনারি টিম কৃষকের দোরগোরায় সেবা পৌঁছে দিতে পারে।
- ✓ নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে পরিচালনা করে প্রাণির রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- ✓ তৃণমূল খামারিদের পশুপাখি সংক্রামক রোগ নিরাময়ে এটি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
- ✓ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে খামারিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জনসাধারণ প্রাণিরোগ সম্পর্কে সচেতন হয়।

বাংলাদেশে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণঃ

প্রাণিসম্পদ বিভাগ এলডিডিপি'র মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরিচালনায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে প্রয়োজনীয় আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী ও রোগ নির্ণয় উপকরণসহ পিক আপ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে এ্যম্বুলেটরি সার্ভিস প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এই উদ্যোগ চালু হলে দেশের প্রান্তিক কৃষক, খামারিগণ প্রাণিসম্পদ সেবায় বিশেষ সুবিধা পাবে।

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ব্যবস্থাপনায় খামারীদের জরুরী সেবা প্রদানে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কার্যক্রমঃ

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক/ ভ্রাম্যমাণ প্রাণি চিকিৎসা ক্লিনিক হচ্ছে প্রাণির রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার উন্নত সরঞ্জাম সহ মোটর গাড়ির মাধ্যমে তৃণমুল পর্যয়ে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোরায় পৌঁছে দেবার একটি আধুনিক ব্যবস্থা যা দক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসক টিম দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মানুষের দোর-গোড়ায় ভেটেরিনারি প্রাণিচিকিৎসা পৌঁছে দেবার একটি মাধ্যম হচ্ছে 'মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক'। মুঠো ফোনে যোগাযোগ করে অল্প সময়ে মিলবে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা উপযুক্ত ভেটেরিনারি চিকিৎসা।

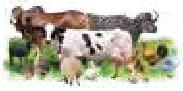

সেশন-৯৫

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কমিউনিটি এনিমেল হেলথ সম্পর্কে ধারণা
- কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এ্যাপ্রোচ

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ (Community Animal Health)ঃ

একটি সহযোগী, বহু-বিভাগীয় এবং ট্রান্সডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি যা স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ এবং পরিবেশের মধ্যে আন্তঃ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রাণীস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে এবং প্রাণী অধিকার নিশ্চিত করে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রাণি স্বাস্থ্যের স্থিতি এবং সেই কার্যকলাপ ও শর্তাদি যা গোটা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং উন্নতি করে।

কমিউনিটি প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিখাদ্য, গৃহপালিত প্রাণির রোগ প্রতিরোধ, কৃষিকাজ, বিনোদন, খেলা-ধূলার কাজে লাগানো হয় এমন সব প্রাণির স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। বন্যপ্রাণি, রাস্তার মালিকানাহীন, গবেষনায় ব্যবহৃত প্রাণী যাদের দ্বারা অন্যান্য প্রাণিতে বা মানুষের কাছে রোগের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে তারাও Communitz Animal Health এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাণির স্বাস্থ্য, রোগ-নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা এবং তৃণমূল খামারীদের জরুরী সেবা কমিউনিটি এনিমেল হেলথ্ ব্যবস্থাপনার অংশ।

Community Animal Health এর কর্মপদ্ধতি ঃ

- বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- গ্রাম, শহর, দেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে আন্ত ঃ সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রাণি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- ``Prevension is better than cure`` প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম ।

Community Health Approach ঃ

- গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসম্পদ নিয়োগ করতে হবে ও অফিস স্থাপন করতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী (N.G.O) সংগঠনগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
- চিকিৎসক ও খামারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- নিয়মিত প্রাণি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।
- বিভিন্ন রোগের টীকাদান কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।
- নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করতে হবে।
- গর্ভবতী প্রাণিদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাণী সম্পদ অফিসের জরুরি বিভাগের কার্যক্রম ও অ্যাম্বুলেটরী সার্ভিসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সকল ধরনের বাণিজ্যিক এবং অলাভজনক খামারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

মূল নীতি-স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারী লাভবান হবে, এই শিল্প উন্নত হবে, কমিউনিটির প্রতিটি সদস্য সুস্থ থাকবে এবং জাতি হিসেবে আমরা সমান এগিয়ে যাবো।

সেশন-৯৬

জৈব জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ বায়োগ্যাসের পরিচিতি
- ➢ বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র
- ➢ বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা সমূহ
- ➢ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে যা প্রয়োজন
- ➢ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির খরচ ও লাভ
- ➢ ফাইবার গ্লাস বায়ো ডাইজেস্টার এর সুবিধাসমূহ

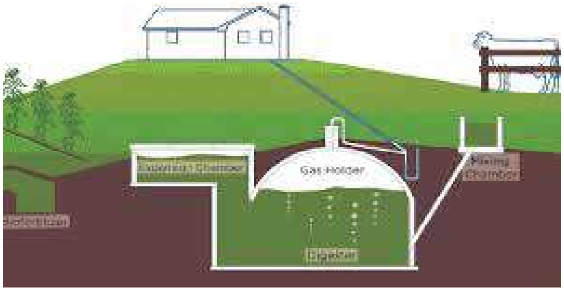

বায়োগ্যাস কী?

পচনশীল যে কোন জৈব পদার্থ গরুর গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা, প্রভৃতি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয় তা-ই বায়োগ্যাস/মিথেন (CH_4)। যখন গোবর/বিষ্ঠা পানির সাথে মিশিয়ে বায়ো-ডাইজেস্টারে বায়ুশূণ্য অবস্থায় উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা হয় তখন অনুজীব এর ক্রিয়ার ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্নার জন্য খুবই কার্যকর। বায়োগ্যাস ব্যবহারে রান্না করলেঃ

- কাঠ, কেরোসিন কিংবা শুকনো গোবর এর প্রয়োজন হয় না।
- রান্না দ্রুত হয়।
- শিখা পরিস্কার, ধোঁয়া ও কালিমুক্ত।
- রান্নাঘর ও বাড়িঘর পরিস্কার থাকে।
- যখন বায়োগ্যাস পোড়ানো হয় তখন শিখার রং নীল থাকে এবং কোনো ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না।
- উৎপন্ন তাপের হিসেবে ১ ঘন মিটার বায়োগ্যাস (৬০% মিথেন) ০.৭৬ লিটার কেরোসিন, ৫.২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ৪.৮ কেজি জ্বালানী কাঠ এবং ৮.৬ কেজি খড়ের সমান তাপ উৎপন্ন করে।

বায়োগ্যাসের পরিচিতি ঃ

- বায়োগ্যাসকে জৈব গ্যাস বলা হয়। বায়োগ্যাস প্রধানত মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এর মিশ্রণ। তবে অন্যান্য গ্যাসেরও সামান্য উপস্থিত পাওয়া যায়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা সমূহ ঃ

১। পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায়।

২। ধোঁয়া হয় না ফলে পাতিল এবং রান্নাঘর কালো হয় না।

৩। কেরোসিন, লাকড়ি বা খড়কুটো লাগে না ফলে জ্বালানীর খরচ বাঁচে।

৪। সময় বাঁচে এবং রান্নার পাশাপাশি অন্য কাজও করা যায়।

৫। লাকড়ির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চোখ জ্বালা করে এবং শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ।

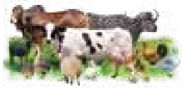

৬। পরিবেশ দূষণ হয় না।

৭। বায়ো-স্লারি (জৈব সার) ব্যবহারে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

৮। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো যায়।

৯। জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা যায়।

১০। বাড়ী ও দোকানে গ্যাস সরবরাহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে কি কি লাগে?

- গোয়ালঘর অথবা রান্নাঘরের আশেপাশে ২০০ বর্গফুটের মতো খোলামেলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যায়। বাড়ির মালিকের কমপক্ষে ৩টি গরু অথবা ২০০টি লেয়ার মুরগী থাকতে হবে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির খরচ ও লাভ ঃ

পরিবারের লোকসংখ্যা ও গরু বা মুরগীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্ল্যান্টের আকার ছোট বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও কম/বেশি হবে। মোট নির্মাণ ব্যয়ের মধ্যে আছে নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ শ্রমিক মজুরি, চুলা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং সার্ভিস চার্জ/ইঞ্জিনিয়ারিং ফি। আকার ভেদে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের খরচ ও ব্যবহার নিম্নের টেবিলে বর্ণিত হলো ঃ

প্ল্যান্টের আকার (ঘনমিটার)	কত ঘন্টা জ্বলে	প্রতিদিন কত গোবর লাগে (কেজি)	কয়টি গরু থাকতে হবে	প্ল্যান্ট স্থাপনের আনুমানিক খরচ (টাকা)
২.০	৩-৪	৪০	৩	৪০,০০০
২.৪	৪-৫	৬০	৪	৪৫,০০০
৩.২	৬-৮	৮০	৬	৫৫,০০০
৪.৮	১০-১২	১২০	৮	৬৫,০০০

বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র

পদার্থ	শতকরা হার	
	প্রাকৃতিক গ্যাস	বায়োগ্যাস
মিথেন	৯৫-৯৮	৬০-৭০
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০.১-০.২	৩০-৪০
হাইড্রোজেন	-	২-২.৫
নাইট্রোজেন	০.৪	১-১.৫
অক্সিজেন	০.১	০.৩-০.৪
হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.১-০.২

ফাইবার গ্লাস বায়োগ্যাস প্ল্যান্টঃ

ফাইবার গ্লাস বায়ো ডাইজেস্টার এর সুবিধাসমূহ ঃ

- দ্রুত ও সহজে স্থাপন করা যায় এবং
- স্থায়িত্বকাল ন্যূনতম ৩০ বছর।
- লিকেজ/ফাটল ধরার সম্ভাবনা কম।
- অল্প জায়গায় স্থাপনযোগ্য।
- সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
- ওজনে হালকা ও পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

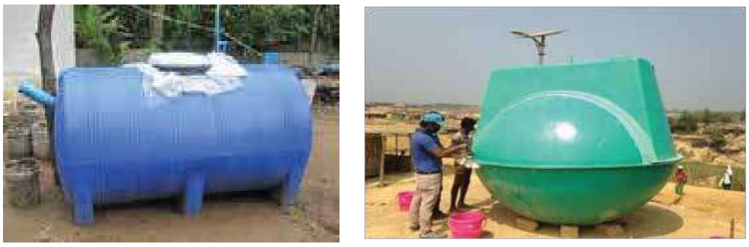

ফাইবার গ্লাস বায়োডাইজেস্টার

বায়োগ্যাসের ব্যবহারঃ

জেনারেটর চালাতে

গ্যাসের চুলা জ্বালাতে

গ্যাস লাইট জ্বালাতে

সেশন-৯৭

গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রযুক্তিটির বৈশিষ্ট্য
- সেড বা ছাউনি তৈরি
- পিট তৈরী
- কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত বর্জ্য
- বায়োস্লারি তৈরী ও ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

- জৈব সার তৈরির মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত বর্জ্যের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ।
- যাবতীয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও আগাছার বীজ ধ্বংস করা।
- জৈব সার তৈরীর ফলে বর্জ্যে গন্ধ দূর করা।
- সহজে প্যাকিং ও পরিবহণ করা যায়।
- কৃষক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।
- জৈব সার বিক্রি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা যায়।
- তেমন কোন বারতি খরচের প্রয়োজন হয় না।
- মাছের পুকুর ব্যবহার করা যায়।

সেড বা ছাউনি ঃ

- বৃষ্টির পানি না ঢুকে এমন ছায়াযুক্ত স্থান।
- শন, ঝড়, বাঁশ, চাটাই ও উপরে পলিথিন দিয়ে অল্প খরচে সেড তৈরী করা যায়।

গর্তের /পিটের আকৃতি (ক্ষুদ্র ও পারিবারিক খামারের জন্য) ঃ

৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা যা সেডের নীচে হবে, প্রাপ্ত বর্জ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে গর্তের আকৃতি। কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত বর্জ্য-

- ✓ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং মুরগির খামারে উৎপাদিত গোবর, বিষ্ঠা হল প্রধান কাঁচামাল।
- ✓ এছাড়া বিভিন্ন ধরণের লতা পাতা, আগাছা যেমন- কচুরি পানা, হেলঞ্জা/সেচী ঘাস ইত্যাদি।
- ✓ বর্জ্যে আর্দ্রতা বেশী হলে শুকনা শুকনা ভাব রাখার জন্য উহার সাথে কাঠের গুড়া/কাটা শুষ্ক খড় মিশিয়ে দিতে হবে। বর্জ্যের শুষ্ক বস্তু ৪৫% থাকলে তা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে।
- ✓ অর্থাৎ বর্জ্যে পানির ভাগ ৫৫% এর বেশী হলে আনুপাতিক হারে শুষ্ক বস্তু যোগ করতে হবে।
- ✓ সাধারণত বর্জ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা তা বুঝার সহজ উপায় হচ্ছে কিছু পরিমাণ উপাদান হাতের মুঠোয় নিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ করলে যদি জমাট বাঁধে তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা ঠিক আছে। আর চাপ দেওয়ার পর যদি পানি বের হয় তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা বেশী আছে।

জৈব সার তৈরী পদ্ধতিঃ

প্রতিদিনের সংগৃহীত বর্জ্য পিটের মধ্যে জমা করতে হবে। পিট ভরে গেলে পলিথিন দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে এবং পাশে অনুরূপ দ্বিতীয় পিট তৈরী করে এক মাস পর পূর্বের পিটের বর্জ্য নতুন পিটের ভিতর স্থানান্তর করতে হবে এবং পুনরায় পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খালি পিটে পুনরায় নতুন বর্জ্য জমা করতে হবে। দুইমাস পর দ্বিতীয় পিটের বর্জ্য জৈব সারে রূপান্তরিত হবে।

বায়ো-স্লারি কি?

গরুর গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা ডাইজেস্টারের ভিতরে পরিপাক বা কোমলায়িত হওয়ার পর আউটলেট দিয়ে অর্ধতরল অবস্থায় বের হয়ে আসলে তাকে বায়ো-স্লারি বলে। বায়ো-স্লারি একটি অতি উন্নত মানের জৈব সার। ইহা তরল, শুকনো কিংবা কম্পোস্ট আকারে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি ব্যবহারের উপকারিতা ঃ

১। উন্নত মানের জৈব সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করে মাটির জৈব পর্দাথ বজায় রাখার মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।
২। বায়ো-স্লারিতে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের গুনগতমান (প্রাপ্যতা) সনাতন জৈব সার যেমন- গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কম্পোস্ট অপেক্ষা বেশী থাকে বলে এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্ভিদ সহজে গ্রহন করতে পারে।
৩। রাসায়নিক সারের সাথে বায়ো-স্লারি ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয়, অধিকন্তু জমিতে দরকারী জৈব পদার্থ যোগ হয়।
৪। অম্লীয় মাটিতে বায়ো-স্লারি ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়।
৫। ফসলের ফলন ও গুনগতমান বৃদ্ধিতে এ সার ব্যবহার লাভজনক।
৬। বীজতলা বা চারা উৎপাদনের জন্য টবে বা পলি ব্যাগে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।
৭। বীজের অস্কুরোদগম পরীক্ষায় ব্যবহার করা যায়।
৮। টবে ফুলের গাছ ও বাড়ীর ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে বায়ো-স্লারি ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক।
৯। পুকুরে কিংবা মৎস্য খামারে ব্যবহার করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
১০। ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
১১। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বায়ো-স্লারি প্ল্যান্টের আউটলেট থেকে নালা অথবা পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পিটে সংগ্রহ করতে হয়। যদি পিট নির্মাণ করা সম্ভব না হয় তা হলে প্লাষ্টিকের ড্রামেও স্লারি সংগ্রহ করা যায়। বায়ো-স্লারি পিট বায়োগ্যাস প্লান্টের একটি অভিন্ন অংশ। একে বাদ দিয়ে প্ল্যান্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ওভার ফ্লোর পাইপের নিকটে দুটি পিট থাকবে যেন বায়ো-স্লারি অতি সহজে পিটে জমা হতে পারে।

- পিটগুলি হাইড্রোলিক চেম্বার হতে কমপক্ষে ১০০ সে.মি দুরত্বে রাখা দরকার যেন মাটি সরে গিয়ে হাইড্রোলিক্স চেম্বারের কোন ক্ষতি করতে না পারে। দুটি পিটের আয়তন ডাইজেস্টারের আয়তনের সমান হতে হবে। বাস্তবতার আলোকে আয়তন ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিবর্তন করা যাবে। পিটের গভীরতা ১ মিঃ এর বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে স্লারি সংগ্রহ কঠিন হতে পারে। পিটের চারপাশের উঁচু করে বাঁধ দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে।

সেশন-৯৮, ৯৯ ও ১০০

গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন

এই সেশনে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিয়ে নিকটস্থ একটি ডেইরি খামার / পোল্ট্রি খামার / ছাগল খামার / ভেড়ার খামার পরিদর্শনে যাবেন এবং খামারের কার্যক্রম সরজমিনে দেখাবেন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে কলমে শিখাবেন ।

- খামার পরিদর্শন চেকলিস্ট অনুযায়ী সরেজমিন জ্ঞান অর্জন এবং পরিদর্শন কালের তথ্যাদি প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ প্রেজেন্টেশন প্রদান করতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ চারটি গ্রুপে বিভক্ত থাকবে এবং আলাদা আলাদা ভাবে উপস্থাপন করবেন।
- প্রশিক্ষক খামার পরিদর্শনের পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে চেকলিস্ট তৈরী করবেন।

সেশন-১০১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর কবল থেকে পশুপাখি রক্ষায় করণীয়

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ স্বাভাবিক সময় দুর্যোগ ব্যবস্থপনা
- ➢ প্রাকৃতিক দূর্যোগ কালীন সময়ে করণীয় ব্যবস্থা ও কলাকৌশল

স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এবং প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মাচরীগন নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করেন ।

স্বাভাবিক সময়েঃ

ক) প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু ওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রাণিসম্পদ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ কৃষক এবং খামারীদের সজাগ করবেন।

খ) অধীন অফিসসমূহ, খামারী এবং এর প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ সমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলকাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী প্রাণিসম্পদ সমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলকাসমূহের জনসংখ্যা, খামারী ও খামারসমূহের জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তাহা হালনাগাদ করবেন।

চ) সামুদ্রিক জলোচ্ছাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইস গেইটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করবেন।

ছ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুর্যোগ পর্যায়

ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী যান রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবেন (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগাযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে করণীয়ঃ

ক) সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপনের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এই খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

গ) ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের পুনর্বাসনের জন্য অণুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবেন।

ঘ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

ঙ) খামারীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবেন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দেয়। এসকল প্রাকৃতিক দূর্যোগ জানমাল, গবাদি প্রাণি এবং পোল্ট্রির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- ✓ বন্যা ও ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দূর্যোগগত এলাকার মানুষ, প্রাণিসম্পদের সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।
- ✓ উপকূলীয় বনায়ন করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।
- ✓ প্রাণির খাবারের জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু ঘাস চাষ করা যেতে পারে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।
- ✓ রেডিও, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয়ের আগাম সংবাদ এবং তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রচার করে জনসচেতনতা বাড়ানো যায়।
- ✓ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য মূল্যবান সম্পদ এবং প্রাণিসম্পদকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
- ✓ পশু পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে।
- ✓ গবাদিপশুর দূর্যোগ কালীন খাবার মজুদ রাখা যেতে পারে।
- ✓ রেডিও, টিভি এবং মাইকে নিজ নিজ এলাকার মসজিদে দূর্যোগ এর খবর প্রচার করা যেতে পারে।
- ✓ দূর্যোগ, দূর্যোগের স্থায়ীত্ব, সতর্কসংকেত, দূর্যোগ বার্তা, জরুরী দূর্যোগ মোকাবেলা, দূর্যোগ পূর্ব এবং দূর্যোগ পরবর্তী জরিপ, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বেচ্ছা সেবক তৈরি এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা, পোস্টার, লিফলেট বিলি করা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও খামারি সংগঠনকে দূর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনকারীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে দূর্যোগ মোকাবেলায় জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যেতে পারে।

দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রতিবছরই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ বয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়। যা মানুষ এবং গবাদিপশুর জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দূর্যোগে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর দীর্ঘদিন ড্রেজিং না করায় সবগুলো নদী পলি দ্বারা ভর্তি হয়ে ইদানীং বন্যার প্রকোপ বেড়ে গেছে। নদীর তীরবর্তী শহর ও গ্রামে বহু গবাদি প্রাণি ও দুগ্ধখামার রয়েছে। এ ছাড়া উপকূলীয় চরাঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদিপশু ক্ষেত্র বিশেষে প্রধান অবলম্বন।

সমুদ্রতীরবর্তী জেলাগুলোতে সাইক্লোন-ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতিবছরই আঘাত হানে। এতে করে গবাদিপশু পালনকারী কৃষকগণ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় সকল কৃষক ও খামারীদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এ দূর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর দায়িত্ব হবে দূর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশুর আশ্রয় ও খাবারের পরিকল্পনা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা। প্রাকৃতিক দূর্যোগ আসার পূর্বেই গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে খড় সংস্করণ, কাঁচা ঘাস ড্রাম পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরি করে মজুদ করা যেতে পারে। এ সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া দানাদার খাদ্যের মজুদ দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় পূর্বে থেকেই নিশ্চিত করা জরুরি। দূর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশু নানান ধরণের স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হয়। বিশেষ করে মাটি ও পানিবাহিত রোগ এদের বেশি সংক্রমিত করে।

দূর্যোগকালীন সময়ের পূর্বেই সকল প্রাণিকে সংক্রামক রোগের (তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরা রোগ) টিকা প্রদান করা জরুরি। এসময় পেটের পিড়া- ডায়রিয়া, আমশয়সহ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। এসময় গবাদি প্রাণিকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতা যেমনঃ কাঁঠাল পাতা, কলাপাতা, বাঁশপাতা, হিজল পাতা, বাবলা পাতা এবং অন্যান্য পাতা খাওয়ানো যেতে পারে।

- ➢ বাড়ির আশে পাশে জলজ ডোবা পুকুরে পারা, জার্মান ঘাস বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে পূর্বে থেকেই লাগানো যেতে পারে।
- ➢ বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে পশু খাদ্য হিসেবে ইপিল-ইপিল, নেপিয়ার হাইব্রিড পরিকল্পিত ভাবে দূর্যোগ মোকাবেলায় লাগানো যেতে পারে।
- ➢ বন্যা সরে গেলে পশু খাদ্য হিসেবে খেসারী মাসকলাই ভূট্টা চাষ করা যেতে পারে।
- ➢ গবাদিপশুকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র এবং ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।

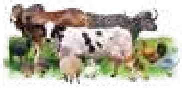

➢ এছাড়াও আশে পাশে কচুরিপানা, অন্যান্য জলজ ঘাস সংগ্রহপূর্বক পরিস্কার পানি দ্বারা ধৌত করে খড়ের সাথে ১ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

বন্যাকবলিত এলাকায় ঘাস চাষঃ

✓ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) কর্দমাক্ত জমি ঘাস চাষের জন্য নির্বাচন করা যায়। আলাদা ভাবে জমিতে চাষ দেওয়া বা জমি তৈরীর দরকার হয় না। উক্ত কর্দমাক্ত জমিতে সরাসরি ঘাসের কাটিং লাগানো যায়।

✓ বপণ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ এবং কাটিং এর পরিমাণ উপরের বর্ণনা মতই।

✓ প্রথম চাষের সময় ঘাসের সাথে ডাল জাতীয় ফসলের আবাদ করা যেতে পারে।

✓ লাগানোর ৪৫-৬৫ দিন পর প্রথম কাটিং এবং এরপর প্রতি ৩০ দিন পর পর ঘাস কাটা যায়।

✓ এপ্রিল মে মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। তবে, অবশ্যই বন্যার পানি আসার পূর্বেই শেষ কাটিং দিতে হবে; কেননা, এ ঘাস বন্যার পানিতে বেঁচে থাকতে পারে না।

✓ অতিরিক্ত ঘাস সাইলেজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়।

✓ পরবর্তী সময়ে বপনের জন্য কাটিং উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সেশন-১০২, ১০৩

প্রশিক্ষণ কোর্স রিভিউ

সেশন শেষ যা জানা যাবে-

- কোর্সে বিষয় বস্তু পুন:স্মরণ করা
- বুঝতে না পারা বিষয়গুলি পুনরায় জানা
- নতুন বিষয় সর্ম্পকে অবহিত হওয়া

উপকরণ ঃ

মডিউল, সাদা কাগজ, মার্কার পেন, স্কেল, ডিসপ্লে বোর্ড, পয়েন্টার

পদ্ধতি ঃ

এই সেশনে প্রশিক্ষক ক্লাশে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়বস্তু নিয়ে রিভিউ আলোচনা করবেন। সেশনটি দুটি পর্বে বিভক্ত হবে। প্রথম পর্ব হবে দলীয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্ব হবে উপস্থাপনা। এই সেশনে প্রশিক্ষণার্থীরা ৪টি দলে বিভক্ত হবে এবং প্রতি দলে একজন করে দল নেতা থাকবে।

১ম পর্ব ঃ

দলীয় আলোচনা

- ☐ এই পর্বে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা যে যে বিষয় শিখেছে এবং যে বিষয়গুলি বুঝতে পারে নাই বা জানতে আগ্রহী তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দলের প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ কোর্সে যা শিখেছে বা জেনেছে তা একটি সাদা কাগজে লিখবে এবং প্রশিক্ষণার্থীরা যা বুঝতে পারে নাই বা জানতে আগ্রহী তা অন্য আর একটি কাগজে লিখে নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

২য় পর্ব ঃ

দলীয় উপস্থাপনা

- ☐ এ পর্বে প্রতিটি দলের দলনেতা তার দলের পক্ষে দলীয় উপস্থাপনা করবে। উপস্থাপনা শেষে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনায় অংশ নিবে। উপস্থাপনায় ভূলত্রুটি এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদান করবেন। এভাবে পরবর্তী ৩টি দল তাদের উপস্থাপনা প্রদান করবে।

সেশন-১০৪ ও ১০৫

প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ণ ও সনদপত্র বিতরণ

প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এই সেশনগুলিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ও পর্যালোচনা ছক

প্রশিক্ষনার্থীরা নীচে তাদের মতামত লিখবেন এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাকারীকে ফেরত দেবেন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন।

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত		মন্তব্য (মতামত ব্যাখ্যা করুন)
১.	এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগে আপনি কি কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন?	হ্যাঁ	না	
২.	এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানেন কি?	হ্যাঁ	না	
৩.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন কি?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৪.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৫.	আপনার কর্মপরিধির কতটুকু প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৬.	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ২১-৪০% ৪১-৬০% ৬১-৮০% ৮১-১০০%	১ ২ ৩ ৪ ৫	
৭.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি সন্তোষজনক দিক উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.		
৮.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি অসন্তোষজনক দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.		
৯.	এই প্রশিক্ষণ চলাকালে কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে সমস্যার ধরণ ঃ	১. ২. ৩.		
১০.	এই প্রশিক্ষণের উন্নয়নে আপনার তিনটি সুপারিশ লিখুন।	১. ২. ৩.		

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ফরমের নুমনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

প্রশিক্ষণ শিরোনাম : ট্রেনিং অব লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার।
প্রশিক্ষণ মেয়াদ : ২১ দিন।
প্রশিক্ষণ ভ্যানু : ....।

প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যাবলী

[নিচের ছকটি পূরণ করুন (* চিহ্নিত স্থানটি পূরণ আবশ্যকীয়)]

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	বাংলা*	:			
	English Block Letter*	:			
পিতার নাম	বাংলা*	:			
	English Block Letter*	:			
মাতার নাম	বাংলা*	:			
	English Block Letter*	:			
কর্মস্থল	বাংলা *	:			
	English Block Letter*	:			
পদবী*		:			
জাতীয় পরিচয় পত্র নং		:			
লিঙ্গ		:			
বৈবাহিক অবস্থা		:			
জন্ম তারিখ *		:			
জাতীয়তা *		:			
ভাষাগত দক্ষতা*	বাংলা	:			
	ইংরেজি	:			
	অন্যান্য	:			
ধর্ম*		:			
স্বাস্থ্যগত অবস্থা		:			
রক্তের গ্রুপ		:			
শিক্ষাগত যোগ্যতা*		ডিগ্রি/সার্টিফিকেট	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের সাল	জিপিএ/বিভাগ
স্থায়ী ঠিকানা*		:			
বর্তমান ঠিকানা		:			
ইতিপূর্বে কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উল্লেখ করুন*		:			
*ইমেইল/ফেসবুক/টুইটার/অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার ঠিকানা (যদি থাকে)		:			
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর*		:			
জরুরী যোগাযোগ *		:			
অন্যান্য তথ্য		:			

তারিখ প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর

বিবিধ
গবাদিপশু ও পোল্ট্রি বিষয়ক পরিভাষা (Terminology)

রুমিনেন্ট (Ruminant)ঃ

রুমিনেন্ট শব্দটি ল্যাতিন শব্দ রুমিনার থেকে এসেছে যার অর্থ পূনরায় চিবানো। রুমিনেন্ট হলো চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণী, যারা হজমের আগে পেটের খাবার পুনরায় চিবিয়ে পুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১. গরু (Cattle) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের গো-জাতিকে বুঝায়।
ক) ষাঁড় (Bull) : প্রজননক্ষম পুরুষ গরুকে বুঝায়।
খ) গাভী (Cow) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী গরুকে বুঝায়।
গ) বলদ (Bullock) : প্রজনন ক্ষমতা রহিত করা পুরুষ গুরুকে বুঝায়।
ঘ) বকনা (Heifer) : প্রথমবার বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্ত্রী গরুকে বুঝায়।
ঙ) বাছুর (Calf) : স্ত্রী/পুরুষ উভয় বাচ্চাগরুকে বুঝায়।
চ) বকনা বাছুর (Heifer Calf) : ১ বছরের কম বয়সী স্ত্রী গরুকে বুঝায়।
ছ) এঁড়ে বাছুর (Bull calf) : ১ বছরের কম বয়সী পুরুষ গরুকে বুঝায়।
জ) স্ট্যাড ষাঁড় (Stud bull) : প্রজনেন জন্য রক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক ষাড়।
ঝ) গো-পাল (Cattle Herd) : এক সাথে অনেক গরু থাকলে বা চরলে গো-পাল বলা হয়।
ঞ) বীফ (Beef) : গরুর মাংসকে বীফ বলে।

২. মহিষ (Buffalo) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় মহিষকে বুঝায়।

৩. ছাগল (Goat) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগলকে বুঝায়।
ক) পাঠা (Buck) : পূর্ণবয়স্ক প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগল।
খ) ছাগী (Doe) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী ছাগল।
গ) বাকলিং (Buckling): অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলকে বুঝায়।
ঘ) গোটলিং (Goatling): অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা ছাগী।
ঙ) ছাগলছানা (Kid) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগল ছানা।
চ) খাসী (Castrated Goat): প্রজনন শক্তি রহিত পুরুষ ছাগল।
ছ) ছাগল পাল (Goat flock): ছাগলের পালকে গোট ফ্লক বলে।
জ) চেভন (Chevon): ছাগলের মাংসকে চেভন বলা হয়।

৪. মেষ (Sheep): স্ত্রী-পুরুষ উভয় মেষেকে বুঝায়।
ক) পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া (Ram) : পূর্ণবয়স্ক প্রজননক্ষম পুরুষ মেষকে বুঝায়।
খ) ভেড়ী (Ewe) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী জাতিকে ভেড়ী বলা হয়।
গ) মেষ শাবক (Lamb) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় মেষের বাচ্চাকে বুঝায়।
ঘ) ভেড়া শাবক (Ram Lamb) : ভেড়ার পুরুষ বাচ্চা।
ঙ) ভেড়ী শাবক (Ewe lamb) : ভেড়ীর স্ত্রী বাচ্চা।
চ) ওয়েদার (Wether) : খাসী করা ভেড়াকে বুঝায়।
ছ) মেষ পাল (Sheep Flock) : এক সাথে অনেকগুলো মেষ থাকলে তাকে মেষ পাল বলে।
জ) মাটন (Mutton) : ভেড়ার মাংসকে মাটন বলা হয়।

পোল্ট্রি পরিভাষা (Terminolagy) ঃ

পোল্ট্রি (Poultry) ঃ পোল্ট্রি বলতে সকল বয়সের হাঁস-মুরগি, কবুতর এবং অন্যান্য পাখি শ্রেণিকে বুঝায়।

পাখি (Bird) ঃ পক্ষিকুলের যেকোনো জাতকে পাখি বা বার্ড বলা হয়।

জাত (Breed) ঃ পোল্ট্রির একই শ্রেণির মধ্যে দৈহিক আকৃতি বা পৃথক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে জাত নির্বাচন করা হয়।

ভ্যারাইটি (Variety) ঃ একই জাতের মধ্যে পালকের রং, ঝুঁটির আকার ও অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভ্যারাইটি নির্বাচন করা হয়।

স্ট্রেইন (Strain)ঃ কোনো একক প্রজননকারী কর্তৃক কমপক্ষে পাঁচ বংশপরম্পরায় প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট নির্দিষ্ট নামধারী পোল্ট্রির অধিনস্থ উপজাতকে স্ট্রেইন বা বিশেষ উপজাত বলে।

ফ্লক (Flock) ঃ একই বয়সের একই উদ্দেশ্যে পালন করা একটি গ্রুপের মুরগিকে ফ্লক বলে।

ব্রুডিং (Brooding) ঃ তাপ দেয়া;

ব্রুডার (Brooder) ঃ যে যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ দেয়;

হ্যাচিং (Hatching) ঃ ডিম ফুটানো;

চিক (Chick) ঃ মুরগির বাচ্চা;

বেবী চিক (Baby Chick) ঃ মুরগির নবজাতক ছানাকে বেবী চিক বলে।

কম্ব (Comb) ঃ মাথার ঝুঁটি;

ওয়াট্‌ল (Wattle) ঃ গলকম্বল

ডে-অল্ড চিক (Day old Chick) ঃ ১ দিনের বয়সের মুরগির বাচ্চাকে ডে-অল্ড (DOC) চিক বলে।

গ্রোয়ার (Grower) ঃ ব্রুডিং-এর পরে থেকে প্রজনন উপযোগি পর্যন্ত মুরগি;

পুলেট (Pullet) ঃ ডেকি মুরগি-ডিম পাড়বে এমন উপযোগী মুরগি;

মুরগী/হেন (Hen) ঃ ডিম পাড়া মুরগি;

ককরেল (Cockrell) ঃ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পুরুষ পোল্ট্রি;

কক (Cock) ঃ প্রজনন উপযোগী পুরুষ পোল্ট্রি (মোরগ)

কেপন (Capon) ঃ অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে খোজা করা মোরগকে বুঝায়।

লেয়ার (Layer) ঃ ডিম পাড়া মুরগী

ব্রয়লার (Broiler) ঃ ৬-১৩ সপ্তাহ বয়সের মোরগ-মুরগী যা মূলতঃ মাংসের জন্য পালন করা হয়।

রোষ্টার (Roaster) ঃ এক বছর বয়সের উপরের মোরগ।

ডাক (Duck) ঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতের হাঁস বুঝায়।

ড্র্যাক (Drake) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হাঁস (হাঁসা)।

গ্যান্ডার (Gander) ঃ প্রাপ্তবয়ষ্ক পুরুষ রাজ হাঁস।

গুজ (Goose) ঃ প্রাপ্তবয়ষ্ক স্ত্রী রাজ হাঁস।

কবুতর (Pegion) ঃ কবুতর বলতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতের কবুতরকে বুঝানো হয়েছে।

স্কোয়াব (Squab) ঃ যে পায়রার পাখা গজায়নি বা উড়তে শিখেনি এমন কবুতর ছানাকে স্কোয়াব বলে।

ব্রিড (Breed) ঃ পশু-পাখির দল যাদের বাহ্যিক ও কৌলিক গুনাগুন তাদের প্রজন্ম পুনঃউৎপাদনে প্রতিফলিত হয়।

ক্যাপোনাইজেশন (Caponization) ঃ মোরগ খোঁজাকরণের পদ্ধতি; ক্যাপন- খোঁজাকৃত মোরগ; লেয়ার- ডিম পাড়া মুরগি; ব্রয়লার-মাংস উৎপাদনকারী মুরগি; ব্রয়লার স্টারটার- অল্প বয়স্ক ব্রয়লারের রেশন; ব্রয়লার ফিনিসার- বেশি বয়সের ব্রয়লারের রেশন।

মোল্টিং (Moulting) ঃ হাঁস-মুরগির পুরাতন পালক খসে নতুন পালক গজানো।

ফিডার (Feeder) ঃ খাদ্য পাত্র; ড্রিংকার-পানির পাত্র; লিটার- মুরগির ঘরে কাঠের গুড়া, তুস বা খড়ের টুকরা দ্বারা তৈরি বিছানা।

ফুট বাথ (Foot Bath) ঃ খামারে ঢুকার পথে ছোট চৌবাচ্চা যেখানে পানির সাথে জীবাণুনাশক ঔষধ মিশ্রিত থাকে। ফুট বাথে পা ভিজিয়ে খামারে প্রবেশ করতে হয়; বায়োসিকিউরিটি- জীবনিরাপত্তা; ক্যান্ডেলিং-আলোতে ডিম পরীক্ষা করা; ফারটাইল এগ- ফুটানোর উপযোগী ডিম।

হ্যাচারী (Hatchery) ঃ যেখানে ডিম ফুটানো হয়।

ইনকুবেটর (Incubator) ঃ ডিম ফুটানো মেশিন; সেটার- যেখানে ১৮ দিন পর্যন্ত ডিম বসানো থাকে; হ্যাচার-১৮ দিন পর বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার জন্য যেখানে ডিম স্থানান্তর করা হয়।

ফিউমিগেশন (Fumigation) ঃ পটাশিয়াম পার ম্যাংগানেট ও ফরমালিন মিশিয়ে ধুয়া সৃষ্টির মাধ্যমে জীবাণু-মুক্তকরণের ব্যবস্থা।

অল-ইন-অল-আউট (All in-all out) ঃ এক সংগে একই বয়সের মুরগি খামারে ঢুকাতে হবে এবং একই সাথে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

আইসোলেশন (Isolation) ঃ মুরগি আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা।

কালিং (Culling) ঃ পাল থেকে পশু-পাখি ছাঁটাই করা।

ডিজইনফেকশন (Disinfection) ঃ জীবাণু-মুক্তকরণ ব্যবস্থা।

রেফারেন্স সমূহঃ

১. Handbook of Veterinary Pharmacology-Walter H. Hsu.

২. Veterinary Pharmocology and Therapeutics (Tenth Edition)-Jim E. Riviere, Mark G.Papich.

৩. Casarett and Doull's Toxicology the Basic Science of Poisons (Sixth Edition)-Curtis D. Klaassen.

৪. Veterinary Toxicology-Radhey Mohan Tiwari, Malini Sinha.

৫. The Vets' Solution (3rd edition)- Asst. Prof. Dr. Raihana Nasrin Ferdousy Sharmin.

৬. প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত রোগ প্রতিরোধ টীকা বুকলেট।

৭. স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, বিএলআরআই।

৯. ফার্মাকোলজি এন্ড টক্সিকোলজি, ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প।

১০. ব্রয়লার পালন ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ মডিউল, ড. মো. গোলাম রব্বানী।

১১. আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী খামারীর প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

১২. মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

১৩. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং বাস্তবায়ন কৌশল, ডা. মো: সালেহ উদ্দিন খান, এনএটিপি-২।

১৪. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১৫. ন্যাশনাল লাইভস্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট উদ্যোক্তা উন্নয়ন মডিউল।

মুদ্রণেঃ দি প্রিন্ট মিডিয়া
২৫৭ ফকিরাপুর, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০